মাসুদ রানা

ব্যর্থ মিশন

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

ব্যর্থ মিশন

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

'আমি আমার সরকারের কাছে কি উত্তর নিয়ে যাব,
মিস্টার প্রেসিডেন্ট?' গরমে দরদর করে ঘামছেন স্যার ওয়েনডেল।
'রানীকে বলবেন, তাঁর চিঠি পেয়ে আমি খুশি হয়েছি।
আর আপনাদের প্রধানমন্ত্রীকে জানাবেন, আনিস সিদ্দিকীর মৃত্যুদণ্ড
বাতিল করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। চারদিন পর
ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে হবে তাকে।'

সামরিক জান্তা ক্ষমতা দখল করার পর লুগাম্বায় সংখ্যাগরিষ্ঠ
মুসলমানদের মেরে সাফ করে ফেলা হচ্ছে।
একটা বই লেখার অপরাধে ব্রিটিশ নাগরিক আনিস সিদ্দিকীকে
মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন বোগামুরা, কোন বিচার না করেই।
একটা এজেন্সির মাধ্যমে কাজটা পেল মাসুদ রানা,
আনিস সিদ্দিকীকে উদ্ধার করে আনতে হবে···

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা - ২৩৬, ২৩৭

ব্যর্থ মিশন ১,২

<u>লেখকঃ</u> কাজী আনোয়ার হোসেন

<u>কৃতজ্ঞতায়ঃ</u> মাসুদ হোসেন রানা

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)

facebook.com/groups/Banglapdf.net

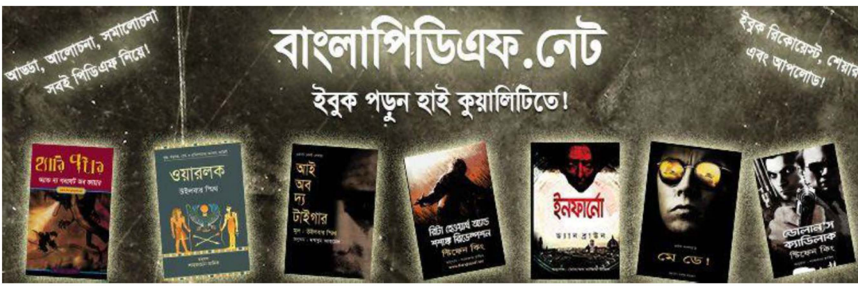

বাংলাপিডিএফ (BanglaPDF) এর যে কোন রিলিজ করা PDF বই
ইন্টারনেটে কোথাও শেয়ার করা যাবে না।
না কোন ওয়েব সাইটে ফোরামে, ব্লগে অথবা ফেসবুক গ্রুপে। না অন্য কোন মাধ্যমে।

শেয়ার করতে হলে বাংলাপিডিএফ এর ফোরাম লিঙ্ক শেয়ার করুন ।

পিডিএফ কখনোই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না।
যদি এই পিডিএফ বইটি আপনার ভাল লেগে থাকে
তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল।
পিডিএফ করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষন এবং সবার কাছে পৌঁছে দেয়া।
মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

মাসুদ রানা

ব্যর্থ মিশন

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7236-7

একান্ন টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮ ১৯০২০৩

Masud Rana
BYARTHO MISSION
Part I & II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

ব্যর্থ মিশন-১ ৫–৮৭
ব্যর্থ মিশন-২ ৮৮–১৬৮

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৬৪/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৬৭/-
৭-৩৭২	শত্রু ভয়ঙ্কর+অরক্ষিত জলসীমা	৫৯/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৫৯/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪৯/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৫৮/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৪৬/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৩৩/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৫৯/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৮/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৫২/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	৪৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৫৯/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৬০/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১.২ (একত্রে)	৫৭/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৯৬/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৮/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৮৮/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৮/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৬৪/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৭৫/-
১৫৬-১৫৭	মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৫৯/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৯০/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৬৮-১৬৯	অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭০-১৭১	যাত্রী অশুভ-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৭৪-১৭৫	কালো টাকা ১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭৬-১৭৭	কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৬১/-

১৮২-১৮৩ যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৮৪-১৮৫ আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৬৫/-
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৯৩-১৯৪ প্রলয়সঙ্কেত-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২০৩-২০৪ অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৭৫/-
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৬৭/-
২১৭-২১৮ অন্ধিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৬০/-
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৫১/-
২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১ কালকূট-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭ অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৫৯-২৬০-২৬১ কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে)	৬৩/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে)	৫৬/-
২৬৯-২৮৫ বিগব্যাঙ+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩ মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৩৯/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৫২/-
২৭৬-২৯১ মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪৫/-
২৭৯-২৮২ মারান ট্রেজার+জন্মভূমি	৫১/-
২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭ আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪৬/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৪৭/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৮৬-২৮৭ শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে)	৪১/-
২৯০-২৯৩ গুডবাই, রানা+কান্তার মরু	৪৬/-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৪২/-
২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
৩০১-৩৪৪ জন্মশত্রু+ক্রাইম বস	৪১/-
৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী	৪৭/-
৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম	৬৯/-
৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা	৪১/-
৩১১-৩১৪ বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ	৪৭/-
৩১৫-৩১৬ চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু	৪৯/-
৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা	৪০/-
৩১৮-৩৪৭ চরসদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা	৫০/-
৩২০-৩২১ মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর	৫৫/-
৩২২-৩৩৬ আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা	৫৪/-
৩২৩-৩৫২ অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা	৬২/-
৩২৪-৩২৮ অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল	৭৬/-
৩২৫-৩৫১ কনকতরী+দুর্গে অন্তরীণ	৪৪/-
৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে)	৭৬/-
৩২৯-৩৩০ শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ	৪৬/-
৩৩১-৩৪১ ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার	৬১/-
৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৩৩৪-৩৩৫ মহাবিপদ সঙ্কেত+সবুজ সঙ্কেত	৫০/-
৩৩৭-৩৩৮ গহীন অরণ্য+প্রজেক্ট X-15	৫৯/-
৩৩৯-৩৫৩ অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন	৫৪/-
৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব	৪৮/-
৩৪৫-৩৪৬ সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে)	৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯ কালো নকশা+কালনাগিনী	৬৬/-
৩৫০-৩৫৬ বেঈমান+মাফিয়া ডন	৪৮/-
৩৫৪-৩৫৯ বিষচক্র+মৃত্যুবাণ	৫০/-
৩৫৫-৩৩১ শয়তানের দ্বীপ+বেদুঈন কন্যা	৭১/-
৩৫৭-৩৫৮ হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৩৬০-৩৬৭ কমাণ্ডো মিশন+সহযোদ্ধা	৬৬/-
৩৬১-৩৬২ শেষ হাসি-১,২ (একত্রে)	৭৪/-
৩৬৩-৩৬৪ স্মাগলার+বন্দি রানা	৫৯/-
৩৬৫-৩৬৬ নাটের গুরু+আসছে সাইক্লোন	৫৪/-
৩৬৮-৩৬৯ গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৭০-৩৭৬ ক্রিমিনাল+অমানুষ	৭৯/-
৩৭৩-৩৭৪ দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
৩৭৫-৩৭৭ সর্পলতা+অখণ্ড অবসর	৭৮/-
৩৭৮-৩৭৯ স্নাইপার ১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৮০-৩৮১ ক্যাসিনো আন্দামান+জলরাক্ষস	৮৯/-
৩৮৪-৩৮৮ স্বপ্নের ভালবাসা+নিখোঁজ	৮১/-
৩৮৫-৩৮৬ হ্যাকার ১,২ (একত্রে)	৭৮/-
৩৮৭-৩৮৯ খুনে মাফিয়া+বুশ পাইলট	৬৭/-
৩৯০-৩৯১ অচেনা বন্দর ১,২ (একত্রে)	৮৪/-
৩৯২-৩৯৯ ব্ল্যাকমেইলার+বিপদে সোহানা	৬৪/-
৩৯৩-৩৯৪ অন্তর্ধান ১,২ (একত্রে)	৭০/-
৩৯৫-৩৯৬ ড্রাগ লর্ড+দ্বীপান্তর	৬৮/-
৩৯৭-৩৯৮ গুপ্ত আততায়ী ১,২ (একত্রে	৮৪/-
৪০০-৪০১ চাই ঐশ্বর্য ১,২ (একত্রে)	৯৪/-
৪০২-৪০৩ স্বর্ণ বিপর্যয় ১,২ (একত্রে)	৭১/-
৪০৪-৪০৫ কিল-মাস্টার+মৃত্যুর টিকেট	৭৪/-

ব্যর্থ মিশন-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

এক

মাঝরাত হতে আর এক ঘণ্টা।

আঁধারে মিশে রাস্তার এক ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুজো গাড়িটা। গাড়ির ভেতর ওরা কোন শব্দ করছে না, নজর রাখছে বাংলোটার ওপর। রাজধানীর অন্যান্য এলাকার মত এই উত্তর প্রান্তেও লাইটপোস্টগুলোয় কোন আলো জ্বলছে না। ফুটপাথে কোন পথিক নেই, অন্য কোন গাড়িও নেই। রাস্তার দু'ধারে প্রতিটি বাড়ির জানালা-দরজা বন্ধ। কোথাও কিছু নড়ছে না, সব একদম স্থির। এ যেন একটা মৃত নগরী, অসহায় মানুষ যে-যার ঘরে বন্দী। অসীম ক্ষমতার অধিকারী সিক্রেট পুলিস কখন কোন বাড়িতে হানা দেবে কেউ বলতে পারে না। সন্ধের পর থেকে শুরু হয় তাদের অভিযান। যে-কোন বাড়িতে ঢুকে কোন কারণ ছাড়াই যাকে খুশি গ্রেফতার করতে পারে তারা। কেউ বাধা দিলে তাকেও ধরে নিয়ে যাওয়া হয়—ওরা আর কোন দিন ফিরে আসে না, এমনকি লাশও ফেরত দেয়া হয় না। এখানেই শেষ নয়, হপ্তা না ঘুরতেই আবার হানা দেয় বাড়িটায়, এবার বাড়ির বউ-ঝির সর্বনাশ করার পালা। বাধা না দিলে শুধু সম্ভ্রম হারায় মেয়েরা, আর বাধা দিলে শ্লীলতাহানির পর প্রিয়জনদের সামনে জবাই করা হয়। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, গত কয়েক বছর ধরে মুসলমানদের ওপর এই বর্বর অত্যাচার চালানো হচ্ছে। কেউ নেই বাধা দেয় বা প্রতিবাদ করে।

পুজো গাড়িটা এসেছে দশটা বেজে এক মিনিটে। আকাশে তখন চাঁদ দেখা যাচ্ছিল, এখন সেটা মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে।

অপেক্ষার সময়টা পুরো এক প্যাকেট সিগারেট ধ্বংস করল ওরা তিনজন। গাড়ির মেঝেতে সিগারেটের অবশিষ্টাংশ আর ছাই ছড়িয়ে রয়েছে। স্থানীয় সস্তা সিগারেট নয়, ইংলিশ প্লেয়ারস। হেড অভ স্টেট-সিকিউরিটি মেজর কাগলির বিশেষ সুপারিশে ফিলিপস টেপ রেকর্ডার, ফরাসী সেন্ট, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হুইস্কি ইত্যাদির সঙ্গে আমদানী করা হয়েছে ওগুলো, শুধু সিক্রেট পুলিস বাহিনীর লোকজন ব্যবহার করবে। সম্প্রতি নিজের জন্যে সে একটা লাল মার্সিডিজ থ্রী-হানড্রেড আনিয়েছে, শুল্ক ছাড়াই।

ওয়েস্টব্যান্ড থেকে বড়সড় ব্রাউনিং অটোমেটিক পিস্তলটা হাতে নিয়ে দরজা খুলল ড্রাইভার। তার পিছু পিছু আরোহী দু'জনও নেমে এল রাস্তায়। সবার পরনে কালো স্যুট, ইউনিফর্ম নয়, যেন কোন পার্টিতে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ গাড়িটার পাশে দাঁড়িয়ে রাস্তার দু'দিক দেখে নিল তারা। আশপাশের সবগুলো বাড়ি-ঘরের জানালা দরজা বন্ধ হলেও দু'একটা বাড়ির ভেতর আলো জ্বলছে। 'এত রাতে আলো জ্বলছে কেন?' ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, সেই ওদের লিডার। 'নম্বরগুলো টুকে রাখো,' একজন সহকারীকে নির্দেশ দিল সে। 'পরে তদন্ত করা হবে।' তদন্তে যদি দেখা যায় বাড়ির বাসিন্দারা মুসলমান, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হবে: গভীর রাতে সরকারকে উৎখাত করার জন্যে গোপন মীটিং

করছিল। অবশ্য মোটা টাকা আর সুন্দরী বউ বা ঝি ভেট হিসেবে পেলে অফিসাররা কোন অভিযোগ আনবে না।

বাংলোটা আর সব বাড়ি-ঘর থেকে একটু তফাতে, চারপাশে গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড়। চুনকাম করা সাদা দেয়াল, লাল করোগেটেড ছাদ। গেট থেকে সরু একটা পথ চলে গেছে উঁচু বারান্দার দিকে। পথটার দু'পাশে মরা ঘাস। লুগাম্বায় গত দু'মাস বৃষ্টি হয়নি।

বাইরে থেকেই খোলা গেল লোহার গেটটা। ইতিমধ্যে বাকি দু'জনের হাতেও আগ্নেয়াস্ত্র বেরিয়ে এসেছে। দু'জনের হাতে ব্রাউনিং, অপরজনের হাতে রাশিয়ায় তৈরি টোকারেভ। দল থেকে আলাদা হয়ে বাড়ির কোণ ঘুরে পিছন দিকে চলে গেল একজন। সে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল বাকি দু'জন।

তারপর ওরা বারান্দায় উঠে এল। বাংলোর ভেতর ঢোকার পথে সামনে দুটো বাধা—বাইরের দিকে একটা মসকীটো নেট, তারপর একটা কাঠের দরজা। দেয়ালে হাত তুলে বোতামে চাপ দিল ড্রাইভার। সবার হাত পিছন দিকে লুকানো।

লিখতে বসার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছেন আনিস সিদ্দিকী। দিনের বেলা অনেক লোকজন আসে তাঁর কাছে, বাকি সময় রাজধানীর পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে নির্যাতনের তথ্য সংগ্রহ করেন, চিঠি লেখার সময় পান না। বাড়ির পিছন দিকের স্টাডিরুমে একটা ডেস্কে বসে কাগজ-কলম টেনে নিয়েছেন তিনি।

হঠাৎ কলিংবেলের আওয়াজ শুনে অবাক হয়ে মাথা তুললেন আনিস সিদ্দিকী। এত রাতে কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে না। রাজধানীতে রাত মানে অঘোষিত কার্ফু। তাহলে?

কাগজের ওপর কলমটা রেখে চেয়ার ছাড়লেন তিনি। তাঁর বয়স প্রায় ষাট, রোগা-পাতলা একহারা গড়ন। অত্যন্ত ফর্সা তিনি, মাথার চুলে লালচে-সোনালি একটা ভাব আছে। শুধু চোখ দুটো ইউরোপিয়ানদের সঙ্গে মেলে না, ঘন কালো ওগুলো, দৃষ্টিতে প্রায়-লাজুক, কোমল ভাব। পুরোপুরি ইউরোপিয়ান তিনি ননও। ব্রিটেনের একজন প্রথম শ্রেণীর নাগরিক, তাঁর মা ইংরেজ হলেও বাবা খাঁটি বাঙালী ছিলেন।

হাতঘড়ির দিকে আরেকবার তাকালেন আনিস সিদ্দিকী। এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিট। এত রাতে কে এল?

আবার কলিংবেল বেজে উঠল। কামরা থেকে বেরিয়ে প্যাসেজ ধরে এগোলেন তিনি। তৃতীয় বার বেল বাজতে বোতাম টিপে বারান্দার আলো জ্বাললেন, ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

কালো সুট দেখেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল তাঁর। স্ক্রীনের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে থাকলেন লোক দু'জনের দিকে। লোক দু'জন হাসছে না, কটমট করে তাকিয়ে থাকল তাঁর দিকে। আনিস সিদ্দিকীর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিল তাঁকে।

'কি ব্যাপার?' ধমকের সুরে কথা বলছেন আনিস সিদ্দিকী। 'কি চাই?'

কাঠের ফ্রেমে আটকানো রয়েছে লোহার জাল, মাঝখানে হাতল আছে; সেটা ধরে ঘোরাবার চেষ্টা করল এক লোক।

'ছাড়ো ওটা,' আবার ধমক দিলেন আনিস সিদ্দিকী। 'কে তোমরা?'

হাতল ধরে থাকা লোকটা কথা বলল। ভাঙা ভাঙা ইংরেজি, তবে উদ্দেশ্যটা

পরিষ্কার। সে চাইছে তাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হোক। আনিস সিদ্দিকী বোকা নন, তাঁর সাহসেরও অভাব নেই। তিনি নড়লেন না। বললেন, 'ভাল চাও তো চলে যাও তোমরা। তা না হলে পুলিস ডাকব।'

অপর লোকটা হেসে উঠে বলল, 'আমরা পুলিসের বাপ, মি. সিদ্দিকী—সিক্রেট পুলিস।' তার ইংরেজি ভালই। 'ভেতরে ঢুকতে দিন আমাদের, জরুরী একটা বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা আছে।' কথা শেষ করে পিছন থেকে হাতটা সামনে নিয়ে এল সে। দেখাদেখি অপর লোকটাও তাই করল। অস্ত্র দুটো সরাসরি আনিস সিদ্দিকীর দিকে তাক করল ওরা।

সাদা হয়ে গেল আনিস সিদ্দিকীর চেহারা। আর ঠিক তখনই বাড়ির পিছন থেকে জানালার কাঁচ ভাঙার আওয়াজ ভেসে এল। চমকে উঠলেন তিনি। এই সময় লোহার জালে সবুট লাথি মারল এক লোক। কাঠের হালকা ফ্রেমটা ভেঙে গেল, ছিঁড়ে গেল জাল। ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকল ওরা, আনিস সিদ্দিকীকে ঠেলে নিয়ে এল ঘরের ভেতর।

ধাক্কা দিয়ে একটা সোফায় ফেলা হলো তাঁকে। বুকে ব্যথা পেয়েছেন, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকলেন, দম ফুরিয়ে যাওয়ায় হাঁপাচ্ছেন; এই সময় হাতে পিস্তল নিয়ে তৃতীয় লোকটা হাজির হলো। আনিস সিদ্দিকীর শিরায় শিরায় ভয় আর আতঙ্কের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। তাঁর আড়ষ্ট ভঙ্গি দেখে হাসাহাসি করছে লোকগুলো।

ড্রাইভার লোকটা তাঁর ওপর ঝুঁকে দাড়িয়ে থাকল, বাকি দুজন ঘরের সব জিনিস এলোমেলো করছে। মেঝের কার্পেট গুটিয়ে ফেলা হলো, লাথি মেরে ওল্টানো হলো টেবিল-চেয়ার, স্টেরিও কেবিনেটের দরজা ভেঙে ফেলা হলো কজা থেকে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে দেয়াল থেকে পেইন্টিংগুলো নামাল ওরা। সোফা থেকে টেনে সরিয়ে দিল আনিস সিদ্দিকীকে, কুশনগুলো তোলার জন্যে। ভয় ও রাগে অসুস্থবোধ করছেন আনিস সিদ্দিকী, অসহায়ভাবে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখছেন।

ডিপার্টমেন্ট অভ স্টেট সিকিউরিটির সব স্টাফই খ্রিস্টান, প্রায় সবাই তারা মাকেসি উপজাতির লোক। জুলিয়াস বোগামুরা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর মেজর জোসেফ কাগলিকে বিশেষ একটা সেল গঠন করার নির্দেশ দেন, যাদের কাজ হবে বিতাড়িত প্রেসিডেন্ট হাজী বাবা সালাহউদ্দিন ফালার সমর্থকদের খুঁজে বের করে হত্যা করা। সেই বিশেষ সেলটাই সিক্রেট পুলিস হিসেবে পরিচিত। পরনে দামী সুট থাকলে কি হবে, তিনজনেরই মুখে লাল আর হলুদ রঙের নকশা আঁকা রয়েছে। ওরা যে খ্রিস্টান মাকেসি, এটাই তার প্রমাণ। মাকেসি উপজাতির মধ্যে মুসলমানও আছে, তারাও মুখে নকশা তৈরি করে, তবে রঙগুলো হয় লাল আর কালো। বছর কয়েক আগে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন শুরু হবার পর অন্তত রাজধানীতে যারা থাকে তারা মুখে রঙ ব্যবহার করা ছেড়ে দিয়েছিল। জান বাঁচানো ফরজ, বুদ্ধি করে কিছু কিছু লোক প্রথম দিকে খ্রিস্টান মাকেসিদের মত মুখে লাল আর হলুদ রঙ ব্যবহার করত। চালাকিটা ধরে ফেলে সিক্রেট পুলিস, লাউডস্পীকারের মাধ্যমে সারা শহরে একটা ঘোষণা প্রচার করা হয়—কেউ পরিচয় গোপন করলে একা শুধু তাকে নয়, তার পরিবারের সবাইকে গ্রেফতার করা হবে। রাজধানী কেনডুরায় কেউ গ্রেফতার হলে তার পরিণতি কি হতে পারে সবারই তা জানা।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বাংলোর প্রতিটি কামরা তছনছ করল ওরা। কিছু একটা খুঁজছে। আনিস সিদ্দিকী জানেন কি খুঁজছে ওরা।

ড্রাইভার অর্থাৎ লিডার লোকটা পিস্তল দিয়ে আনিস সিদ্দিকীর পাঁজরে খোঁচা মারল। 'কোথায় ওগুলো? এত খুঁজতে হচ্ছে কেন?' বাকি দু'জনের মত তারও নাকের দু'পাশে সরু ফিতের মত তিনটে দাগ—দু'পাশে লাল, মাঝখানে হলুদ।

'ওগুলো মানে? কোনগুলো?' গলায় জোর আনতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন আনিস সিদ্দিকী।

'চালাকি করবেন না! আপনার সম্পর্কে সব আমাদের জানা আছে! বাবা সালাহউদ্দিনের স্পাই আপনি, স্যাবোটাজ করার জন্যে লুগাম্বায় এসেছেন। আজেবাজে মিথ্যে কথা লিখে পাচার করছেন দেশের বাইরে···,' চিৎকার করছে মাকেসি অফিসার। 'ভাল চান তো কাগজগুলো বের করে দিন।'

আনিস সিদ্দিকীর ঠোঁট দুটো কাঁপছে। 'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। জোর করে ভেতরে ঢুকে তোমরা আমার ওপর শারীরিক নির্যাতন করছ, ফার্নিচার ভাঙছ··· ভেবে দেখেছ, এর পরিণতি কি হতে পারে? আমার সম্পর্কে জানো তোমরা? বিশ্বাস করো, এই ঘটনার কথা হাই কমিশন জানবে। এবার তোমরা বিদায় হও!'

কিছুই বুঝতে দেয়নি, হঠাৎ দুম করে আনিস সিদ্দিকীর নাকে ঘুসি মারল লোকটা। মাথাটা ঘুরে গেল, চোখে অন্ধকার দেখছেন বৃদ্ধ আনিস সিদ্দিকী, চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল। নাক দিয়ে হড় হড় করে রক্ত গড়াচ্ছে। অপমানে থরথর করে কাঁপছেন, টলতে টলতে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন। 'ইউ বাস্টার্ড!'

আরেকটা ঘুসি খেয়ে পড়ে গেলেন তিনি। মুখে হাত চাপা দিয়ে কাশলেন একবার, হাতের তালুতে রক্তের সঙ্গে একটা দাঁত বেরিয়ে এল।

'আপনার সরকারকে বলা হবে আপনি লুগাম্বা সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করেছেন। প্রমাণ পাওয়া গেছে আপনি রাষ্ট্রের একজন শত্রু। আপনাকে চরম শাস্তি দেয়া হবে, মি. সিদ্দিকী। আপনাদের হাই কমিশন এখন আর কোন সাহায্যে আসবে না।'

হঠাৎ বমি পেল, অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে রাখলেন আনিস সিদ্দিকী। তারপর হতভম্ব হয়ে দেখলেন কার্ডবোর্ড-এর একটা বাক্স হাতে ড্রইংরুমে ঢুকল এক লোক। বাক্সটা খালি করা হলো। আনিস সিদ্দিকী উপলব্ধি করলেন তাঁর বিপদ সবে মাত্র শুরু হলো। হড়হড় করে বমি করে ফেললেন তিনি।

বাক্সের ভেতর থেকে একগাদা জিনিস-পত্র বেরিয়েছে—চিঠি, রাইটিং প্যাড, দেশলাই, প্যাকেট ভর্তি মোম, জেমস ক্লীপ-এর বাক্স। এসবের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে পাণ্ডুলিপিটা। টাইপ করা দুশো শিট, রাবার ব্যান্ড দিয়ে আটকানো। ঝুঁকে সেটা তুলে নিল অফিসার। পাতা উল্টে পরীক্ষা করছে।

তৃতীয় লোকটা ফিরে এল, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আনিস সিদ্দিকীর দিকে তাকিয়ে আছে, এক হাতে টোকারেভ, অপর হাত দিয়ে খস খস করে উরুসন্ধি চুলকাচ্ছে। চেহারায় কোন ভাব নেই।

'হ্যাঁ, এটাই!' সন্তুষ্ট দেখাল অফিসারকে।

'নিঃশব্দে এগিয়ে এল বাকি লোক দু'জন। বগলের নিচে হাত দিয়ে আনিস

সিদ্দিকীকে দাঁড় করাল ওরা। ভয়ে হোক বা অসুস্থতায়, নির্জীব হয়ে পড়েছেন তিনি, পায়ে দাঁড়াবার শক্তি নেই। টেনে হিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে আনা হলো তাঁকে। প্রতিবাদ করছেন না, তবে গোঙাচ্ছেন। ধরাধরি করে পুজোয় তোলা হলো তাঁকে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল, মেয়েকে চিঠি লিখতে বসেছিলেন, কিন্তু সেটা শেষ করা হয়নি। অর্ধ সমাপ্ত চিঠিটা স্টাডিরুমের মেঝেতে কোথাও পড়ে আছে।

হার ম্যাজেস্টির অ্যাকটিং হাই কমিশনার ডেভিড হোপ ধীর পায়ে হেঁটে অফিসে ঢুকলেন, ডেস্কের পিছনে চেয়ারটায় ধপ করে এমন ভঙ্গিতে বসলেন যেন পড়ে গেলেন। দীর্ঘদেহী, সুদর্শন মানুষ; যদিও মস্ত একটা টাক দেখা দিয়েছে মাথায়, কাঁচা-পাকা অল্প চুল দিয়ে তা ঢাকার চেষ্টা সফল হয়নি। আটান্ন বছর বয়েস তাঁর, আজ সকালে প্রৌঢ়ত্বের প্রতিটি বছর হাড়ে হাড়ে অনুভব করছেন। জীবনটাকে প্রতি মুহূর্তে চুটিয়ে উপভোগের জন্যে সব রকম ঝুঁকি নেন তিনি, রাত জাগা থেকে শুরু করে নিত্য-নতুন নারীসঙ্গ, মদ্য পান এবং উঁচু স্টেকে জুয়াখেলা, কোনটাই বাদ দেন না। লেদার ব্রিফকেস খুলে ওষুধের দুটো শিশি বের করলেন ডেভিড হোপ। প্রথমে একটা অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট চুষলেন, তারপর দুটো অ্যাসপিরিন খেলেন। চোখ বন্ধ করে হেলান দিলেন চেয়ারে, আঙুল দিয়ে কপালের দু'পাশ টিপছেন। ব্যথায় যেন খসে পড়তে চাইছে মাথাটা।

'মর্নিং, স্যার।' অফিস রুমে তাঁর সেক্রেটারি বিল মর্টন ঢুকল। রোজকার মত আজ হাসছে না সে।

'তুমি কিছু বলতে চাও।' মাথার ব্যথায় হাই কমিশনারের চোখ দুটো আধবোজা হয়ে আছে।

'খবর খুব খারাপ, স্যার,' বলল বিল মর্টন। 'মি. আনিস সিদ্দিকীকে প্রেসিডেন্টের সিক্রেট পুলিস কাল রাতে গ্রেফতার করেছে।'

মাথার ব্যথাটা অকস্মাৎ বেড়ে গেল, গুঙিয়ে উঠলেন ডেভিড হোপ, 'ওহ্, গড!'

'এইমাত্র জানানো হয়েছে আমাকে, স্যার। আপনি পৌঁছুনোর দু'মিনিট আগে ওদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফোন করেছিলেন।'

'ঠিক কি ঘটেছে সব আমাকে বলো।' চেয়ারে সিধে হয়ে বসলেন অ্যাকটিং হাই কমিশনার।

আনিস সিদ্দিকী সম্পর্কে সবই তাঁর জানা আছে। অ্যারোনটিকাল এঞ্জিনিয়ারিং-এ দুর্লভ একটা প্রতিভা। অক্সফোর্ড থেকে পাস করেছেন প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে, তারপর পি.এইচ.ডি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের একটা ইউনিভার্সিটি থেকে। ব্রিটেনের নাগরিক হলেও প্রথম জীবনে তিনি নাসায় চাকরি করেছেন, একটা রিসার্চ ইউনিটের প্রধান হিসেবে। নাসায় বিশ বছর ছিলেন তিনি, তারপর ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধে রয়্যাল এয়ারফোর্সের একটা গবেষণায় অবদান রাখার জন্যে ফিরে আসেন ইংল্যান্ডে। তাঁর চুক্তিভিত্তিক চাকরি রয়্যাল এয়ারফোর্সে হলেও, গবেষণার বিষয় রকেট উন্নয়ন। মহাশূন্য অভিযানে আমেরিকা ও রাশিয়ার চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে ব্রিটেন, নতুন কোন পদ্ধতির মাধ্যমে ওদেরকে পিছনে রেখে এগিয়ে যাবার ইচ্ছে থেকেই ব্রিটিশ সরকার এই খাতে শত শত কোটি পাউন্ড খরচ করছে। নাসায় চাকরি করার সময়

আনিস সিদ্দিকী বিভিন্ন সায়েন্স ম্যাগাজিনে কয়েকটা আর্টিকেল লিখেছিলেন, সে-সব লেখায় একটা তত্ত্ব প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর তত্ত্বের মূল কথা ছিল, এক সেকেন্ডে এক লাখ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিসম্পন্ন রকেট আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। গতি বেশি হলে ঈথারের সঙ্গে সংঘর্ষে আগুন লেগে যায় রকেটে, তাঁর তত্ত্বে এ-সমস্যারও সমাধান সম্ভব বলে ইঙ্গিত দেয়া হয়। সবচেয়ে চমক সৃষ্টি করে রকেটের জ্বালানী সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য। দূরপাল্লার অভিযানে সবচেয়ে কঠিন সমস্যা এটাই, দূরত্ব যত বেশি হবে জ্বালানী বহনের জন্যে তত বড় হতে হবে রকেটটিকে। আনিস সিদ্দিকী তাঁর তত্ত্বে জোর দিয়ে বলেন, খুদে আকৃতির এমন অ্যাটমিক ব্যাটারি বানানো সম্ভব, যা নিজেই রি-চার্জড্ হবার ক্ষমতা রাখে। মোট কথা, আনিস সিদ্দিকীর তত্ত্ব যদি বাস্তবে রূপ নেয় তাহলে মহাশূন্যের যে-কোন দূরত্ব থেকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বেড়িয়ে আসতে পারবে মানুষ, দূর মহাশূন্যে নতুন প্রাণ ও নতুন সভ্যতা খুঁজে বের করার পথে তখন আর কোন বাধা থাকবে না।

ব্যাপারটা তত্ত্বগত একটা ধারণা মাত্র, বাস্তবে সম্ভব কিনা জানতে হলে গবেষণা দরকার। ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধে সেই গবেষণাতেই গত তিন বছর কাজ করছেন আনিস সিদ্দিকী। ধারণা করা হয়, আরও বছর দুয়েক গবেষণা করার দরকার হবে, তারপর শুরু হবে প্র্যাকটিকাল এক্সপেরিমেন্ট।

কিন্তু গবেষণার কাজ ফেলে গত তিন মাস ধরে একটা বই লেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন আনিস সিদ্দিকী। তিনি বই লিখছেন, এই গুজবটা শুনে তাঁর সঙ্গে দেখাও করেছেন অ্যাকটিং হাই কমিশনার ডেভিড হোপ। ব্রিটেনের সঙ্গে লুগাম্বার কূটনৈতিক সম্পর্ক এমনিতেই খুব জটিল ও নাজুক পর্যায়ে পৌঁচেছে, তারপর এখন যদি ব্রিটেনের একজন নাগরিক লুগাম্বার বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে কিছু লেখেন, সম্পর্কটা ছিন্ন হয়ে গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। ডেভিড হোপ চিন্তিত এই কারণে যে লুগাম্বায় ব্রিটেনের সাতশো নাগরিক রয়েছেন, প্রায় সবাই তাঁরা ব্যবসায়ী। কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকলে তাঁদের স্বার্থ দেখবে কে? ইতিমধ্যে ব্রিটিশ হাই কমিশনারকে লুগাম্বা সরকার অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে, তাঁর জায়গায় অ্যাকটিং হাই কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে আসার পর সম্পর্কটাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন তিনি। আনিস সিদ্দিকীর লেখা বইটা যদি প্রকাশ পায়, তাঁর এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সংখ্যালঘিষ্ঠ খ্রিস্টান উপজাতির লোকজন সংখ্যাগুরু মুসলমান উপজাতির ওপর অত্যাচার করছে, এ-কথা সত্যি। এ নিয়ে পশ্চিমা জগতের পত্র-পত্রিকায় কম লেখালেখি হচ্ছে না। বিশেষ করে ব্রিটিশ প্রেসের একাংশ ব্যাপারটা নিয়ে বেশ সোচ্চার। তবে ডেভিড হোপ বা ব্রিটিশ সরকার তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ দেখে না। লুগাম্বায় ব্রিটিশদের ব্যবসায়িক স্বার্থ আছে, কাজেই কূটনৈতিক সম্পর্কটাকেই তারা গুরুত্ব দিচ্ছে।

লুগাম্বার বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে আনিস সিদ্দিকী কাকতালীয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। লুগাম্বা সরকার এশিয়ানদেরকে যখন পাইকারীভাবে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিল, তাদের সঙ্গে তাঁর এক আত্মীয়ও ছিলেন। লুগাম্বায় তিন পুরুষ ধরে বসবাস করছিলেন ভদ্রলোক, স্থানীয় মেয়েকে বিয়ে করে ছয় সন্তানের জনক হয়েছেন, বৈধ ব্যবসা করে গড়ে তুলেছেন বিরাট সয়-সম্পত্তি, হঠাৎ মাত্র এক মাসের নোটিসে লুগাম্বা ছেড়ে চলে

যেতে বলা হলো গোটা পরিবারকে। শুধু এই একটা পরিবারকে নয়, এরকম কয়েকশো বা কয়েক হাজার পরিবারকে। প্রায় খালি হাতে বাংলাদেশে ফিরে যান ভদ্রলোক, সেখান থেকে একা চলে আসেন ইংল্যান্ডে, আবার ব্যবসা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চান। লন্ডনে আনিস সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা হলে সব ঘটনা তাঁকে তিনি জানান।

সে সময় তিন মাসের ছুটি পাওনা হয়েছিল আনিস সিদ্দিকীর, তিনি সিদ্ধান্ত নেন ছুটিটা লুগাম্বায় কাটাবেন, সেই সুযোগে চেষ্টা করবেন আত্মীয় ভদ্রলোকের হারানো সম্পত্তি উদ্ধার করার।

রাজধানী কেনডুরায় এসে প্রথম একমাস স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ছুটোছুটি করছেন আনিস সিদ্দিকী। কর্মকর্তারা কেউ তাঁকে পাত্তা দেননি। অবশেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে সক্ষম হন তিনি। মন্ত্রী মহোদয় তাঁর কথা শুনে আক্ষরিক অর্থেই খেপে যান। এশিয়ান যাদের বিতাড়িত করা হয়েছে, সরকারী ভাষায় তারা ছিল দেশের শত্রু। একজন ব্রিটিশ ট্যুরিস্ট তিন মাসের জন্যে লুগাম্বায় বেড়াতে এসে দেশদ্রোহীদের সম্পত্তি ফিরে চান কোন্ দুঃসাহসে? নিজের চরকায় তেল দিতে বলা হয় তাঁকে, তা না হলে কপালে খারাবি আছে। 'এই অন্যায় সম্পর্কে আমি লিখব,' মন্ত্রীর মুখের ওপর কথাটা বলে বেরিয়ে আসেন আনিস সিদ্দিকী। এরপর তিনি লুগাম্বায় মুসলমানদের ওপর যে অত্যাচার হচ্ছে সে-সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন।

আনিস সিদ্দিকীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ফলাফল ছিল ডেভিড হোপের জন্যে অপ্রত্যাশিত। বহু চেষ্টা করেও তাঁকে বোঝাতে পারেননি তিনি। আনিস সিদ্দিকীর ব্যবহারে বিনয়ের কোন অভাব ছিল না, হার ম্যাজেস্টির প্রতিনিধি তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করায় বিস্মিত হন তিনি, সেটা চেপেও রাখেননি। নরম কথায় কাজ হচ্ছে না দেখে কড়া ভাষা ব্যবহার করেন ডেভিড হোপ, স্পষ্ট করে জানান বইটা যদি সত্যি লেখা হয় তাহলে ব্রিটেনের সঙ্গে লুগাম্বার সম্পর্ক বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। 'আগুনে ঘি ঢালবেন না,' তাঁর কথায় নির্দেশের সুর ছিল।

আনিস সিদ্দিকীর প্রতিক্রিয়ায় কূটনীতির ছিটেফোঁটাও ছিল না। ডেভিড হোপকে হতবাক করে দিয়ে লুগাম্বায় অত্যাচারিত মুসলমানদের পক্ষ নিয়ে রীতিমত নাতিদীর্ঘ একটা ভাষণ দিয়ে ফেললেন তিনি। তারপর চোখ গরম করে জানালেন, অ্যাকটিং হাই কমিশনার যেন নিজের চরকায় তেল দেন।

এখন পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁচেছে, দিশেহারা বোধ করছেন ডেভিড হোপ। মুশকিল হলো আনিস সিদ্দিকী সাধারণ কোন লোক নন, ব্রিটিশ সরকার তাঁকে অমূল্য একটা সম্পদ বলে মনে করে।

কিভাবে কি ঘটেছে সেক্রেটারির কাছে বিস্তারিত শোনার পর বিস্ফোরিত হলেন তিনি। 'এরকম যে ঘটবে, আমি জানতাম! ভদ্রলোক লিখেই ক্ষান্ত হননি, সবাইকে বলেও বেড়িয়েছেন! এখন এই বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করবে কে? বোগামুরার দরকার ছিল আমাদের একটা ত্রুটি, একটা অজুহাত—এবার সেটা পেয়ে গেছেন তিনি।'

'এখন আমাদের করণীয় কি হবে, স্যার?' বিল মর্টন জানতে চাইল।

'ওদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করো। আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানাও, তীব্র ভাষায়। ব্যাখ্যা দাবি করো। জবাব হিসেবে নেতিবাচক কিছু গ্রহণ করবে না। নিয়ম-পদ্ধতি সবই তো তোমার জানা আছে।'

মাথা চুলকে মর্টন বলল, 'তার আগে আপনাকে একবার যেতে হবে, স্যার।'

'কি বলতে চাও?'

'আপনাকে এরই মধ্যে ডাকা হয়েছে, স্যার। বললাম না, আপনি এখানে পৌঁছুনোর আগেই ফোন করা হয়েছে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ডেভিড হোপ বললেন, 'ঠিক আছে, গাড়ি তৈরি রাখতে বলো। কোথায়, কখন?'

'দশটায়, স্যার। কমান্ড পোস্টে।'

ঝট করে মুখ তুললেন ডেভিড হোপ। 'কমান্ড পোস্টে? কিন্তু তুমি বলছিলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ফোন করা হয়েছে…?'

'তা করা হয়েছে, তবে প্রেসিডেন্টের অর্ডারটা সরাসরি আমাদের কাছে রিলে করেছে ওরা, স্যার। তিনি নিজে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন।' মর্টনের গলায় ক্ষমাপ্রার্থনার সুর, যেন সে-ই দায়ী। 'আরও একটা ব্যাপার, স্যার।' ইতস্তত করতে দেখা গেল তাকে।

'বলো।' ডেভিড হোপের ঠোঁট জোড়া পরস্পরকে চেপে ধরল।

'ওরা বলে দিয়েছে, দেরি করা চলবে না।' শোনা কথা বলা হলেও, ভীতিকর প্রতিধ্বনি রয়েছে শব্দগুলোয়।

কপালটা আঙুল দিয়ে আবার চেপে ধরলেন ডেভিড হোপ, তাঁর মাথাব্যথা আবার বাড়ছে।

এগারোটায় নিজের অফিসে ফিরে এলেন ডেভিড হোপ। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত আর নির্জীব দেখাচ্ছে তাঁকে। ডেস্কে বসে দেরাজ থেকে জনি ওয়াকারের একটা বোতল বের করলেন, গ্লাস ধরা হাতটা থরথর করে কাঁপছে। তাঁর এই অবস্থা দেখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মর্টন।

উত্তেজনাকর কয়েকটা মুহূর্ত পেরিয়ে গেল। তারপর মুখ খুললেন ডেভিড হোপ। 'এ সম্পূর্ণ অন্যরকম সমস্যা, মর্টন।'

'স্যার? কি বললেন প্রেসিডেন্ট?'

'আমরা যা ধারণা করেছিলাম পরিস্থিতি তার চেয়ে অনেক খারাপ, মর্টন।'

'স্যার?'

'ওরা তাঁকে গুলি করে মারতে যাচ্ছে,' বললেন অ্যাকটিং হাই কমিশনার। 'কি বলছি বুঝতে পারছ? মি. সিদ্দিকীকে ফায়ারিং স্কোয়ার্ডের সামনে দাঁড় করানো হবে।'

ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেলো মর্টন। 'এ সম্ভব নয়, স্যার। ওরা পাগল নাকি?'

'প্রেসিডেন্ট বোগামুরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন আমাকে, ভুল বোঝাবুঝির কোন অবকাশ নেই। কয়েকটা শর্ত দেয়া হচ্ছে, হার ম্যাজেস্টির সরকার সেগুলো মানবেন না বলে জানালেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হবে।'

'শর্ত? কি শর্ত, স্যার?'

'প্রেসিডেন্ট সেগুলো শিগগিরই আমাদের জানাবেন।'

মর্টন ভাবছে, এরকম পাগলামির কথা কেউ কোনদিন শুনেছে? 'আমার মাথায়

ঢুকছে না, এ-ধরনের একটা অ্যাকশনের কথা বোগামুরা ভাবতে পারছেন কিভাবে?'

'উনি যে একটা সাইকোপ্যাথ, কে না তা জানে!' টাকে হাত বুলাচ্ছেন ডেভিড হোপ। 'শোনো, এখুনি লন্ডনকে পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাও।' শিউরে উঠলেন তিনি। 'ঈশ্বরই জানে হোয়াইটহলে কি প্রতিক্রিয়া হবে। আনিস সিদ্দিকী মারা গেলে আমার ডিপ্লোম্যাটিক ক্যারিয়ার এখানেই শেষ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে মন্ত্রীসভার জরুরী মীটিং শুরু হলো। প্রধানমন্ত্রী কনফারেন্স রূমে ঢুকেই বললেন, 'ল্যাক্স, প্রথমে তুমি শর্তগুলো পড়ে শোনাও, প্লীজ।'

প্রধানমন্ত্রী তাঁর চেয়ারে না বসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইকেল ল্যাক্স, তারপর কাগজগুলো হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন।

'ব্রিটেনকে লুগাম্বার প্রেসিডেন্ট, সরকার ও জনগণের বিরুদ্ধে মিথ্যে প্রচার অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। ভিত্তিহীন যে-সব খবর বিবিসি প্রচার করেছে, তা ভুল ও মিথ্যে বলে ঘোষণা করতে হবে, এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হবে।

'লুগাম্বা থেকে বিতাড়িত বা পলাতক লোকজন যারা ব্রিটেনে আশ্রয় নিয়েছে তাদেরকে ব্রিটিশ সরকার অবশ্যই অবাঞ্ছিত ঘোষণা করবে। তারা উদ্দেশ্যমূলক ও ভিত্তিহীন গুজব ছড়াচ্ছে, এ-সব বন্ধ করতে হবে।

'অন্যান্য রাষ্ট্র যাতে লুগাম্বাকে আর্থিক, কারিগরি ও পণ্য সাহায্য না দেয় সেজন্যে ব্রিটেন যে ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে তা বন্ধ করতে হবে। ট্যুরিস্টদের লুগাম্বায় আসতে নিষেধ করছে ব্রিটিশ সরকার, এটা বন্ধ করতে হবে।

'ব্রিটেন থেকে কেনা মিলিটারি ইকুইপমেন্ট-এর স্পেয়ার পার্টস লুগাম্বাকে দিতে অস্বীকার করছে ব্রিটেন সরকার, এই সমস্যার আশু সমাধান চাই।

'এই শর্তসমূহ ও হুমকি হস্তগত হয়েছে, তা লিখিত ভাবে প্রেসিডেন্ট বোগামুরাকে জানাতে হবে—হয় প্রধানমন্ত্রী জানাবেন, নয়তো রানী। সময়-সীমা দশ দিন। তা না হলে আনিস সিদ্দিকীকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করানো হবে।'

গভীর রাত পর্যন্ত মন্ত্রী সভার মীটিং চলল। প্রেসিডেন্ট বোগামুরা একজন উন্মাদ, তাঁর হুমকি কথার ফানুস নয়, এ-ব্যাপারে প্রায় সবাই একমত হলেন। দু'একজন বললেন, বোগামুরা আসলে সুবিধে আদায় করতে চাইছেন, বিজ্ঞানী আনিস সিদ্দিকীকে খুন করার কোন ইচ্ছে তাঁর নেই। অর্থাৎ কূটনৈতিক আলাপ চালানো যেতে পারে। তবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইকেল ল্যাক্স সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আন্তর্জাতিক জুরিদের কমিশন এক বছর আগে কি রিপোর্ট করেছে আপনাদের তা ভুলে যাওয়া উচিত নয়।'

জুরিদের কমিশন জানিয়েছে, বোগামুরা ক্ষমতায় আসার পর লুগাম্বায় আড়াই থেকে সাড়ে তিন লাখ মানুষ খুন হয়েছে। আক্ষরিক অর্থেই ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন তিনি।

এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'ব্রিটিশ সরকারের নীতি সম্পর্কে আমাদের সবার পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। এ-ধরনের উদ্ভট দাবি আমরা মেনে নিতে পারি না। মেনে নেব না। আবার, বিজ্ঞানী সিদ্দিকী আমাদের একটা অ্যাসেট, কোন অবস্থাতে তাঁকেও আমরা হারাতে পারি না। এই দুটো কথা মনে রেখে সমাধানের কথা ভাবতে

হবে।'

'বিকল্প পন্থাগুলো কি?' জানতে চাইলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

মাইকেল ল্যাক্স বললেন, 'আমরা তিনভাবে চেষ্টা করতে পারি—মিলিটারি, ইকোনমিক ও ডিপ্লোম্যাটিক। এক এক করে ধরা যাক। গানবোট ডিপ্লোম্যাসী বাদ, সহজ কারণ লুগাম্বা সীমান্তে কোন সাগর নেই।'

'প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কি বলেন?' জিজ্ঞেস করলেন প্রধানমন্ত্রী। 'আমরা কি প্লেনে করে সৈন্য পাঠাতে পারি?'

'কাছাকাছি বেস বলতে ভারত মহাসাগরে গ্যান আর ভূমধ্যসাগরে সাইপ্রাস,' প্রতিরক্ষামন্ত্রী বললেন। 'ওই দুই বেস থেকে কেনডুরা প্রায় আড়াই হাজার মাইল দূরে। গ্যানকে বাদ দিতে হবে, কারণ ওখানে এখন আমাদের কোন সৈন্য নেই। ওদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার পর এয়ারফিল্ডটাও রাখা হয়নি, অন্য কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। সাইপ্রাস থেকে সৈন্য পাঠালে প্রথমে ইসরায়েল পর্যন্ত যেতে হবে, ওখান থেকে ফুয়েল নিয়ে পৌঁছুতে হবে গালফ অভ আকাবায়। মিশরের ওপর দিয়ে যেতে হলে অনুমতি দরকার, আমার ধারণা তা পাওয়া যাবে না। তাছাড়া, আরও একটা ফ্যাক্টর হলো—এক স্কোয়াড্রন মিগ ফিফটিন আছে লুগাম্বার।'

স্থল পথেও হামলা চালিয়ে সুবিধে করা যাবে না, কারণ লুগাম্বার রয়েছে ব্রিটিশ স্করপিয়ন আর্মারড কার, ফেরেট স্কাউট কার ও ট্যাংক। এ-সবই ব্রিটিশ সরকার সৌজন্য হিসেবে দান করেছিল বোগামুরাকে। তাঁর সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা বিশ হাজারের ওপর, গোটা দেশে ওটাই বোধহয় একমাত্র সুশৃংখল ইনস্টিটিউশন টিকে আছে। স্থল পথে আক্রমণ চালাতে হলে লুগাম্বার প্রতিবেশী কোন দেশের সাহায্য পেতে হবে। এত বড় ঝুঁকি কোন দেশ নিতে চাইবে বলে মনে হয় না।

তারপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আলোচনা হলো। আংশিক নিষেধাজ্ঞা আগেই আরোপ করা হয়েছে, কোনই লাভ হয়নি তাতে। রাশিয়া ও পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশ গোপনে ব্যবসা করছে লুগাম্বার সঙ্গে। ব্রিটেন লুগাম্বা থেকে কফি আমদানী বন্ধ করলেও অন্য কোন দেশ বন্ধ করেনি।

বাকি থাকল ডিপ্লোম্যাসী।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইকেল ল্যাক্স বললেন, 'আমি একবার কেনডুরায় গিয়ে দেখতে পারি, প্রেসিডেন্ট বোগামুরাকে যদি নরম করা যায়।'

মাথা নাড়লেন প্রধানমন্ত্রী। 'এই পরিস্থিতিতে আমি কাউকে পাঠাতে পারি না। অন্তত তাঁর শর্ত মেনে নিয়ে নয়।'

'আমাদের পক্ষ নিয়ে অন্য কেউ নাক গলালে কেমন হয়?'

'কথাটা আমিও ভেবেছি,' বললেন প্রধানমন্ত্রী। 'অর্গানাইজেশন অভ আফ্রিকান ইউনিটি-র শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কেনডুরায়। বই লেখার অপরাধে একজন লোককে গুলি করে মেরে ফেলা হবে, শীর্ষ সম্মেলনের প্রতিনিধিরা ব্যাপারটাকে সুনজরে দেখবেন না। রিপোর্ট পাওয়া গেছে, পরবর্তী চেয়ারম্যান হবার জন্যে বোগামুরা ক্যানভাস শুরু করেছেন। বর্তমান পরিস্থিতি তাঁর অনুকূলে যাবে বলে আমি মনে করি না।'

'বোগামুরাকে বুঝিয়ে কেউ যদি মি. সিদ্দিকীর প্রাণ বাঁচাতে পারেন, খুবই ভাল

কথা,' বললেন মাইকেল ল্যাক্স। 'কিন্তু শুধু এরকম একটা আশা নিয়ে চুপ করে বসে থাকাটা উচিত হবে না আমাদের।'

'তা ঠিক,' একমত হলেন প্রধানমন্ত্রী। কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন তিনি, তারপর বললেন, 'ল্যাক্স, এই তো কিছুদিন আগেও ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস তোমার অধীনে ছিল, তাই না? বলতে পারবে, দু'মুখো সাপ সবগুলো কি ঝেঁটিয়ে বিদায় করা সম্ভব হয়েছে? আমি জানতে চাইছি, আমরা যদি মি. সিদ্দিকীকে কেনডুরা থেকে গোপনে তুলে আনার নির্দেশ দিই, বিএসএস কি কাজটা সুষ্ঠুভাবে করতে পারবে?'

চিন্তার ভারে মাথাটা নুয়ে পড়ল প্রৌঢ় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর। থমথম করছে তাঁর চেহারা। তিনি কি বলেন শোনার জন্যে অপেক্ষা করছেন সবাই। অবশেষে মুখ তুললেন তিনি, মাথা নাড়লেন ধীরে ধীরে। 'না। ব্যাপারটা গোপন থাকবে, এ নিশ্চয়তা পুরোপুরি দেয়া যায় না। আরও অনেক কারণে বিএসএস-কে দায়িত্বটা দেয়া উচিত হবে না। তবে…,' বলে তিনি চুপ করে গেলেন।

'তবে কি, ল্যাক্স?' প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, আগ্রহ বোধ করছেন তিনি।

'আমরা ভাড়াটে লোকজন ব্যবহার করতে পারি,' বললেন মাইকেল ল্যাক্স। 'তাতে খরচ হয়তো বেশি পড়বে, তবে গোপন রাখার প্রায় ষোলোআনা নিশ্চয়তা আছে।'

'ভাড়াটে লোকজন বলতে?'

'মার্সেনারি। এ-ধরনের কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে যাদের।'

'এক সময় ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস পরিচালনা করেছ, কাজেই এ-ধরনের লোক সম্পর্কে জানো তুমি, প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে, তাই না?'

'হ্যাঁ। আমাকে দায়িত্ব দেয়া হলে…।'

'এখুনি আমরা কোন সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না, তবে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করো তুমি,' বললেন প্রধানমন্ত্রী। 'ব্যাপারটা গোপন রাখার একশো ভাগ নিশ্চয়তা থাকতে হবে, ঠিক আছে?'

রবার্ট পিল নিজেও এককালে মার্সেনারি ছিল। মাঝারি গড়ন তার, চওড়া কাঁধ, কালো চুল ছোট করে ছাঁটা। লন্ডনের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রায়ই তার বিজ্ঞাপন ছাপা হয়—'এক্স কমান্ডো, প্যারাট্রুপার, এসএএস ট্রুপার চাই, ইন্টারেস্টিং কাজ পেতে ইচ্ছুক হলে যোগাযোগ করুন।' বিজ্ঞাপনে শুধু তার ফোন নম্বর থাকে। এ-ধরনের বিজ্ঞাপনে এক কাজে দু'কাজ হয়—মার্সেনারিরা যোগাযোগ করে, যাদের মার্সেনারি দরকার তারাও যোগাযোগ করে। কেউ ফোন করলে নিজের ঠিকানা দেয় সে, কখন আসতে হবে তা-ও জানিয়ে দেয়। কিন্তু আজ সকালে অদ্ভুত একটা ফোন পেল সে।

অপরপ্রান্ত থেকে মার্জিত একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, শুধু অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করলে এই বাচন ভঙ্গি আয়ত্তে আনা সম্ভব। ভদ্রলোক তাকে বললেন, 'বিশেষ কারণে আপনার কাছে আমি যেতে পারছি না, দয়া করে আপনি যদি আমার দেয়া ঠিকানায় একবার আসেন তো ভারি উপকার হয়।'

'কিন্তু স্যার, আপনার পরিচয়টা বলবেন না?'

'আমি উইলিয়াম, উইলিয়াম ক্লিপটন,' অপরপ্রান্ত থেকে বললেন মাইকেল ল্যাক্স।

'আমি সরকারী চাকুরে, তবে কাজটা অফিশিয়াল নয়।'

'সেটা কি, মি. ক্লিপটন?' জিজ্ঞেস করল পিল।

'আমার কয়েকজন লোক দরকার।'

'কি জন্যে? বডিগার্ড?'

'মি. পল, এ-সব আলাপ খোলা লাইনে করা বোধহয় উচিত হবে না। আপনি যদি আসতে রাজি হন তাহলে ঠিকানাটা দিই আমি। তা না হলে থাক, আমি অন্য কোন এজেন্ট খুঁজে নেব।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল পল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, দিন ঠিকানা।'

ঠিকানা দেয়ার পর ল্যাক্স বললেন, এখুনি নয়, দু'ঘণ্টা পর আসবেন আপনি। একতলা বাড়ি, খুঁজে বের করতে আশা করি অসুবিধে হবে না। গার্ড বা কোন লোকজন নেই, সোজা ভেতরে ঢুকে পড়বেন। আপনার জন্যে ড্রইংরূমে অপেক্ষা করব আমি।' যোগাযোগ কেটে দিলেন তিনি।

প্রায় দেড় ঘণ্টা আয়নার সামনে বসে নিজের চেহারা যতটা সম্ভব বদলে নিলেন মাইকেল ল্যাক্স। পরচুলায় ঢাকা পড়ল টাক, বাম ভুরুর ওপর একটা তিল তৈরি হলো, সবুজ চোখ নীল হয়ে গেল। আয়নায় চোখ রেখে হাসলেন তিনি। তাঁর স্ত্রীও এখন তাঁকে চিনতে পারবেন না।

ঠিক সময়ই হাজির হলো পিল। সোজা ড্রইংরূমে ঢুকল সে। সোফা ছেড়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন ল্যাক্স, খাতির করে বসালেন। আপত্তি কানে না তুলে অতিথিকে জনি ওয়াকার পরিবেশন করলেন।

পিল জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক কি ধরনের লোক দরকার আপনার, মি. ক্লিপটন? কি করাতে হবে তাদেরকে?'

'আপনার এজেন্সি সম্পর্কে সবই আমি জানি, মি. পিল,' বললেন ল্যাক্স। 'যে-কোন কাজের জন্যে উপযুক্ত লোক যোগাড় করে দেন আপনি। আমি একটা সামরিক ধাঁচের অপারেশনের কথা ভাবছি।'

নড়েচড়ে বসল পিল। 'ব্যাখ্যা করুন, প্লীজ।'

'ইংল্যান্ডের বাইরে, বৈরী একটা দেশে, এক লোক দুর্ভেদ্য কারাগারে বন্দী হয়ে আছে—তাকে মুক্ত করে আনতে হবে।'

'আচ্ছা!' গলা শুকিয়ে গেল পিলের।

সোফার কিনারায় সরে এসে সামনের দিকে ঝুঁকলেন ল্যাক্স। 'দেখুন, পিল, আমি জানি আপনার এজেন্সি মার্সেনারি রিক্রুট করে। জানি বলেই আপনার সার্ভিস চাইছি আমি। দ্বিধা বা ইতস্তত করে শুধু শুধু সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁকে লক্ষ করছে পিল। বুঝতে চেষ্টা করছে ভদ্রলোক শত্রু নাকি মিত্র। 'সেক্ষেত্রে, মি. ক্লিপটন, কাজটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানান আমাকে। শোনার পর আমি বুঝতে পারব কি ধরনের লোক আপনার দরকার হবে। তারপর ভেবে দেখতে হবে সে-ধরনের লোক আমার পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব কিনা। তার আগে একটা কথা।'

'আমি শুনছি।'

'কাজটা যা-ই হোক, আপনার পরিচয় আমাকে জানতে হবে...।'

পিল তার কথা শেষ করতে পারল না, মাথা নাড়ছেন ল্যাক্স। বললেন, 'কাজটা কি জানার পর আমার পরিচয় সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে যাবেন আপনি, মি. পিল। সেটাই যথেষ্ট, সম্পূর্ণ বা বিস্তারিত পরিচয় জানার দরকার নেই।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে পিল বলল, 'তাহলে কাজের কথাটাই বলুন।'

'কাজটা ইস্ট আফ্রিকায়, মি. পিল। ছোট্ট একটা দল, রেসকিউ মিশনে যাবে।'

'ইস্ট আফ্রিকার কোথায়, মি. ক্লিপটন?' জিজ্ঞেস করল পিল।

'লুগাম্বায়।'

'গড!' আঁতকে উঠল পিল। 'তারমানে আপনি বিজ্ঞানী আনিস সিদ্দিকীর কথা বলছেন! আজ সকালের টেলিগ্রাফেই তো খবরটা পড়লাম।'

'আপনি ভয় পাচ্ছেন? সাহায্য করতে পারবেন না?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পিল বলল, 'আমি ভাবছি খরচার কথা।'

'মানি ইজ নো প্রবলেম,' আশ্বাস দিলেন ল্যাক্স। 'যত টাকা লাগে দেয়া যাবে।'

মনে মনে হিসাব মেলাতে ব্যস্ত পিল। কূটনীতি ব্যর্থ হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার মরিয়া হয়ে উঠেছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসকে দিয়ে কাজটা তারা করাতে চাইছে না, কারণ ব্যাপারটা ফেঁসে গেলে বা কেঁচে গেলে বড় ধরনের খেসারত দিতে হতে পারে। একেবারে শেষ উপায় হিসেবে বাধ্য হয়ে মার্সেনারির সাহায্যে বিজ্ঞানী আনিস সিদ্দিকীকে মুক্ত করে আনার কথা ভাবছে। তার মানে ভাল টাকা খসানো যাবে। লোভ হচ্ছে তার। 'মাথা পিছু পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড,' বলল সে। 'কাজটায়, আমার ধারণা, চার থেকে ছ'জন লোক দরকার হবে।'

'আপনাকে তো আগেই বলেছি, টাকা কোন সমস্যা নয়,' বললেন ল্যাক্স। 'তবে অন্যান্য ব্যাপারে কিছু কথা আছে।'

'কি কথা?'

'কাজটা আমরা বিশেষ কিছু লোককে দিয়ে করাতে চাই,' বললেন ল্যাক্স। 'বন্দী ভদ্রলোক একজন মুসলমান, কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি তাঁকে যারা উদ্ধার করতে যাবে তারাও মুসলমান হলে ঝুঁকির হার কমবে।'

'তা ঠিক,' এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বলল পিল।

'তাহলে আমরা একমত হলাম, মার্সেনারিরা সবাই মুসলমান হবে, ঠিক আছে? এবার লিডার প্রসঙ্গ। ওদের নেতৃত্বে থাকবে আমার পছন্দ করা এক ভদ্রলোক।'

'অর্থাৎ? আপনি বলতে চাইছেন, নেতৃত্বে থাকবে সরকারী কোন অফিসার? পুলিস বা সিক্রেট সার্ভিসের কেউ?'

হেসে উঠে মাথা নাড়লেন ল্যাক্স। 'না। এই ভদ্রলোকের সঙ্গেও আপনিই যোগাযোগ করবেন, আমি শুধু আপনাকে তাঁর পরিচয় জানিয়ে দিচ্ছি। আমার ধারণা, তাঁকে আপনি চেনেন, এই কাজটা নিতে তিনি রাজিও হবেন। অন্তত মানবিক কারণে।'

'কে তিনি?'

'তাঁর নাম মাসুদ রানা। আপনারা প্রায় একই পেশায় আছেন। ভদ্রলোক রানা এজেন্সির ডিরেক্টর।'

রীতিমত বিচলিত দেখাল রবার্ট পিলকে। 'তাঁর সঙ্গে আমার তুলনা করে আপনি

আমাকে অপমান করছেন, মি. ক্লিপটন! মাসুদ রানা শত বছরে মাত্র এক-আধজন জন্মায়, আর আমার মত অধম প্রতি সেকেন্ডে পয়দা হচ্ছে হাজারে হাজার। তিনি আমার আদর্শপুরুষ, মি. ক্লিপটন।'

মিটিমিটি হাসছেন ল্যাক্স। 'বুঝতে পারছেন না, আমারও শ্রদ্ধার পাত্র তিনি। তা না হলে কি এরকম কঠিন একটা কাজে তাঁর নাম সাজেস্ট করি আমি?'

'কিন্তু মাসুদ রানাকে আমার মাধ্যমে দরকার হবে কেন?' পিল বিস্মিত। 'তিনি তো ব্রিটেনেরও নাগরিক। শুধু তা-ই নয়, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের অনারারি উপদেষ্টাও বটেন। আপনারা সরাসরি কেন...?'

'সরকারের সব নীতি বা সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়,' বললেন ল্যাক্স। 'সিদ্ধান্ত হয়েছে, কাজটায় সরকার জড়িত, এটা কোনভাবেই প্রকাশ করা যাবে না। অপারেশন যদি ব্যর্থ হয়, কেউ যেন ব্রিটিশ সরকারকে দায়ী করতে না পারে।'

'কিন্তু এ-ধরনের একটা কাজে মাসুদ রানা আমার মাধ্যমে জড়িত হতে না-ও চাইতে পারেন,' বলল পিল।

'সরকার কেন নেপথ্যে থাকতে চাইছে, আশা করি এটা তিনি বুঝবেন। আমার ধারণা, কাজটা তিনি প্রত্যাখ্যান করবেন না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ল্যাক্স। 'আপনার ফি নিয়েও আমরা কার্পণ্য করব না, মি. পিল। তবে তাঁকে রাজি করানোর দায়িত্বটাও আপনাকেই নিতে হবে।'

'ঠিক আছে, আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলে দেখি। এখুনি আপনাকে আমি কোন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না। আপনার সঙ্গে কখন এবং কিভাবে আমি যোগাযোগ করব?'

'কাল বিকেলে, এখানে,' বললেন ল্যাক্স। 'তবে ভদ্রলোক যদি রাজি না হন, ব্যাপারটা বাতিল হয়ে গেছে বলে ধরে নেবেন। সেক্ষেত্রে যোগাযোগ করার কোন দরকার নেই।'

সোফা ছাড়লেও, দাঁড়িয়ে থাকল পিল। 'আর যদি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান তিনি?'

'কিভাবে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে? আমার তো কোন অস্তিত্বই নেই।'

দুই

তোবড়ানো টিনের প্লেটে ঠাণ্ডা ক'টা ভাত আর মুরগীর প্রায় মাংসহীন একটা ঠ্যাং পড়ে রয়েছে, বার বার ওদিকে তাকাচ্ছেন আনিস সিদ্দিকী, কিন্তু মুখে দেয়ার সাহস পাচ্ছেন না। পচা গন্ধটা ওই খাবার থেকেই আসছে। মগটা তুলে এক ঢোক পানি খেলেন তিনি, তা-ও কেমন লোনা লাগল গলায়।

চৌকো বাক্স আকৃতির সেলটা, লম্বা ও চওড়ায় দশ ফুট; একটাই দরজা, খুললে ধুলো ভর্তি করিডর দেখা যায়। জানালাটা ছোট্ট, তিনটে মোটা লোহার রড থাকায় বাইরের এক্সারসাইজ ইয়ার্ডটা দেখা যায় না। লুবিরি ডিটেনশন সেন্টার সম্পর্কে আগেই শুনেছিলেন তিনি, বলা হয় এখান থেকে একবার কেউ ঘুরে গেলে নরক তার কাছে খুবই আরামের জায়গা বলে মনে হবে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, সেই লুবিরি সেন্টারেই ধরে আনা হয়েছে তাঁকে।

সেলটার ভেতর বন্দী জীবনের দ্বিতীয় রাত কাটাচ্ছেন তিনি।

পুজো গাড়িটায় তুলে সরাসরি তাঁকে এখানে নিয়ে আসা হয়। যুক্তি দিয়ে লোক তিনজনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন তিনি, কিন্তু শারীরিক নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে চুপ করানো হয়েছে তাঁকে। কিছুক্ষণ পর ক্ষান্ত হন তিনি। নিজেকে এই বলে অভয় দেন, তাঁর মত একজন সম্মানী লোককে বেশিক্ষণ ওরা আটকে রাখতে পারবে না। হাই কমিশনে খবর পৌঁছুলে কেউ না কেউ আসবে। কিন্তু তাঁর আশা কর্পূরের মত হাওয়ায় মিলিয়ে গেল গাড়িটা ডিটেনশন সেন্টারে পৌঁছুতে।

গোটা সেন্টার পাথরের তৈরি উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, ওটা ভাঙতে হলে কামান দাগতে হবে। পাঁচিলের মাথায় রয়েছে পাঁচ ফুট কাঁটাতারের বেড়া। গেটের ভেতর ফাঁকা মাঠ, তারপর গাছপালা, আরও খানিক সামনে বিল্ডিংটা। গাড়ি থেকে নামিয়ে রিসেপশন ব্লকে নিয়ে আসা হলো তাঁকে। লাভ হবে না জেনে তিনি কোন বাধা দেননি।

তাঁকে রেখে ফিরে গেল লোক তিনজন। তাদের বদলে অপর তিনজন লোক রয়েছে রিসেপশনে। কেউ তারা হাসছে না। তাদের মধ্যে একজনকে দেখে মনে হলো অফিসার। লোকটার দিকে তাকাতেই আনিস সিদ্দিকীর বুকের রক্ত ছলকে উঠল। কোন কারণ নেই, তাঁর দিকে রক্তচক্ষু মেলে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে। এমন কুৎসিত কদাকার চেহারাও আগে কখনও দেখেননি তিনি।

ডিপার্টমেন্ট অভ স্টেট সিকিউরিটি অর্থাৎ ডস-এর প্রধান মেজর জোসেফ কাগলি। ডেস্কের ওপাশ থেকে এগিয়ে এসে আনিস সিদ্দিকীর সামনে দাঁড়াল সে। সারা মুখে ছোট ছোট অসংখ্য গর্ত, বসন্তের দাগ। সরু গোঁফ, যেন পেন্সিল দিয়ে আঁকা, চিবুকের দুপাশে নেমে এসেছে। মাথার মরচে রঙা চুল, খুলি কামড়ে আছে। মুখটা মাংসল, ঠোঁট জোড়া অসম্ভব পুরু, ওপরের সারির একজোড়া দাঁত ঠোঁটের বাইরে বেরিয়ে আছে।

বুক খোলা খাকি শার্ট আর স্ল্যাকস পরনে, শার্টটা অস্বাভাবিক ঢোলা, ব্রেস্ট পকেটের ওপর তিন সারিতে অনেকগুলো মেডাল রিবন। তার ডান হাতে একটা মালাক্কা স্টিক।

কথা না বলে অন্তত দশ সেকেন্ড আনিস সিদ্দিকীর মুখে গরম নিঃশ্বাস ফেলল মেজর কাগলি। দুর্গন্ধে বমি পেয়ে গেল তাঁর, নিজের অজান্তেই পিছিয়ে এলেন এক পা। তিনি পিছালেন, মেজর কাগলি সামনে বাড়ল। হাতের স্টিক দিয়ে তাঁর নিতম্বের পাশে হালকা বাড়ি মারল সে।

উদ্দেশ্যটা বুঝতে না পেরে আড়ষ্ট বোধ করছেন আনিস সিদ্দিকী। হঠাৎ হাসল মেজর কাগলি। হাতের স্টিকটা আনিস সিদ্দিকীর গালে ছোঁয়াল, মাথায় ঠেকাল তারপর গলার ওপর দিয়ে নামিয়ে আনল বুকে, সেখান থেকে পেটে, সবশেষে নাভির নিচে।

রাগে ও অপমানে কাঁপুনি ধরে গেল, চেহারায় যথাসম্ভব ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলে ভারি গলায় আনিস সিদ্দিকী বললেন, 'এই অসভ্যতার মানে কি?'

'মাফ করবেন।' মেজর কাগলি বিনয়ী সাজার চেষ্টা করলেও চেহারায় ভাবটুকু মানাল না। 'সামান্য একটু ছোঁয়ালাম। ছড়িটা আপনার গায়ে ভাঙতে যাচ্ছি তো।'

দিশেহারা বোধ করলেন আনিস সিদ্দিকী। এ তিনি কাদের পাল্লায় পড়েছেন

'দেখুন, আমার সম্পর্কে আপনারা বোধহয় জানেন না। আমি একজন বিজ্ঞানী, ব্রিটিশ নাগরিক, লুগাম্বায় এসেছি ট্যুরিস্ট হিসেবে। ব্রিটেনের রানীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব আছে···।'

'চোপ, শালা বানচোত!'

অকস্মাৎ বাঘের গর্জন শুনে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেলেন আনিস সিদ্দিকী। মেজর কাগলির ইঙ্গিতে পিছন থেকে এগিয়ে এসে তাঁকে ধরে ফেলল ইউনিফর্ম পরা দু'জন লোক। এরপর শুরু হলো মার।

লোহার মত শক্ত স্টিক দিয়ে আনিস সিদ্দিকীর গায়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করছে মেজর কাগলি। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে সে, অশ্রাব্য গালিগালাজ বেরুচ্ছে মুখ থেকে।

আনিস সিদ্দিকীর মনে হলো তিনি দুঃস্বপ্ন দেখছেন, বাস্তবে এ-ধরনের কিছু ঘটতে পারে না। 'কেন মারছেন আমাকে? কেন?' চিৎকার করছেন তিনি, মারগুলো ঠেকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন।

ফেটে যাচ্ছে হাত আর পায়ের হাড়, কোমর আর পিঠের মাংস ফুলে যাচ্ছে। সম্ভবত মিনিট ছয়-সাত সহ্য করার পর আনিস সিদ্দিকী নেতিয়ে পড়লেন, দেখে মনে হলো অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন।

'সার্চ করো শালাকে,' হুংকার ছেড়ে মার বন্ধ করল মেজর কাগলি। 'ওর কাছে অস্ত্র আছে।'

মেঝেতে পড়ে আছেন আনিস সিদ্দিকী, তাঁর পকেটগুলো হাতড়ানো হলো। কিছুই পেল না, তবে এক লোক তার নিজের পকেট থেকে একটা ল্যুগার পিস্তল বের করে বাড়িয়ে ধরল মেজরের দিকে। 'বন্দীর পকেট থেকে এটা পেলাম, স্যার।'

চোখের পানিতে মুখটা ভিজে গেছে, কোন রকমে মেঝেতে উঠে বসলেন আনিস সিদ্দিকী। 'প্লীজ,' বিড়বিড় করলেন তিনি। 'আপনাদের উদ্দেশ্যটা কি? আমাকে নিয়ে কি করতে চান?'

'লুবিরি ডিটেনশন সেন্টারে যাদেরকে আনা হয় তারা কেউ আর বাঁচে না।' হঠাৎ হেসে উঠে বলল মেজর কাগলি। 'বিনা অনুমতিতে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অপরাধে আপনাকে গুলি করে মারা হবে।'

'কিন্তু ওটা আমার নয়!' প্রতিবাদ জানালেন আনিস সিদ্দিকী।

'আপনি বললেই তো হবে না।' হাসছে মেজর কাগলি। 'আপনাকে সার্চ করে পাওয়া গেছে ওটা।'

'হায় খোদা! তারমানে কি আপনারা আমাকে মিথ্যে মামলায় জড়াবেন?'

'কিসের মামলা?' অবাক দেখাল মেজরকে। তারপর আবার সে হাসল। 'কোনও ট্রায়াল হবে না, বুড়ো ভাম। আমরা তোমাকে বিনা বিচারে গুলি করে মারব।' কথা শেষ করে মাথা ঝাঁকাল।

লোকগুলো ধরল আনিস সিদ্দিকীকে, টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনল প্যাসেজে। প্যাসেজ ধরে এগোবার সময় হঠাৎ তিনি উপলব্ধি করলেন, তাঁর নিজের ফোঁপানোর আওয়াজ ছাড়া গোটা ডিটেনশন সেন্টারে আর কোন শব্দ নেই। বন্দী লোকজন রাতে কত রকম শব্দই তো করে—কাশে, ঘুমের মধ্যে কথা বলে, কাঁদে। অথচ কোন শব্দই

পাচ্ছেন না তিনি। যেন একটা কবরস্থানে রয়েছেন।

খোলা একটা দরজার সামনে থামল ওরা। প্যাসেজের অস্পষ্ট আলোয় আনিস সিদ্দিকী দেখলেন সেলটা খালি। দরজার মুখ থেকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হলো তাঁকে। চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন তিনি, আহত শরীরে ব্যথা পেয়ে ককিয়ে উঠলেন। বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

রাতটা যে কিভাবে কাটল বলতে পারবেন না আনিস সিদ্দিকী। জানালা দিয়ে ভোরের আলো ঢুকল সেলে। ছেঁড়া একটা কম্বলে শুয়ে থাকলেন তিনি, সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা, সেই সঙ্গে জ্বরে কাঁপছেন। ঠাণ্ডা লাগছে তাঁর, কিন্তু কম্বলটা গায়ে জড়াতে পারছেন না। শুকিয়ে যাওয়া বমি আর প্রস্রাবের গন্ধ পাচ্ছেন ওটা থকে। বেলা বাড়তে থাকল, কিন্তু কেউ এল না। দুপুরের দিকে গার্ডদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে দরজায় ঘুসি মারলেন তিনি। শুনেও না শোনার ভান করা হলো। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

বিকেলের দিকে ঘুম ভাঙল কয়েকজন লোকের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে। পাশের সেলে রয়েছে ওরা। ভারি কিছু একটা পতনের শব্দ পেলেন তিনি। তারপর আহত পশুর মত একটা গোঙানি শুনতে পেলেন। গার্ডরা কর্কশ গলায় ধমক দিতে থেমে গেল সেটা।

খানিক পর আবার শুরু হলো রোমহর্ষক আওয়াজটা। এরকম আওয়াজ আগে কখনও শোনেননি আনিস সিদ্দিকী। বাড়তে বাড়তে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছুল, হাত দিয়ে কান দুটো চেপে ধরতে হলো তাঁকে। কোন মানুষের গলা থেকে এরকম আওয়াজ বেরুতে পারে বলে বিশ্বাস করা যায় না। শুনে মনে হবে একটা গরুকে জবাই করা হচ্ছে।

সন্ধের খানিক আগে দরজার নিচের ছোট্ট ফোকর দিয়ে টিনের প্লেটটা ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। খাবারটুকু মুখের কাছে এনে আবার রেখে দিলেন তিনি। চব্বিশ ঘণ্টা পেটে কিছু পড়েনি, তবু এ জিনিস গলা দিয়ে নামবে না। ভাবলেন, কেউ না কেউ অবশ্যই তাঁকে উদ্ধার করতে আসবে। অ্যাকটিং হাই কমিশনার এত দেরি করছেন কেন?

বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন অ্যাকটিং হাই কমিশনার ডেভিড হোপ। লণ্ডন থেকে মেসেজ পাঠানো হয়েছে, 'অপেক্ষা করো, কি করা যায় আমরা দেখছি।'

হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের চারশো ছয় নম্বর ফ্লাইটে চড়ল রবার্ট পিল, ব্রাসেলস-এ পৌঁছুতে এক ঘণ্টা লাগবে। টেলিফোনে রানার সঙ্গে আলাপ হয়েছে তার। কাজটার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছে ও।

'লুগাম্বা থেকে আরও একটা মেসেজ এসেছে,' প্রধানমন্ত্রীকে বললেন মাইকেল ল্যাঙ্ক। 'মি. সিদ্দিকীর সঙ্গে অ্যাকটিং হাই কমিশনারকে দেখা করতে দেয়া হয়নি। লুবিরি ডিটেনশন সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে।'

'সর্বনাশ! ওটা তো ওদের কসাইখানা!'

'বোগামুরা আরও একটা দাবি জানিয়েছেন।'

'আরও একটা মানে?'

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঠোঁটে তিক্ত হাসি। 'তাঁর দাবিগুলো গ্রহণ করা হয়েছে, এটা লিখিতভাবে চান তিনি—বলছেন, লেখাটা নিয়ে আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। ওটায় রানী অথবা প্রধানমন্ত্রীর সই থাকতে হবে।'

'হার ম্যাজেস্টির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে,' বললেন প্রধানমন্ত্রী। 'কিভাবে কি করা হবে তা তিনি জানতে আগ্রহী নন, শুধু দেখতে চান সুস্থ শরীরে আনিস সিদ্দিকী ব্রিটেনে ফিরে এসেছেন।'

'আরও একটা ডেভেলপমেন্টের খবর আছে,' বললেন ল্যাক্স।

'ল্যাক্স, তুমি আমার ওপর নির্যাতন করছ!'

'এটা আমাদের অনুকূলে যেতে পারে।'

'কি রকম?'

'আমার অফিসে স্যার পল ওয়েনডেল ফোন করেছিলেন।'

'চিনলাম না। কে তিনি?'

'বোগামুরার ফোর্থ কিং'স আফ্রিকান রাইফেলস-এর কমান্ডিং অফিসার ছিলেন ভদ্রলোক,' পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানালেন।

'ছিলেন··· অতীত। কি চান তিনি?'

'আমাদের এই সঙ্কটে যে-কোন রকম সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। কাগজে খবরটা পড়ে যেচে পড়ে যোগাযোগ করেছেন।'

'উৎসাহ বোধ করছি,' বললেন প্রধানমন্ত্রী। 'তোমার কোন সাজেশন আছে?'

'চিঠিটা লিখিয়ে, সই করিয়ে, স্যার ওয়েনডেলকে দিয়ে পাঠালে কেমন হয়?'

'দাবি মেনে নেয়ার মত আচরণ হবে সেটা।'

'হবে না, যদি আমরা চিঠিতে শুধু লিখি যে সরকার ও রাজপ্রাসাদের তরফ থেকে আবেদন করা হচ্ছে আনিস সিদ্দিকীকে যেন মানবিক কারণে মুক্তি দেয়া হয়। চিঠিটা ডেলিভারি দেয়ার সময় স্যার ওয়েনডেলও ব্যক্তিগত ভাবে সুপারিশ করবেন। জেনারেলের খুব প্রভাব আছে বোগামুরার ওপর। বোগামুরা গুরুজনের মত শ্রদ্ধা ও মান্য করেন তাঁকে।'

'শুনে আমার চোখে পানি বেরিয়ে আসছে,' প্রধানমন্ত্রী বললেন। 'তবে এতে কাজ হতে পারে বলে মনে হয়। স্যার ওয়েনডেল কি লুগাম্বায় যেতে রাজি আছেন?'

'যে-কোন সাহায্য করতে তিনি রাজি।'

'ঠিক আছে, আবার আমি হার ম্যাজেস্টির সঙ্গে কথা বলব।' এক সেকেন্ড পর প্রধানমন্ত্রী জানতে চাইলেন, 'তোমাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেটার কতদূর কি করলে?'

'ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি,' জানালেন মাইকেল ল্যাক্স। 'খুব তাড়াতাড়ি জানতে পারব কাজটা ওরা নেবে কিনা।'

সকাল এগারোটা, আমস্টারডাম শহর কুয়াশা আর রোদে মাখামাখি হয়ে আছে। ডাম স্কয়ারে ভিড়ের মধ্যে তরুণী ও কিশোরী মেয়েরা বেপরোয়া গতিতে সাইকেল চালিয়ে

লোকজনকে আতঙ্কিত করে তুললেও কেউ কিছু বলছে না। নেদারল্যান্ডে মেয়েরা খুব সম্মানের পাত্রী হিসেবে বিবেচিত, পুরুষদের মত সম অধিকার ভোগ করছে তারাও, এমনকি তাদের অনেক ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা হয়। ওঅরমোয়েস স্ট্রীট পেরিয়ে এসে খালের পথ ধরল হাসান জামিল, তাড়াতাড়ি নিজের রেস্তোরাঁয় পৌঁছুতে চায়। ব্রাসেলস থেকে তার পুরানো বন্ধু মাসুদ রানার আসার কথা আজ।

খালের পাড়ে সারি সারি গাছ, নিচে পাকা মেঝে, খানিক পরপর পাথরের বেঞ্চ ফেলা আছে। পানিতে অসংখ্য বোট। প্রচুর লোক বোটে উঠছে বা নামছে। কোথাও কোন হুড়োহুড়ি বা চিৎকার চেঁচামেচি নেই। স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পানি। গাছের নিচে পাকা ফুটপাথে বা রাস্তায় এক কণা আবর্জনাও চোখে পড়বে না। লোকজন খুব বিনয়ী ও ভদ্র, ছেলে-বুড়ো সবাই প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। এই খালের পাড়ে অনেক রাত পর্যন্ত প্রেমিক-প্রেমিকারা বসে থাকে, কখনও দেখা যায় পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে, বা চুমো খাচ্ছে, কারও কিছু বলার অধিকার নেই। নেদারল্যান্ডের আইনে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

হাসান জামিল আফগান যুবক, চারদিকের এ-সব দৃশ্য দেখে সে তার নিজের দেশের কথা ভাবছে। সে একজন মুক্তিযোদ্ধা, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল। দেশ হানাদারমুক্ত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মৌলবাদী দলগুলো পরস্পরের সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধে এমন মেতে উঠল যে গোটা দেশে নতুন করে আগুন লেগে গেল। সেই আগুনে পুড়ে দেশের সাধারণ মানুষ সর্বস্ব খুইয়েছে, হারিয়েছে বাক-স্বাধীনতা, বন্ধ হয়ে গেছে মুক্তবুদ্ধির চর্চা। যাদের কাছ থেকে নির্দেশ ও প্রেরণা পেয়ে যুদ্ধ করল জামিল, যুদ্ধের শেষে দেখা গেল সবাই তারা গোঁড়া ফ্যানাটিক ও ক্ষমতার মোহে অন্ধ, দেশটাকে অন্ধকার যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। মেয়েদেরকে ঘরের ভেতর বন্দী করে রাখার কথা বলে তারা, কথায় কথায় ফতোয়া জারি করে অমানবিক শাস্তি দেয় মেয়েদের। জামিল তার বড় বোনকে নিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে বাঁচল। একই সঙ্গে বি. এ. পাস করেছিল ওরা, তবে নেদারল্যান্ডে এসে ওরা কোন চাকরি পাবার চেষ্টা করেনি। ভাই-বোন মিলে ছোটখাট একটা রেস্তোরাঁ চালু করে ওরা। সেটাই এখন ভাল ব্যবসা করছে।

কিন্তু ব্যবসা করলে কি হবে, জামিলের রক্তের ভেতর রয়েছে উত্তেজনা আর রোমাঞ্চকর নেশা। আমস্টারডামে আসার পর বিভিন্ন অভিযানে অংশগ্রহণ করেছে সে। ব্রাজিলের রেন ফরেস্টে গেছে গুপ্তধনের সন্ধানে, আফ্রিকার জঙ্গলে সিংহ ও হাতি শিকার করেছে। আফ্রিকাতে শিকার করতে গিয়েই মাসুদ রানার সঙ্গে তার পরিচয়।

ওর চেহারা দেখেই রানা ওকে চিনে ফেলে। ওকে চেনে শুনে হাঁ হয়ে গিয়েছিল জামিল। তারপর জানতে পারে, যে-সব আফগান যোদ্ধা দেশ ছেড়ে বিদেশে বসবাস করছে তাদের একটা তালিকা আছে রানা এজেন্সির কমপিউটরে, ফটো সহ; আর মাসুদ রানা হলো এজেন্সির ডিরেক্টর।

রানাই ওর সামনে নতুন একটা আদর্শ তুলে ধরে। যুদ্ধের প্রতি ওর বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে, এ-কথা শুনে হাসিমুখে প্রতিবাদ জানায় রানা। তারপর বলতে শুরু করে। সারা দুনিয়ায় জুলুম অত্যাচারের কোন শেষ নেই, মানুষ হিসেবে জন্মে সে-সব দেখেও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা স্বার্থপরতা, কাপুরুষতা। বিশেষ করে যুদ্ধের ট্রেনিং নেয়া আছে

যার, দীর্ঘ কয়েক বছর যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা আছে, তার তো অবশ্যই ন্যায় ও মঙ্গলের পক্ষে লড়াই করার জন্যে তৈরি থাকা দরকার।

জামিল প্রশ্ন তোলে, 'কোন্‌টা ন্যায় যুদ্ধ বুঝব কিভাবে? একটানা পাঁচ বছর যুদ্ধ করার পর আবিষ্কার করলাম, অর্জিত সুফল মৌলবাদীরা ধ্বংস করে দিচ্ছে। যুদ্ধ করে তাহলে লাভ কি?'

রানার জবাব ছিল, যে-কোন অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করবে তুমি, অন্যায়টার প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাবে, পরে কি হবে সে-কথা ভেবে নিজের দক্ষতায় মরচে পড়তে দিয়ো না। দুনিয়ার বহু রণক্ষেত্রে ন্যায় ও মঙ্গলের পক্ষ নিয়ে লড়াই করছে মানুষ, চাইলেই তুমি তাদেরকে সাহায্য করতে পারো।

জামিল বলেছিল, সেরকম কোন যুদ্ধে রানা যদি যায়, তাকেও যেন ডেকে নেয় ও।

পরবর্তী দু'বছরে রানার ডাক পেয়ে দুটো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে জামিল। একটা আলজিরিয়ায়, সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে; আরেকটা লেবাননে, ইসরায়েলিদের বিরুদ্ধে। এখন নিজেকে জামিল মানবতাবাদী ও সৎ একজন যোদ্ধা বলে দাবি করতে পারে, জীবনটাকে উৎসর্গ করেছে ন্যায় ও মঙ্গলের পক্ষে। তবে কোন্‌ যুদ্ধটা ন্যায় ও সঙ্গত, সে-সম্পর্কে এখনও তার সংশয় ঘোচেনি। সেজন্যেই সংজ্ঞা নিরূপণের দায়িত্বটা সব সময় রানার ওপর ছেড়ে দেয় ও। রানা যদি বলে ওখানে জুলুম হচ্ছে, চলো রুখে দাঁড়াই, দ্বিধা না করে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়বে জামিল। জামিল শুধু একা নয়, ওর কয়েকজন বন্ধুও এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ, রানার ডাক পাবার জন্যে তারাও এক পায়ে খাড়া হয়ে থাকে।

রেড লাইট ডিস্ট্রিক্ট এড়িয়ে গেল জামিল। ওদিকের সরু সরু পাথর বসানো গলিতে যে-কোন ধরনের যৌন চাহিদা পূরণ করা যায়। বড় বড় জানালার সামনে আর্মচেয়ারে বসে আছে মেয়েরা, জানালার মাথার ওপর বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে খদ্দেরের সব ইচ্ছেই মেটানো হবে। ফ্রী সোসাইটির এটা হলো আরেক দিক, জামিলের সুস্থবুদ্ধি ব্যাপারটা মেনে নিতে পারে না। কেউ ওকে মানা করেনি, রুচিতে বাধে বলে ভুলেও ওদিকে পা বাড়ায় না কখনও। এই গলিগুলোর কিছু মেয়েকে তবু চেনে ও, ওদের রেস্তোরাঁয় মাঝে-মধ্যে খেতে যায়। জামিল অবাক হয়ে দেখে, এ-দেশেও বহু দেহ-পসারিনী কত আরামে আছে। এখানে একজন শ্রমিক যেমন গাড়ি-বাড়ির মালিক হতে পারে, সেরকম একজন পতিতাও তার শরীর বেচে আধুনিক সমস্ত বিলাসিতা ভোগ করতে পারে। দেহ বেচলে কি হবে, অত্যন্ত ভদ্র আর মার্জিত তাদের আচরণ। দু'একজনের সঙ্গে কথা বলে দেখেছে জামিল, প্রায় সবাই তারা শিক্ষিত।

রাস্তার মোড়ে একটা থিয়েটার, খুবই উঁচু মানের নাটক দেখানো হয় এখানে। ওদিকেও জামিল বড় একটা যায় না, কারণ, শুনেছে থিয়েটারের সামনে হোমোসেক্সুয়ালরা আড্ডা মারে।

রাস্তার উল্টোদিকে চলে এসে একটা গলির ভেতর ঢুকে পড়ল জামিল, ওদের রেস্তোরাঁটা শেষ মাথায়, গলির মুখ থেকে দেখা যায়। রেস্তোরাঁর নাম রেখেছে ওরা 'কাবুল'।

চারজন কর্মচারী ওদের। সবাই তারা উপমহাদেশের লোক। ওর বড় বোন, নার্গিস, প্রতিদিন আধ বেলা কাউন্টারে বসে, বাকি সময় স্বামী-সন্তানদের পিছনে ব্যয়

করতে হয় তাকে।

রেস্তোরাঁয় ঢুকে বিশ-পঁচিশজন খদ্দের দেখল জামিল। কারও দিকে তাকাল না, সোজা কোণের একটা টেবিলের দিকে এগোল।

'কেমন আছ, জামিল?' জিজ্ঞেস করল রানা। হাতটা বাড়িয়ে দিল ও।

রানার হাতটা ধরে আফগানী কায়দায় চুমো খেলো জামিল। 'আমি ভাল, দোস্ত। তুমি কেমন আছ? আমি কি তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'মিনিট দশেক। নার্গিস বলল তুমি ডাক্তারের কাছে গেছ। কি ব্যাপার, জামিল?' ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল। 'তুমি কি অসুস্থ?'

'আরে না!' লাজুক হাসি ফুটল জামিলের মুখে। 'অপারেশনে যেতে হবে শুনলে শরীরটা একবার চেক করিয়ে নেয়া আমার অভ্যাস।'

'ভাল অভ্যাস। তারমানে আমার ফোন পেয়ে তুমি একেবারে তৈরি হয়েই আছ?'

একটা চেয়ার টেনে বসল জামিল, উত্তেজনায় চকচক করছে ওর চোখ দুটো। 'কোথায় যাচ্ছি আমরা, রানা?'

'ইস্ট আফ্রিকা, লুগাম্বায়,' বলল রানা। 'তবে যাবার ব্যাপারটা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।'

'লুগাম্বায়...লুগাম্বায়...কিন্তু ওখানে তো কোন যুদ্ধ হচ্ছে বলে শুনিনি। কাগজে দেখি খ্রিস্টানরা স্থানীয় মুসলমানদের ওপর খুব অত্যাচার করছে। মেরে নাকি একদম সাফ করে ফেলছে...।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'তবে আমাদের কাজের সঙ্গে ওই মারামারির তেমন কোন সম্পর্ক নেই। আমরা যাচ্ছি এক বিজ্ঞানীকে বের করে আনার জন্যে।'

'ও, হ্যাঁ, ও আল্লাহ—বিজ্ঞানী ভদ্রলোক, আনিস সিদ্দিকী!'

'জানো তাহলে?'

'কাগজে তো পড়েইছি, আজ সকালে রেডিওতেও শুনলাম। কার মাথাব্যথা, রানা?'

ব্রাসেলসে এসে প্রস্তাবটা রানাকে দেয়ার সময় কোন কথাই গোপন করেনি রবার্ট পিল, রানাও কিছু গোপন না করে সব কথা জানাল জামিলকে। সবশেষে বলল, 'কাজটা যেভাবে পাচ্ছি, একটু সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। তবে এ-ও ঠিক যে ব্রিটিশ সরকার নেপথ্যে থাকতে চাইতেই পারে। ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে সাঙ্ঘাতিক ঝামেলায় পড়তে হবে ওদেরকে।'

'তুমি তাহলে কাজটা নেয়ার পক্ষে?'

'পক্ষে একাধিক কারণে, জামিল,' বলল রানা। 'তোমাকে সব কথা আমার জানানো দরকার, তাহলে সিদ্ধান্ত নেয়া তোমার জন্যে সহজ হবে। প্রথম কারণ, আনিস সিদ্দিকী পুরো না হলেও হাফ বাঙালী। ব্রিটিশ বাপ, বাংলাদেশী মা। তাঁর জন্মও বাংলাদেশে। নিরীহ ভদ্র মানুষ, শুধু একটা বই লেখার অপরাধে তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলবে, এটা মেনে নেয়া যায় না। সব শুনে আমার বস্ সম্মতি দিয়েছেন।'

'আর কি কারণ?'

'কাজটায় টাকা আছে প্রচুর,' বলল রানা। 'প্রস্তাবে বলা হয়েছে মাথাপিছু পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড। খরচ ধরা হয়েছে পাঁচ লাখ। আমি বলে দিয়েছি, খরচ ধরতে হবে দশ

লাখ, আর মাথাপিছু দিতে হবে এক লাখ করে। পিলেরটা আলাদা, যা পারে ওদের কাছ থেকে আদায় করে নেবে।'

অবাক দেখাল জামিলকে। 'আগে তো কখনও তোমাকে আমি টাকার ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিতে দেখিনি।'

'তাহলে আরও একটা কারণ ব্যাখ্যা করতে হয়,' বলল রানা। 'গোটা ব্যাপারটায় কোথাও একটা প্যাঁচ আছে বলে সন্দেহ করছি আমি। প্রস্তাবটা জেনুইন কিনা যাচাই করার জন্যেই টাকার অঙ্ক দ্বিগুণ করে দিয়েছি।'

'প্যাঁচের কথা বলছ···কি ধরনের প্যাঁচ, রানা?'

'জানি না। আমার সন্দেহ মিথ্যেও হতে পারে, আরও একটা কথা তোমাকে জানানো দরকার। বছর খানেক আগে এক লোক আমার সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিচয় দিয়েছিল বাবা সালাহউদ্দিন ফালার প্রতিনিধি হিসেবে। জুলিয়াস বোগামুরাকে খুন করার জন্যে সে আমাকে দশ লাখ পাউন্ড সেধেছিল। প্ল্যানটা তার, আমাকে শুধু অপারেশন চালাতে হবে। লোকটা বোগামুরা আর তার সহকারীদের ডোশিয়েও দিয়েছিল আমাকে। তাতে ফটোগ্রাফ, ম্যাপ, স্কেচ ইত্যাদি ছিল। পরে আমিও কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করি।' ব্রিফকেস খুলে একটা ফোল্ডার বের করল রানা।

'তুমি প্রস্তাবটা গ্রহণ করোনি কেন?'

'রানা এজেন্সি টাকার বিনিময়ে খুন করে না, জামিল। আমি তাকে ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দিই।'

ফোল্ডারটা নিয়ে খুলল জামিল, মন দিয়ে পড়ল কিছুক্ষণ। তারপর সেটা ফিরিয়ে দিল রানাকে।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'এবার বলো, তুমি যাবে?'

হেসে ফেলল জামিল। 'এটা কোন প্রশ্ন হলো না, রানা। তুমি যদি যাও, আমার না যাবার প্রশ্ন ওঠে না।'

'আর ফরহাদ?'

'তার আসার সময় হয়েছে,' হাতঘড়ি দেখে বলল জামিল। 'তুমি বললে সে-ও যাবে।'

'আমি তৌহিদ জাফরের কথাও ভাবছি,' বলল রানা।

মাথা নাড়ল জামিল। 'তাকে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। সে মেক্সিকোয় ছুটি কাটাতে গেছে।'

'জাফর রওনা হয়েছে,' বলল রানা। 'প্রস্তাবটায় বলা হয়েছে, গ্রুপের সবাই মুসলমান হলে ভাল হয়। একটা কারণ হতে পারে, খ্রিস্টানরা কেউ কাজটা করতে চাইবে না, যেহেতু লুগাম্বায় খ্রিস্টান মাকেসি উপজাতিরা ক্ষমতায় রয়েছে। ফোনে ওর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার, আজ সন্ধের মধ্যে আমস্টারডামে পৌঁছে যাবে বলে আশা করছি। ওর জন্যে হোটেল শেরাটনে··· ।'

এক লোক ঢুকল রেস্তোরাঁয়, মুখটা যেন চকচকে কালো পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে। দীর্ঘদেহী, একহারা গড়নের এমন সুপুরুষ খুব কমই দেখা যায়। ছ'ফুট এক ইঞ্চি লম্বা সৈয়দ ফরহাদ, জামিলের মত অতটা চওড়া না হলেও তার অনায়াস চলাফেরার মধ্যে এমন ক্ষিপ্রতা ও শক্তির বিচ্ছুরণ আছে যে তাকে দেখামাত্র সতর্ক না

হয়ে উপায় নেই কারও। অত্যন্ত সৌখিন মানুষ সে, সব সময় থ্রী পীস সুট পরে। সুটের সঙ্গে আজ সে সিল্ক শার্ট ও হাতে বোনা লোফার্স পরেছে। রানাকে দেখে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল সে, সোজা এগিয়ে এসে রানার পায়ে হাত ঠেকিয়ে শ্রদ্ধা জানাল। চেয়ার ছেড়ে তাকে বুকে টেনে নিল রানা।

'কেমন আছ, ফরহাদ?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'দেখে মনে হচ্ছে পুরোপুরি ফিট।'

'আপনার দোয়ায় ভাল না থেকে উপায় কি। ফিট তো থাকবই, টোয়েমেনের সঙ্গে রোজই কোস্তাকুস্তি করছি।' টোয়েমেন হলেন জাপানী কারাতে মাস্টার। 'এখনও আমি আপনার সঙ্গে পারব না, মাসুদ ভাই। টোয়েমেন রোজই আমাকে মনে করিয়ে দেন, তাঁর সারা জীবনে আপনার মত ফাইটার তিনি আর দেখেননি।'

'আমাকে খুব আদর করেন তো, তাই বাড়িয়ে বলেন।' কাজের প্রসঙ্গ তুলল রানা, 'লুগাম্বায় দিন কয়েকের জন্যে বেড়াতে যাচ্ছি আমরা, যাবে নাকি আমাদের সঙ্গে?' ফরহাদ কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে বাধা দিল ও। 'আগে জামিলের কাছ থেকে সব কথা শুনে নাও, ফরহাদ।'

সব কথা শোনার পর ফরহাদ তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল এভাবে, 'পানির মত সহজ কাজই বলতে হবে। প্রাণ নিয়ে ফিরে আসার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। অর্থাৎ বলতে চাইছি, কাজটার মধ্যে চ্যালেঞ্জ আছে। আর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে আমি ভালবাসি।'

'ঠিক আছে, বুঝলাম, তবে আমি চাই বোগামুরা আর লুগাম্বার ইতিহাসটার ওপর তুমি একবার চোখ বুলিয়ে নাও।'

রানার নিয়ে আসা ফোল্ডারে রয়েছে বোগামুরার ক্ষমতায় আরোহণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ওরা যদি আনিস সিদ্দিকীকে লুগাম্বা থেকে উদ্ধার করে আনতে যায়, বোগামুরা ভয়ঙ্কর একটা বাধা হয়ে দেখা দিতে পারেন।

মাকেসি উপজাতির ঘরে জন্ম, কিশোর বয়েসে বোগামুরা লুগাম্বার নীলনদ এলাকায় গরু-ছাগল চরিয়েছেন, অর্থাৎ রাখাল ছিলেন। বিশ বছর বয়েসে কিং'স আফ্রিকান রাইফেলস-এ কুক হিসেবে যোগ দেন তিনি। কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করা ছাড়া ইংরেজি প্রায় জানতেনই না, খেলাধুলার ওপর খুব আগ্রহ ছিল, ছেলেমানুষি আর কিছুটা পাগলামি করতেন বলে অল্প দিনেই খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে একজন ব্রিটিশ অফিসার তাঁকে খুব প্রশ্রয় দিতেন, ফলে তাঁর ইংরেজি না জানার দুর্বলতাকে বড় করে দেখা হয়নি। এই অফিসারের সুপারিশেই তাঁর পদোন্নতি শুরু হয়।

করপোরাল থেকে সার্জেন্ট হবার মাঝখানে ইংলিশ ক্লাসের পরীক্ষাগুলোয় খুব ভুগতে হয়েছে তাঁকে। অ্যাকাডেমিক ব্যাপারগুলোয় তাঁর অযোগ্যতা তখন থেকেই দেখেও না দেখার ভান করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন অফিসাররা। সৈনিক হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন তিনি, আর জানতেন কিভাবে ইংরেজ বসদের মন যুগিয়ে চলতে হয়, ফলে মাঝপথে তাঁকে থেমে থাকতে হয়নি।

আজও বোগামুরা স্পোর্টস-এর ভক্ত, বিশেষ করে রাগবি আর বক্সিং তাঁর প্রিয় খেলা। বক্সিং-এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন পর পর তিন বছর, তাঁর সেই রেকর্ড পরে আর কেউ ভাঙতে পারেনি। এক সময় তাঁকে চ্যালেঞ্জ করবে এমন লোক খুঁজে পাওয়া যেত না।

বোগামুরাকে ক্ষমতায় ওঠার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে ব্রিটিশদেরকেই দায়ী করতে হয়। লুগাম্বা যখন ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা পেতে যাচ্ছে, বোগামুরা তখন সার্জেন্ট মেজর। কর্মকর্তারা সিদ্ধান্ত নেন রেজিমেন্টটাকে আফ্রিকানাইজ করার জন্যে অল্প কয়েকজন আফ্রিকানকে কমিশন দেয়া যেতে পারে। ফোর্থ ব্যাটালিয়ান থেকে যাদেরকে বাছাই করা হলো তাদের মধ্যে বোগামুরাকেও রাখলেন তাঁরা।

কমিশন পাবার পর নিজের গন্তব্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে রঙিন স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন বোগামুরা। লুগাম্বা স্বাধীন হবার ছ'মাস পর আবার পদোন্নতি পেলেন তিনি, লুগাম্বিয়ান আর্মির ডেপুটি কমান্ডার হিসেবে। আবদেল সাঈদ হলেন কমান্ডার, তাঁকে বোগামুরা দু'চোখে দেখতে পারতেন না। দু'জনে একই সময় কমিশন পান, তবে নতুন প্রেসিডেন্ট বাবা সালাহউদ্দিন ফালার ডানহাত হয়ে ওঠেন সাঈদ।

সেনা বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণের আংশিক দায়িত্ব পাবার পর বোগামুরার আসল চেহারা বেরিয়ে আসতে শুরু করল। আচরণ দেখে স্থূল বলে মনে হলেও, তাঁর কুবুদ্ধিতে অসম্ভব ধার, আর নিষ্ঠুরতার কোন সীমা নেই। ডেপুটি কমান্ডার হিসেবে দু'বছর থাকার পর একদিন তিনি প্রেসিডেন্টকে জানালেন, সরকারকে উৎখাত করার একটা ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন তিনি, যে-কোন দিন আবদেল সাঈদ ক্ষমতা দখল করে নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করবেন। যে-কোন মিথ্যাকে এমন কৌশলে পরিবেশন করতে পারেন তিনি, বিশ্বাস না করে কোন উপায় থাকে না। প্রেসিডেন্ট বাবা সালাহউদ্দিন তাঁর ফাঁদে পা দিলেন, ডেপুটি কমান্ডারকে সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে বললেন, যে-ভাবে পারো হুমকিটা দূর করো। পরদিনই আবদেল সাঈদ আর তাঁর সমর্থকদের গ্রেফতার করা হলো, নিজেদেরকে তারা নির্দোষ বলে দাবি করার আগেই সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলা হলো। এতদিনে লুগাম্বিয়ান আর্মি পুরোপুরি বোগামুরার হাতের মুঠোয় চলে এল।

এই সময় বেলজিয়ান কঙ্গোয় গণযুদ্ধ চলছিল। বাবা সালাহউদ্দিন যে বিদ্রোহীদের পক্ষে, এটা কোন গোপন ব্যাপার ছিল না। বিদ্রোহীদের অস্ত্র আর সামরিক যানবাহন সরবরাহ করার নির্দেশ দিলেন তিনি বোগামুরাকে। বিদ্রোহীদের নেতা আসির কুলুমবা আর তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বোগামুরাকে তিনি ব্যবহার করলেন।

অস্ত্র কেনার নগদ টাকা বিদ্রোহীদের ছিল না, তবে অসংখ্য ট্রাক ভর্তি আইভরি আর সোনা ছিল। এ-সব তারা পাইকারী হারে শহর আর গ্রাম লুঠ করে সংগ্রহ করেছিল। বাবা সালাহউদ্দিনের কনট্যাক্ট হিসেবে বোগামুরার দায়িত্ব হলো ওই আইভরি আর সোনা বিক্রি করে মিলিটারী হার্ডওয়্যার কেনা।

এই কাজটায় কোন রেকর্ড রাখা হয়নি, ফলে কেউ জানতে পারল না কত টাকায় কি বিক্রি করলেন বোগামুরা। আইভরি আর সোনা বিক্রির বেশিরভাগ টাকাই নিজের নামে ব্যাংকে জমা রাখলেন তিনি। তবে হঠাৎ করে তাঁর ধনী হয়ে ওঠা নিয়ে চারদিকে সমালোচনা শুরু হলো। কথাটা প্রেসিডেন্ট বাবা সালাহউদ্দিনের কানেও উঠল। পার্লামেন্ট থেকে বলা হলো, তদন্ত করে দেখা হোক।

কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি, অন্যতম কারণ ছিল বোগামুরার বিরুদ্ধে যে চারজন মন্ত্রী অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন তাঁরা হঠাৎ বাতাসে মিলিয়ে গেলেন। গভীর জঙ্গলে পচা লাশ ও কবর সম্পর্কে অসমর্থিত একটা গুজব অবশ্য শোনা গিয়েছিল,

তবে পাওয়া যায়নি কিছুই। লোকে বলাবলি শুরু করল যে ধাঁধাটার উত্তর হয়তো নীল নদের কুমীরদের জানা আছে, তবে কেন তারা হাসছে এ-কথা জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি কারও। কাজেই প্রমাণের অভাবে জোসেফ বোগামুরার বিরুদ্ধে অভিযোগটা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এ-ব্যাপারে বিদেশী কূটনীতিকদের চাপও কম ছিল না। ব্রিটিশ, আমেরিকান ও জার্মান ভদ্রলোকরা সবিনয়ে জানিয়ে দিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী সামরিক কর্মকর্তা বোগামুরার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হলে তাঁরা খুশি হবেন না। বাবা সালাহউদ্দিন উপলব্ধি করলেন তাঁর আর্মি কমান্ডার কতটা শক্তিধর।

এরপরই প্রেসিডেন্টের প্রাণের ওপর হামলা হলো।

এক ডিসেম্বরের উনিশ তারিখ সন্ধ্যায় লুগাম্বান পিপল'স কংগ্রেসে ভাষণ দিতে এলেন বাবা সালাহউদ্দিন। মীটিং শেষে কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি, গাড়ি আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। হঠাৎ একটা গুলির শব্দ হলো। বাবা সালাহউদ্দিন আর তাঁর সঙ্গীরা শুয়ে পড়লেন, হামাগুড়ি দিয়ে আড়ালে সরে যাবার চেষ্টা করছেন। তাদের ঠিক মাঝখানে একটা গ্রেনেড ফেলা হলো। ভাগ্যই বলতে হবে, সেটা ফাটল না। তবে মার্কসম্যান আবার গুলি করল। এবার আহত হলেন বাবা সালাহউদ্দিন। বুলেট তাঁর ঠোঁট ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, নিচের সারির দুটো দাঁতও হারালেন তিনি, ওই একই বুলেট তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির ঘাড়ে সামান্য টোকা দিল। আশ্চর্যই বলতে হবে, বাবা সালাহউদ্দিনের আঘাত গুরুতর ছিল না। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও এক হপ্তার মধ্যে অফিসে ফিরে এলেন তিনি।

অকুস্থল থেকে পালাবার সময় গুলি খেয়ে মারা গেল আততায়ী। লাশ সনাক্ত করা হলো—মাকেসি উপজাতির লোক সে, খ্রিস্টান, বোগামুরার পাশের গ্রামে জন্ম। সেদিন সন্ধ্যার মীটিঙে বোগামুরা উপস্থিত না থাকায় অনেকেই সন্দেহ করলেন তাঁকে। কিন্তু এবারও প্রমাণের অভাবে তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা গেল না। তবে প্রেসিডেন্ট বুঝতে পারলেন এখন থেকে প্রতি মুহূর্ত সাবধানে থাকতে হবে তাঁকে।

ছয় হপ্তা পর, সিনিয়র আর্মি অফিসারদের এক মীটিঙে, সেকেন্ড ইন কমান্ড ব্রিগেডিয়ার আবদুর রহিম নকুইকির সঙ্গে তুমুল তর্ক হয়ে গেল বোগামুরার। সামরিক বাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ছে, এবং বোগামুরা শুধু খ্রিস্টান অফিসারদের প্রমোশন দিচ্ছেন, এই ছিল নকুইকির অভিযোগ। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের তিন দিন পর গ্রামের বাড়ির পাশে পচা এক ডোবায় ব্রিগেডিয়ার আর তাঁর স্ত্রীর লাশ পাওয়া গেল। বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। ম্যাশেটির আঘাতে ধড় থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল নকুইকির মাথা। আর তাঁর স্ত্রীর স্তন ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে নেয়া হয়।

নিজের কুকর্মের ছাপ মুছে ফেলেন বোগামুরা। তদন্ত অনুষ্ঠানের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন তিনি। পুলিস যাদেরকে প্রশ্ন করার সিদ্ধান্ত নিল একে একে সবাই তারা গায়েব হয়ে যেতে শুরু করল, কিংবা বিশেষ দায়িত্ব পেয়ে ঠিক সময়মত বিদেশে চলে গেল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কারও বিরুদ্ধেই কোন অভিযোগ আনা সম্ভব হয়নি।

পরের বছর জুন মাসে প্রসিডেন্টের ওপর দ্বিতীয় দফা হামলা হলো। খুব সকালে কেবিনেট মীটিঙে যোগ দিতে আসছিলেন বাবা সালাহউদ্দিন, বসেছিলেন লিমোজিন-এর পিছনের সীটে। সামনে পুলিস এসকর্ট ছিল, ট্রাফিককে সতর্ক করার জন্যে আলোক

সঙ্কেত দেয়া হচ্ছিল। পার্লামেন্টের কাছাকাছি, থ্রী মুনস হোটেলের সামনে, হঠাৎ শুরু হলো মেশিন গানের ফায়ার। প্রেসিডেন্টের মার্সিডিজে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট লাগল। গুঁড়ো হয়ে গেল উইন্ড স্ক্রীন, ড্রাইভারের মাথা বিস্ফোরিত হলো, লাল রক্ত আর হাড় মুহূর্তের জন্যে দেখতে হলো ছোট্ট একটা মেঘের মত। গুলি শুরু হতেই সীটের নিচে শুয়ে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট। মার্সিডিজের গা ভেদ করে ভেতরে ঢুকল বুলেট, ভাগ্যগুণে আহত হলেন না তিনি। এসকর্ট কার পিছিয়ে এসে হামলার উৎসের দিকে রওনা হলো ঠিকই, কিন্তু ততক্ষণে বন্দুকধারীরা অদৃশ্য হয়ে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন বাবা সালাহউদ্দিন, থরথর করে কাঁপছেন।

এই ঘটনার পর বাইরে বেরুনো কমিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট। গোপন একটা পুলিস বাহিনী ছিল, শুধু তাঁর নির্দেশে কাজ করত তারা। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, সন্দেহ হয় এমন সব লোককে পাকড়াও করো। সিক্রেট পুলিস খুব উৎসাহ নিয়ে শুরু করল কাজটা।

প্রেসিডেন্ট ভয়ে বাইরে বেরুচ্ছেন না, এ-ধরনের একটা গুজব ছড়ানো হলো শহরে। বাবা সালাহউদ্দিন দেশবাসীর আস্থা হারাতে শুরু করলেন, লোকের সন্দেহ হলো তিনি সম্ভবত সরকার চালাতে সমর্থ নন। আশপাশের সবাইকে শত্রু বলে ভাবতে শুরু করলেন তিনি। তবে সবার মনেই প্রশ্ন, হামলার পিছনে বোগামুরার হাত ছিল কি?

চার মাস পর অনেক দিন আগের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে মিশর সফরে গেলেন বোগামুরা। তিনি লুগাম্বা ত্যাগ করার পর তাঁর কীর্তিকলাপ তদন্ত করে দেখার সিদ্ধান্ত নিলেন প্রেসিডেন্ট, সেই সঙ্গে তাঁর সুপারিশে সামরিক বাহিনীতে যাদের পদোন্নতি হয়েছিল তাদেরকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করলেন। কিন্তু বোগামুরার লোক আছে সবখানে, তারা তাঁকে টেলিফোনে জানিয়ে দিল প্রেসিডেন্ট কি করতে যাচ্ছেন। সফর সংক্ষিপ্ত করে হঠাৎ তিনি দেশে ফিরে এলেন। বলাই বাহুল্য, বাবা সালাহউদ্দিন খুব বিব্রত অবস্থায় পড়লেন, তাঁর পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গেল।

পরবর্তী কয়েক মাস কিছুই ঘটল না। তবে রাজধানীর পরিবেশ খুব থমথমে। এ যেন ঝড়ের পূর্বাভাস। নিরাপত্তা জনিত কোন হুমকি নেই, যেন এ-কথা বোঝাবার জন্যেই প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করলেন কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে সিঙ্গাপুর যাবেন তিনি।

পরের বছর, পঁচিশে জানুয়ারি, একটা বোয়িং সেভেন-জিরো-সেভেনের ফার্স্ট ক্লাস সেকশনে বসে রয়েছেন বাবা সালাহউদ্দিন, শীর্ষ সম্মেলন শেষ করে দেশে ফিরছেন। বোম্বে থেকে রওনা হবার পর দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, নাইরোবির পথে রয়েছে বোয়িং, এই সময় খবরটা এল।

আহমেদ ওকুতো, প্রেসিডেন্টের প্রাইভেট সেক্রেটারি, ফ্লাইট ডেকে বসে পাইলটদের সঙ্গে গল্প করছিলেন, বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস থেকে প্রচারিত খবরটা শুনতে পেলেন। বিবিসি লুগাম্বা রেডিওর ঘোষণাটাই শুধু প্রচার করল, তাতে বলা হয়েছে যে মেজর জেনারেল জোসেফ বোগামুরার নেতৃত্বে একদল আর্মি অফিসার দেশের ক্ষমতা দখল করেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্টকে খবরটা জানালেন ওকুতো। নাইরোবিতে পৌঁছুনোর পর খবরের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেল।

স্বভাবতই লুগাম্বায় আর না ফেরার সিদ্ধান্ত নিলেন বাবা সালাহউদ্দিন। ইস্ট

আফ্রিকান এয়ারওয়েজের ডিসি-নাইনে চড়ে তাঞ্জানিয়ার দার-এস-সালামে চলে এলেন তিনি। তাঞ্জানিয়ার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নায়ারে স্বাগত জানালেন তাঁকে, ঘোষণা করলেন বাবা সালাহউদ্দিন ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়া হবে।

বোগামুরার গোপন নির্দেশে সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন আগেই শুরু হয়েছিল। খ্রিস্টান ব্যবসায়ীদের ব্যাংক থেকে ঋণ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি, তারা যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কিনে মউজুদ করতে পারে, ফলে দ্রব্যমূল্য অসম্ভব বেড়ে যায়। সাধারণ মানুষ এত সব বোঝে না, দেশের এই দুরবস্থার জন্যে বাবা সালাহউদ্দিনকেই দায়ী করত তারা। শেষ দিকে তাঁর জনপ্রিয়তা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। তাঁকে উৎখাত করার ঘটনায় সবাই খুশিই হলো বলা যায়।

লুগাম্বার মানুষ বোগামুরাকে 'মুক্তিদাতা' হিসেবে বরণ করে নিল।

পরে অবশ্য তাদের ভুল ভাঙল, কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ক্ষমতা দখলের পর পরই বোগামুরা ঘোষণা দিলেন, তিনি একটা কেয়ারটেকার সরকার গঠন করেছেন। কয়েক মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন দেয়া হবে। তাঁর কেয়ারটেকার সরকারে সিভিলিয়ানরাই থাকলেন শুধু, বাবা সালাহউদ্দিনের মন্ত্রীসভা থেকেও কয়েকজনকে নেয়া হলো। ভাবসাব দেখে মনে হলো এবার লুগাম্বা সুদিনের মুখ দেখবে।

তারপরই শুরু হলো হত্যাকাণ্ড। সূচনা করা হলো সেনাবাহিনী থেকে। খ্রিস্টানরা দেশে সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও বোগামুরা সেনাবাহিনী প্রধান হবার পর মুসলমান সৈনিকদের ছাঁটাই করে খ্রিস্টানদের পাইকারী হারে রিক্রুট করা হয়েছে, ফলে সেনাবাহিনীতে তারাই এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাবা সালাহউদ্দিনের সমর্থক, এই অভিযোগে মুসলমান সৈনিক ও অফিসারদের গ্রেফতার করে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করানো হলো। বলা হলো শুদ্ধি অভিযান শুরু হয়েছে।

সময়সাপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার প্রতি বোগামুরার কোন আস্থা নেই, সিক্রেট পুলিসের প্রধান মেজর কাগলিকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা দেশের দুর্গন্ধময় আবর্জনা, কাউকে সন্দেহ হলেই ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে এসো, বিচারের ঝামেলায় যাবার কোন দরকার নেই। অদ্ভুত ব্যাপার, সন্দেহভাজন হিসেবে যাদেরকে ধরা হলো সবাই তারা মুসলমান, তাদের মধ্যে একজনও খ্রিস্টান থাকল না।

প্রতিদিন যত লোককে গ্রেফতার করা হয় সবাইকে সেদিনই মেরে ফেলার আয়োজন করা সম্ভব হলো না। মাবোরো কারাগার উপচে পড়ার অবস্থা হলো। প্রতিদিন আরও আসছে।

সকাল-বিকাল ট্রাকে তুলে বন্দীদের কারাগার থেকে বের করে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়, জ্যান্ত কবর দিয়ে ফিরে আসে কারারক্ষীরা। সবাই তারা মাকেসি উপজাতির খ্রিস্টান, বোগামুরার প্রতি অনুগত।

দু'মাস পর আর্মড ফোর্সেস ডিক্রী জারি করলেন বোগামুরা। এই আইনে সেনাবাহিনীর লোকজন ও সিক্রেট পুলিস যে-কোন বাড়িতে ঢুকে সার্চ করতে পারবে, বাজেয়াপ্ত করতে পারবে যে-কোন জিনিস, সেজন্যে তাদেরকে কারও কাছে কোন জবাবদিহি করতে হবে না, কোন আদালতে তাদের বিরুদ্ধে মামলাও করা যাবে না। এরপর জারি করা হলো ডিটেনশন ডিক্রী। এই আইনে যে-কোন লোককে বিনা বিচারে

আটক রাখা যাবে। কিছুদিন পর আরও একটা আইন জারি করা হলো—রবারি স্নাসপেক্টস ডিক্রী—আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকেরা সন্দেহ হলে যে-কোন লোককে গুলি করতে পারবে।

এই সব আইনে প্রথম চার মাসে খুন হয়ে গেল বিশ হাজার লোক।

মানবাধিকার, গণতন্ত্র, মুক্ত বুদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে যারা শোরগোল তোলে, সেই পশ্চিমা অর্থাৎ প্রথম বিশ্ব লুগাম্বার এই হত্যাকাণ্ড দেখেও না দেখার ভান করল, কেউ কেউ চক্ষুলজ্জার খাতিরে শুধু লিখিত বিবৃতি প্রচার করে দায় এড়াল।

নতুন সরকারকে প্রথমে স্বীকৃতি দিল ব্রিটেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় অস্ত্র সরবরাহ করে বলে বাবা সালাহউদ্দিন খুব কড়া সমালোচনা করতেন ব্রিটেনের। ব্রিটিশরা ধারণা করল, নতুন সরকার প্রধান বোগামুরা বিষয়টাকে সহানুভূতির চোখে দেখবেন। সম্পর্কটা ভাল করার জন্যে লুগাম্বার জন্যে মোটা টাকা অনুদানও বরাদ্দ করল তারা।

হত্যাকাণ্ড চলছেই। প্রতিদিন লাশের সংখ্যা এত বেশি হচ্ছে যে ট্রাকে করে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার সময় পাওয়া যায় না। মেজর কাগলির নির্দেশে ট্রাকগুলো এরপর নীল নদের দিকে রওনা হলো, কিনারা থেকে লাশগুলো ফেলে দিল কিগালা ফলস-এ।

কিগালা জলপ্রপাত প্রায় দু'শো ফুট উঁচু। ওপর থেকে নিচে পড়ার পর লাশগুলো ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়, চেনার আর কোন উপায় থাকে না। যে-টুকু অবশিষ্ট থাকে, গোগ্রাসে সব খেয়ে ফেলে কুমীর। কিছুদিন পর দেখা গেল নদীতে ফেলতেও ঝামেলা হচ্ছে। লাইন দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় ট্রাকগুলোকে, বিরক্ত ড্রাইভাররা নদী থেকে খানিক দূরে লাশ নামিয়ে ফিরে যায়। সেই লাশের স্তূপ কয়েকদিন পড়ে থাকে ওখানে, পচে দুর্গন্ধ ছড়ায়, চিল আর শকুনের খাদ্যে পরিণত হয়।

তারপর রোমহর্ষক সব খবর আসতে লাগল। বাবা সালাহউদ্দিনের গ্রাম এক রাতে খালি করে ফেলা হয়েছে। গ্রামে সব মিলিয়ে মুসলমানের সংখ্যা ছিল এগারোশো। ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ কিছু মানা হয়নি, সবাইকে মেরে ফেলা হয়েছে। বোগামুরা তদন্ত অনুষ্ঠানের প্রহসন করলেন। তদন্তকারী অফিসাররা রিপোর্ট দিলেন, অভিযোগ ভিত্তিহীন, গ্রামের লোকজন অকারণ ভয়ে পালিয়ে গেছে। প্রতিবাদ করার সাহস হলো না কারও।

তবে প্রতিশ্রুত ঋণের টাকা দিতে অস্বীকার করল ব্রিটেন। বোগামুরা খেপে গেলেন।

লুগাম্বার বেশিরভাগ ব্যবসা, শিল্প-কারখানা, খেত-খামার আর দোকান-পাট নিয়ন্ত্রণ করত এশিয়ানরা, তাদের মধ্যে অনেকের ছিল ব্রিটিশ পাসপোর্ট। ম্যানেজার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ডাক্তার, উকিল আর টেকনিশিয়ান বলতেও এশিয়ানদেরকে বোঝায়। বোগামুরা তাদের নাম দিলেন রক্তখেকো জোঁক।

গোটা এশিয়ান সমাজকে লুগাম্বা ত্যাগ করার জন্যে প্রথমে ত্রিশ দিন, পরে তা বাড়িয়ে ষাট দিন সময় দিলেন বোগামুরা। নির্দিষ্ট দিনের পর যারা থেকে যাবে তাদেরকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হবে। ছয় হপ্তার মধ্যে পঁয়তাল্লিশ হাজার মানুষ লুগাম্বা ত্যাগ করল। কেউ গেল কানাডা, কেউ বাংলাদেশে বা ভারতে। ব্রিটিশ পাসপোর্ট রয়েছে এমন লোকের সংখ্যা চল্লিশ হাজার, তাদের মধ্যে পঁচিশ হাজারকে গ্রহণ করল ব্রিটেন। বাকি হাজার হাজার এশিয়ানকে ধরে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হলো। লুগাম্বার

উত্তর প্রান্তে তাড়াহুড়ো করে খাড়া করা হয়েছে ওগুলো, সুদান সীমান্তের কাছাকাছি।

এশিয়ানরাই লুগাম্বার অর্থনীতি টিকিয়ে রেখেছিল, তাদেরকে এভাবে তাড়িয়ে দিয়ে দেশটাকে চরম সঙ্কটে ফেলে দিলেন বোগামুরা। এশিয়ানদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হলো, তাদের বাড়ি-ঘর লুঠ হয়ে গেল। লুঠপাটের ভাগ পেল সেনাবাহিনীর শুধু খ্রিস্টান সদস্যরা, কারণ ওদের সমর্থন ছাড়া বোগামুরা তাঁর ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবেন না।

পরবর্তী কয়েক বছর ক্ষমতার ভিত আরও শক্ত করে নিলেন বোগামুরা। তাঁর মন্ত্রীসভায় সিভিলিয়ানদের চেয়ে সামরিক অফিসাররাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। মন্ত্রীসভার পুরানো দু'জন সদস্য প্রাণ বাঁচানোর জন্যে পালিয়ে তাঞ্জানিয়া আর কেনিয়ায় চলে গেলেন, শুধু পরনের কাপড় নিয়ে। বিবিসির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তাঁরা বললেন, বোগামুরা ক্ষমতায় আসার পর কম করেও আড়াই লাখ লোককে হত্যা করা হয়েছে বিনা বিচারে।

ক্ষমতা গ্রহণের ছ'বছর পর গণভোটের আয়োজন করলেন বোগামুরা। তৃতীয় বিশ্বের সামরিক একনায়করা যে-ধরনের হ্যাঁ ও না ভোট-এর আশ্রয় নেন, এ-ও সেরকম। প্রার্থী তিনি একাই। দেখা গেল শতকরা মাত্র সাত ভাগ ভোট পড়েছে, সেটাকেই সত্তর ভাগ বলে চালানো হলো। গণসভা ডেকে বোগামুরা নিজেকে দেশের আজীবন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করলেন। বললেন, 'দেশের মানুষ আমাকে রাজা বানাতে চাইছে, আমি তাদের প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে প্রেসিডেন্ট হতে রাজি হয়েছি।'

এরপর বাবা সালাহউদ্দিন ক্ষমতা ফিরে পাবার চেষ্টা করলেন।

সেটা ছিল সেপ্টেম্বর মাসের সতেরো তারিখ। ওই একই দিনে এক হাজার গেরিলা, সবাই তারা বাবা সালাহউদ্দিনের সমর্থক, তাঞ্জানিয়া থেকে লুগাম্বা আক্রমণ করল। গোটা ব্যাপারটাই ছিল এক ধরনের ছেলেমানুষি। তাদের না ছিল ভাল ট্রেনিং, না ভাল ইকুইপমেন্ট। কথা ছিল আক্রমণ শুরু করা হবে ভোরবেলা, কিন্তু সীমান্ত পেরুতে দেরি করে ফেলে তারা। যদিও বা অনেক বেলায় সীমান্ত পেরুল, মূল দলের সঙ্গে কামানগুলো রয়ে গেল অনেক পিছনে। প্রতিপক্ষকে চমকে দেয়ার প্ল্যান করা হয়েছিল, পুরোপুরি ব্যর্থ হলো সেটা। গোটা ব্যাপারটাই ম্যাসাকারে পরিণত হলো। বোগামুরার সেনাবাহিনীর পাল্টা হামলায় যারা নিহত হলো না তাদেরকে ধাওয়া করে জঙ্গলের ভেতর খুন করা হলো। আরও বেশ কিছু লাশ পেল নীল নদের কুমীর।

বদরাগী ও খেয়ালী বোগামুরা অভিযোগ করলেন এই হামলার পিছনে হাত আছে ব্রিটেন ও সৌদি আরবের। গেরিলাদের নাকি তারাই অস্ত্র আর ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করেছে। ব্রিটিশ ও সৌদি নাগরিক যারা ব্যবসা করছিল লুগাম্বায় তাদের বহিষ্কার করলেন তিনি। ব্রিটিশ হাই কমিশনারকেও অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হলো। কয়েকটা মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করলেন তিনি।

এই সময়ই রাশিয়া আর ইসরায়েলে প্রচুর লোক পাঠালেন বোগামুরা, মিলিটারি ট্রেনিং নেয়ার জন্যে।

দেশ জুড়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার জন্যে দুটো প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করলেন বোগামুরা। একটা হলো ডিপার্টমেন্ট অভ স্টেট সিকিউরিটি, অপরটি হলো সার্চ অ্যান্ড

সিজার ইউনিট—শেষটা সাসু নামে পরিচিত। দুটোরই স্টাফ মাকেসি উপজাতির খ্রিস্টানরা, তবে কিছু নুবিয়ান আর সুদানিজ খ্রিস্টানও আছে।

ক্ষমতা দখলের পরপরই ডিপার্টমেন্ট অভ টেস্ট সিকিউরিটি গঠন করেন বোগামুরা। আসলে বডিগার্ড ইউনিটটাকেই আকারে বড় করা হয়। ডিপার্টমেন্টের প্রধান মেজর কাগলি তাঁর গ্রামেরই লোক। মেজর কাগলি শুধু প্রেসিডেন্টের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য।

আর সাসু হলো সশস্ত্র সিভিল পুলিস, তাদের কাজ সশস্ত্র ডাকাতদের ধরা। সাসুর প্রধানও মাকেসি উপজাতির একজন খ্রিস্টান, নাম পল মাতুরা। সাসু সদস্যরা সাব-মেশিন গান ব্যবহার করে, ডাকাত সন্দেহে যে-কোন লোককে গুলি করার অনুমতি আছে তাদের।

অদ্ভুত ব্যাপার, এত কিছুর পর এখনও অনেক ব্রিটিশ লুগাম্বায় রয়ে গেছে। সব মিলিয়ে সাত-আটশো হবে তারা—বেশিরভাগই ধর্মপ্রচারক; বাকি সবাই হয় ডাক্তার, শিক্ষক, উকিল বা এঞ্জিনিয়ার।

শ্বেতাঙ্গ পাদ্রীরা দুর্গম জঙ্গলে উপজাতিদের গ্রামগুলোর কাছাকাছি থাকেন। স্থানীয় খ্রিস্টানদের ব্যাপারে তাঁদের তেমন মাথাব্যথা নেই। খ্রিস্টান নয় এমন লোকদেরকে ঈশ্বর-পুত্রের করুণাও আশ্রয় পাইয়ে দেয়ার মহৎ কাজে নিজেদেরকে তাঁরা উৎসর্গ করেছেন।

লুগাম্বা সরকার ব্রিটিশ হাই কমিশনকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করার পর এই সব লোকজনের স্বার্থ ও নিরাপত্তার দিকটা দেখার কেউ ছিল না। ডেভিড হোপ কেনিয়ায় হাই কমিশনার ছিলেন, অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে লুগাম্বায় তাঁকে পাঠানো হলেও পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি। তবে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অদ্ভুত এক উপায়ে তাদের নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা করছেন।

লুগাম্বান এয়ারলাইন্সের প্রকাণ্ড আকারের একজোড়া কার্গো প্লেন হপ্তায় দু'বার এসেক্স-এর স্টানস্টেড এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করে। এই ফ্লাইটগুলোকে হুইস্কি রানস বলা হয়। প্লেনগুলো চালায় আমেরিকান পাইলটরা। স্টানস্টেডে পৌঁছুনোর পর সম্ভাব্য সব ধরনের বিলাস দ্রব্য তোলা হয় প্লেনে—লেটেস্ট মডেলের গাড়ি থেকে শুরু করে দামী সিগারেট, কিছুই বাদ দেয়া হয় না। এ-সব লুগাম্বায় পাঠানো হয় সেনাবাহিনীর বিশ হাজার সদস্যের জন্যে, যারা বোগামুরাকে ক্ষমতায় থাকতে সাহায্য করছে। নগদ নয়, পণ্য সাহায্য দিয়ে বোগামুরাকে প্রোটেকশন দিচ্ছে ব্রিটেন।

বোগামুরার ওপর যে হামলা হয়নি তা নয়। চাকরি হারানো মুসলমান সামরিক অফিসাররা কয়েকবারই তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। লোকটা যেন অজেয়। সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, দু'শো পঞ্চাশ পাউন্ড ওজন, জুলিয়াস বোগামুরা তাঁর দেশবাসীর বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছেন। দেহরক্ষীরা সারাক্ষণ তাঁকে যেভাবে ঘিরে রাখে, যে-কোন সুইসাইড মিশনও ব্যর্থ হতে বাধ্য।

তিন

কাগজগুলো রেখে দিয়ে ফটোগুলো পরীক্ষা করছে ফরহাদ। সাদা-কালো ও রঙিন

ফটো, প্রতিটির পিছনে বিবরণ লেখা আছে। শুধু লোকজনের ছবি নয়, ল্যান্ড মার্ক, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিও আছে।

বোগামুরা, মেজর কাগলি আর সাসু প্রধান পল মাতুরার ফটোগুলো পাসপোর্ট সাইজের। দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রীসভার সদস্যদেরকে দেখা যাচ্ছে একটা গ্রুপ ফটোয়। রাজধানী কেনডুরায় বোগামুরার সরকারী বাসভবন ডস হেডকোয়ার্টার থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে, আলাদা আলাদা কয়েকটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে ওগুলো। তাছাড়াও আর্মি ব্যারাক, হাসপাতাল, রেলওয়ে স্টেশন, পার্লামেন্ট ভবন ও এয়ারপোর্টের ছবি রয়েছে। 'সন্দেহ নেই এগুলো কাজে লাগবে,' দেখা শেষ করে মন্তব্য করল ফরহাদ।

'তুমি তাহলে যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'যুদ্ধে যাওয়া আমার নিয়তি,' বলল ফরহাদ। 'এই নিয়তি লেখা হয়েছে যেদিন আমার বাবার লাশ ফিরে এল বাড়িতে।'

আপন দেশে উদ্বাস্তু ছিল সৈয়দ ফরহাদ। প্যালেস্টাইনে জন্ম তার, ইসরায়েল দখল করে নেয়ার পর ক্যাম্পে থাকত ওদের পরিবার। ওর বাবা ছিলেন ডাক্তার। খুব ভাল হাতযশ থাকার কারণে ইসরায়েলিরা তাঁকে প্র্যাকটিস করার অনুমতি দেয়। কুষ্ঠরোগীদের একটা কলোনিতে সকাল-বিকাল বসতেন তিনি। ক্যাম্পে থাকলেও ভালই রোজগার করতেন, ছেলেকে স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করাতে কোন অসুবিধে হয়নি। ক্যাম্পে থাকলে যে-কোন দিন ইসরায়েলি স্পাই বা পুলিস ধরে নিয়ে যাবে, এই ভয়ে ছেলেকে তিনি ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেন। আইন পড়ার জন্যে অক্সফোর্ডে ভর্তি হয় ফরহাদ। সে সময় মা-বাপকে দেখার জন্যে বছরে একবার ছুটি নিয়ে দেশে ফিরত সে। তার বাবা ছিলেন ডাক্তারী পেশার প্রতি আত্মনিবেদিত, যুদ্ধের কারণে নিজ দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াননি। বাড়িতে থাকলে বাপের সঙ্গে কুষ্ঠরোগীদের ওই কলোনিতে ফরহাদও মাঝে মধ্যে যেত।

যেদিনের ঘটনা তার আগের দিন প্যালেস্টাইনী গেরিলারা নতুন বসতি স্থাপনকারী ইহুদিদের কয়েকটা বাড়ি-ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়, আগুনে পুড়ে কয়েকজন লোক মারাও যায়। খবরটা ফরহাদের বাবা জানতেন, তবে ইহুদিরা তাঁকে সবাই চেনে বলে পরদিনও তিনি কলোনিতে যাবার জন্যে ক্যাম্প থেকে বের হন। পথে চরমপন্থী একদল ইহুদি তাঁকে থামায়। তিনি মুসলমান কিনা জিজ্ঞেস করায় সত্যি কথাই বলেন ভদ্রলোক। উত্তর পাবার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে তারা। আহত ডাক্তারকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়। তারপর লাশটা ফেলে চলে যায় তারা। অনেকক্ষণ পর স্থানীয় কিছু লোক লাশটা হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। বাবার লাশ দেখার এক ঘণ্টা পর সীমান্ত পেরিয়ে লেবাননে চলে আসে ফরহাদ, যোগ দেয় প্যালেস্টাইনী গেরিলাদের দলে। গেরিলাদের একটা ইউনিটের নেতৃত্ব দিচ্ছিল তখন রানা, ওর দলে হাসান জামিলও ছিল। আর ছিল একটা মেয়ে, যদিও সে সময় রানা ছাড়া কেউ জানত না যে সে মেয়ে।

দু'জনই ওরা ট্রেনিং দেয় ফরহাদকে। প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফরহাদ রাতারাতি একটা কিলিং মেশিনে পরিণত হয়। রানার নেতৃত্বে গেরিলাদের ওই ইউনিটের দায়িত্ব ছিল লেবাননের ভেতর ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জোর করে যে ছাউনি তৈরি করেছে সেটাকে ধ্বংস করা। দুটো মাস প্রতিপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে ওরা।

গিরিখাদের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চোরাগুপ্তা হামলা চালানো হত, আক্রমণের ফলাফল কি হয়েছে দেখার জন্য অপেক্ষায় না থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসত আবার। কিন্তু ফরহাদ ফিরত সবার শেষে। ইসরায়েলিরা কি কি হারিয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যেত তার মুখ থেকে। অবশেষে রণকৌশলগত কারণে ছাউনি তুলে নিয়ে পিছিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় প্রতিপক্ষ, ফলে রানা ও জামিল মেয়েটাকে নিয়ে লেবানন ত্যাগ করে। ফরহাদ প্যালেস্টাইনী গেরিলাদের সঙ্গে অন্য এক যুদ্ধক্ষেত্র বেছে নেয়।

এরপর আবার তিনজনের দেখা হয় আলজিরিয়ায়। ফরহাদের মা আর বোন ক্যাম্প থেকে পালিয়ে আলজিরিয়ায় চলে আসে, তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসে নতুন ধরনের এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ফরহাদ। ধর্মের নামে মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা তখন আলজিরিয়ায় আক্ষরিক অর্থেই ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। রাস্তা-ঘাটে বোরখা ছাড়া কোন মেয়ে দেখলেই কাপড় খুলে নিত তারা, ছুরির ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে নাক-মুখ রক্তাক্ত করত। সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করার জন্যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে নাম লেখাল ফরহাদ, আবিষ্কার করল অ্যান্টি-টেরোরিস্ট এক্সপার্ট হিসেবে স্বেচ্ছাসেবকদের ট্রেনিং দিচ্ছে রানা, ওর সহকারী হিসেবে কাজ করছে জামিল।

এরপর ওদের তিনজনের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি হয়ে যায়। ন্যায় ও মঙ্গলের পক্ষে যে-কোন যুদ্ধে রানা ডাকলে অবশ্যই ওরা যাবে। পরে ওদের সঙ্গে আরও অনেকে যোগ দেয়, তাদের মধ্যে তৌহিদ জাফরও ছিল।

সেল থেকে বের করে আনা হলো আনিস সিদ্দিকীকে। রিসেপশনে নিয়ে এসে হাতকড়া পরানো হলো, বাইরে একটা রেঞ্জ রোভার অপেক্ষা করছে। 'তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' কারারক্ষীদের জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

ইউনিফর্ম পরা তিনজন লোক হাসাহাসি করছে, তাঁর প্রশ্নের জবাব দিল না।

কাল বিকেলের পর থেকে কিছু খাওয়া হয়নি তাঁর, হাত-মুখ ধোননি, দুশ্চিন্তায় ভাল ঘুম হয়নি, এমনকি প্রাতকৃত্যগুলোও সারা হয়নি। যদিও এই মুহূর্তে এ-সব বিষয়ে ভাবছেন না তিনি, ভাবছেন ওরা তাঁকে গুলি করতে নিয়ে যাচ্ছে কিনা। গোটা ব্যাপারটা অবাস্তব আর অবিশ্বাস্য লাগছে তাঁর কাছে। বলা হচ্ছে কোন বিচার করা হবে না, স্রেফ গুলি করে মেরে ফেলা হবে। কিভাবে তা সম্ভব? পৃথিবীর নামকরা একজন বিজ্ঞানী তিনি, উন্নত বিশ্বের একজন প্রতিনিধি, ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের একজন সম্মানী প্রজা, স্বয়ং রানীমাতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও সুসম্পর্ক আছে। এমনও নয় যে বিশ্ব তথা সমাজের কাছে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছে, সন্দেহ নেই তাঁর অসমাপ্ত গবেষণার কাজ সফলভাবে শেষ হলে মানবজাতির নিয়তিই পাল্টে যাবে, নিজেদের গ্যালাক্সি ছাড়িয়ে বহু দূরের সহস্র কোটি গ্যালাক্সিতে যেতে পারবে সে, নিয়ে আসতে পারবে বিপুল সম্পদ ও কারিগরি জ্ঞান, অজানাকে জানার চিরন্তন কৌতূহল এতদিনে তার মিটবে। মোটকথা, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ তিনি। অথচ এখন পর্যন্ত কেউ তাঁকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। তিনি ভেবেছিলেন অ্যাকটিং হাই কমিশনার ডেভিড হোপ কাল রাতেই তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। অথচ তিনি বা হাই কমিশনের অন্য কেউ তাঁকে একবার দেখতে পর্যন্ত আসেননি।

হতাশায় অসুস্থ বোধ করছেন আনিস সিদ্দিকী।

বাইরে বের করে এনে রেঞ্জ রোভারে তোলা হলো তাঁকে। লুবিরি কারাগার থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বন্দীকে। কিন্তু কোথায়?

প্রথমে তাঁকে মেনগো ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে আনা হলো। বিল্ডিঙের নিচে একটা সেলে বসে থাকলেন তিনি। চারদিকে মলমূত্র থকথক করছে, তীব্র ঝাঁঝে মগজ পর্যন্ত জ্বালা করে উঠল যেন। চারপাশে ভিড় করে আছে মাতাল, পকেটমার, মেয়েমানুষের দালাল, খুনী, পুরুষ ও মেয়ে বেশ্যা। বিদেশী বলতে আনিস সিদ্দিকী একা। সেলে বসে গরমে ঘামছেন তিনি, চারদিকে এত বেশি চেঁচামেচি হচ্ছে যে মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করতে পারছেন না। কয়েকজন পুলিস, সঙ্গে একজন সার্জেন্টও আছে, শক্ত ছড়ি দিয়ে লোকজনকে বেদম পেটাচ্ছে। অনেকেরই নাক-মুখ ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসছে। কুঁকড়ে যতটা সম্ভব ভেতর দিকে সরে এলেন আনিস সিদ্দিকী।

শুনানির সময় কোর্টরূমে ডাকা হলো তাঁকে। সিভিল ড্রেস পরা নুবিয়ান বিচারক অভিযোগগুলো শুনলেন, তারপর আনিস সিদ্দিকীর লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে একটা পৃষ্ঠা পড়া হলো। আনিস সিদ্দিকীকে কোন উকিল দেয়া হয়নি, নিজের পক্ষ নিয়ে তাঁকে কিছু বলার সুযোগও দেয়া হলো না। হাই কমিশন থেকে কোন প্রতিনিধিও আসেনি। তিনি ভাবলেন, তারা সম্ভবত জানেই না যে এখানে তাঁর বিচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

চুপচাপ রায় শুনলেন আনিস সিদ্দিকী। জনগণের বৈধ সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সত্যি প্রমাণিত হওয়ায় মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো তাঁকে। আদালতের লিখিত রায়ে প্রেসিডেন্ট সই করার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নিয়ম।

কোর্টরূম থেকে বের করে আবার তাঁকে রেঞ্জ রোভারে তোলা হলো। গাড়ি ছুটছে, রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন আনিস সিদ্দিকী। এক সময় খেয়াল করলেন বাম দিকে বাঁক ঘুরলে লুবিরিতে ফিরে যাবেন তাঁরা, কিন্তু সোজা পথটা ছাড়ল না গাড়ি। এর মানে কি? তাঁকে ওরা লুবিরিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না কেন? তবে কি প্রথমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করবে, তারপর সই করাবে প্রেসিডেন্টকে দিয়ে? 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' চিৎকার করে জানতে চাইলেন তিনি। পরমুহূর্তে ফিসফিস করলেন, 'প্লীজ!'

হলুদ দাঁত বের করে হাসল গার্ড। 'মাবোরু!' ফিসফিস করে বলল সে।

লোকে বলে ডিপার্টমেন্ট অভ স্টেট সিকিউরিটি মাবোরু দখল করেছে রাজধানী থেকে ওটার দূরত্বের কারণে। লেক ভিক্টোরিয়ার ওপর ঝুলে আছে তর্জনী আকৃতির একটা কাঠামো, চারপাশে ধু-ধু মাঠ, কোন জনবসতি বা অন্য কিছু নেই। কয়েদীদের আর্তচিৎকারে প্রেসিডেন্টের ঘুমের ব্যাঘাত হবে, সেটা হতে দেয়া যায় না। মাবোরুর তিনদিকে পাথুরে ঢাল, নেমে গেছে লেকের পানিতে। লেকের উত্তর তীর ঘেঁষে মেঠো একটা পথ চলে গেছে মূল প্রবেশপথের দিকে। কাছেই হাইওয়ে, সেটা কেন্ডুরার সঙ্গে নাইরোবি আর মোম্বাসা বন্দরকে যুক্ত করেছে।

আর্মি ফেটিগ পরা ছ'জন গার্ড আনিস সিদ্দিকীকে নিয়ে এল সেলে। হাতকড়া ও কোমরের বেল্ট খুলে নিল তারা। এবারও তাঁর কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হলো না। গার্ডরা চলে যাবার পর একা হয়ে গেলেন তিনি।

এক ঘণ্টা পর লোকজনের গলা ভেসে এল, এদিকেই এগিয়ে আসছে। টলতে টলতে দাঁড়ালেন আনিস সিদ্দিকী, করুণ একটা মূর্তি, হাত দিয়ে শার্টের কিনারা আর

ওয়েস্টব্যান্ড ধরে আছেন, চেহারায় যতটা সম্ভব মর্যাদা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন।

সম্ভবত হাই কমিশন থেকে কেউ এসেছে, ভাবলেন তিনি। আল্লাহ, তাই যেন হয়। দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল লোকটা।

হিজ এক্সলেন্সী ফিল্ড মার্শাল ড. জুলিয়াস বোগামুরা, ভিসি, ডিএসও, এমসি, লুগাম্বার আজীবন প্রেসিডেন্ট স্বয়ং পরিদর্শনে এসেছেন।

আনিস সিদ্দিকীর সামনে একটা পাহাড়ের মত ঝুঁকে থাকলেন বোগামুরা। সাড়ে ছ'ফুটের কিঞ্চিৎ বেশি লম্বা তিনি, দু'শো পঞ্চাশ পাউন্ড ওজন, ছোটখাট একটা দৈত্যই বলতে হয়। প্রকান্ড কালো তরমুজের মত মাথাটা, শুয়োরের মত ছোট ছোট চোখ মেলে চুপচাপ কয়েক সেকেণ্ড দেখলেন আনিস সিদ্দিকীকে। কথা না বলে এভাবে তাকিয়ে থাকা, এ-ও এক ধরনের অপমান। তাঁর মুখের দু'পাশে তিনটে করে রঙের ফালি জ্বলজ্বল করছে। ইউনিফর্ম পরে এসেছেন। বুক ভরা মেডেল রিবন, এতটুকু জায়গা খালি নেই। হাতের খাটো ছড়িটাকে রড বললেই হয়, চকচক করছে, সেটা খাড়া করে নিজের মাথার পাশে ঘন ঘন মৃদু বাড়ি মারছেন। তারপর হাসলেন তিনি। আনিস সিদ্দিকী অনুভব করলেন তার পেটের ভেতর নাড়িভুঁড়ি সব কুঁকড়ে যাচ্ছে।

এখনও তিনি তাঁর ওয়েস্টব্যান্ড ধরে আছেন, সেই হাতটার গাঁটে ছড়ি দিয়ে টোকা দিলেন বোগামুরা। 'ট্রাউজার খুলে ফেলুন,' বললেন তিনি।

ওয়েস্টব্যান্ডটা আরও শক্ত করে ধরলেন আনিস সিদ্দিকী। বোগামুরা ঠিক কি চাইছেন বুঝতে পারেননি তিনি।

আবার তাঁর হাতে ছড়ির বাড়ি মারলেন বোগামুরা। 'ট্রাউজার খুলুন!' এবার গলা তীক্ষ্ণ হলো।

আনিস সিদ্দিকী অনুভব করলেন তাঁর নিচের ঠোঁট কাঁপছে। ছড়ির আরও একটা খোঁচা। হাত কাঁপছে, ট্রাউজারের বোতাম ও চেইন খুলে ছেড়ে দিলেন তিনি। অনুভব করলেন পরিধেয় বস্ত্র ধীরে ধীরে কোমর থেকে নেমে যাচ্ছে। পায়ের পাতার ওপর জড়ো হলো সেটা। চেহারা দেখে মনে হলো ঘটনার ধীর গতিতে বিরক্তবোধ করছেন বোগামুরা। আন্ডারপ্যান্ট পরে থাকলেও, দু'হাত দিয়ে উরুসন্ধি আড়াল করলেন আনিস সিদ্দিকী।

'ওটাও খুলুন, শেষ ঘোমটাটা।'

'প্লীজ...,' মিনতি করলেন আনিস সিদ্দিকী।

'আমার কথার ওপর কথা!' হুঙ্কার ছাড়লেন বোগামুরা।

আনিস সিদ্দিকীর মনে হলো জীবনে তিনি অনেক পাপ করেছেন, মারা যাবার পর নরকে এনে তাঁকে শায়েস্তা করা হচ্ছে। থর থর করে কাঁপছেন তিনি, আন্ডারপ্যান্টের কিনারা ধরে গুটিয়ে উরুর ওপর দিয়ে নামিয়ে আনলেন পায়ের পাতার কাছে। দু'চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে।

ছড়ির ডগা তাঁর উরুসন্ধির খাঁজে খোঁচা মারল। বৈদ্যুতিক ধাক্কা মারল ছোঁয়াটুকু।

বোগামুরা বললেন, 'প্রিয় বন্ধু, আপনি ভয় পেয়েছেন। যদি বলেন, না, ভয় পাননি, তাহলে মিথ্যে কথা বলা হবে। আপনি কি জানেন মিথ্যেবাদীদের কি করি আমি, মি. সিদ্দিকী? বলি শুনুন। কিং'স রাইফেলস-এ থাকার সময় আমি যখন মাও মাও গেরিলাদের সঙ্গে ফাইট করতাম তখন বন্দীদেরকে কথা বলাবার জন্যে অফিসাররা

আমাকে ডেকে পাঠাত। কামরার ভেতর লম্বা টেবিল ফেলতাম। বন্দীদেরকে আমার সামনে আনা হলে নির্দেশ দিতাম, সবাইকে তাদের ম্যানহুড টেবিলের ওপর রাখতে হবে। জানার কথা একটাই ছিল আমাদের। অস্ত্রগুলো কোথায় রেখেছে তারা। জিজ্ঞেস করতাম, স্পেয়ারগুলো কোথায় রেখেছ? ওরা সব সময় উত্তর দিত, স্পেয়ার নেই।' প্রকাণ্ড কালো মুখের পেশীগুলো কিলবিল করে উঠল, বোগামুরা হাসছেন। 'কিন্তু আমার ম্যাশেটিতে খুব ধার ছিল, মি. সিদ্দিকী। সেটা আমি মাথার ওপর তুলে আবার সেই একই প্রশ্ন করতাম। এবার তারা গলগল করে সব বলে দিত। মাঝে মধ্যে শুধু ভয় দেখালে কাজ হত না, দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রথম লোকটার "ওটা" কেটে ফেলতাম, বলতে পারেন একেবারে গোড়া থেকেই। কি বলছি বুঝতে পারছেন তো? কেউ মিথ্যে কথা বললে এই হলো আমার শাস্তি। মিথ্যে আপনিও বলেছেন, একটা নয়, হাজারটা। কাজেই আপনার শাস্তি হবে হাজার গুণ ভয়াবহ। আপনি লিখেছেন লুগাম্বায় আমার সরকার মুসলমানদেরকে পাইকারী হারে হত্যা করছে। লুগাম্বায় নাকি মানবিকতা সম্পূর্ণ বিসর্জন দেয়া হয়েছে। কথাটা সত্যি হলে সেই সত্যের স্পর্শ থেকে আপনিও রেহাই পাচ্ছেন না, কারণ আপনি একজন মুসলমান। আর মিথ্যে হলে আমার শাস্তি ভোগ করতে হবে আপনাকে। যেদিক থেকেই দেখুন, আপনি একটা ফাঁদে পড়া বক। কান্নাকাটি করে সময়টা পার করুন।' ঘুরে দাঁড়ালেন বোগামুরা, মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেলেন দরজা দিয়ে। তাঁর গমন পথের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন আনিস সিদ্দিকী।

ট্রাউজার আর আন্ডারপ্যান্ট পায়ের পাতার ওপর পড়ে থাকল, ধীরে ধীরে সেলের মেঝেতে নিতম্ব ঠেকিয়ে বসলেন তিনি, হাঁটু জোড়া জড়িয়ে ধরলেন হাত দিয়ে। ফোঁপাচ্ছেন তিনি, দু'চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে।

ডেস্ক থেকে বড় একটা এনভেলাপ তুলে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'এই হলো সেই চিঠি—হার ম্যাজেস্টি সই করেছেন। আজ, খানিক আগে পেয়েছি আমি। স্যার পল ওয়েনডেল এখনও তাঁর সিদ্ধান্তে অটল আছেন তো? লুগাম্বায় উনি যাবেন, ঠিক জানো?'

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইকেল ল্যাক্স বললেন। 'অবশ্যই যাবেন। তবে সঙ্গে একজন থাকবেন।'

'কী সর্বনাশ! উনি নরকে যেতে চাইছেন, তা-ও আবার স্ত্রীকে নিয়ে?' প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যে রাগ দেখালেন। 'তাঁর কি ধারণা, পিকনিকে যাচ্ছেন?'

'স্ত্রী নয়, তাঁর এইড। একজন মেজর, ভদ্রলোকের নাম গেভিন লয়াল। স্যার ওয়েনডেল জানতে চেয়েছেন দু'জনের যাবার ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা। মেজর লয়ালের সঙ্গেও বোগামুরার পরিচয় আছে। দু'জন মিলে বোঝালে কাজ হবার সম্ভাবনা বাড়ে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'অগত্যা কি আর করা। শোনো, আজ বিকেলেই ওঁদের ফ্লাইট। সাবেনায় চড়ে ব্রাসেলসে, তারপর কানেকটিং ফ্লাইটে নাইরোবি হয়ে কেনডুরা। কাল সকালেই ওঁরা পৌঁছে যাবেন, পথে কোথাও টেরোরিস্টরা ওঁদের প্লেন হাইজ্যাক না করলে আর কি।

*

এয়ার ফ্রান্সে ফোন করে প্যারিস ফ্লাইটের টিকেট রিজার্ভ করল হাসান জামিল, এথেন্স আর নাইরোবি হয়ে কেনডুরা যাবে ওরা। আমস্টারডাম থেকে সরাসরি কোন ফ্লাইট নেই, আর ব্রাসেলস থেকে নাইরোবি ফ্লাইটে কোন সীট পাওয়া গেল না।

জামিল ভাবছিল প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট কোত্থেকে সংগ্রহ করবে ওরা, বিশেষ করে ফায়ার আর্মস, কারণ সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে প্লেনে চড়া তো সম্ভবই নয়।

রানা তাকে জানাল, এ-সব নাইরোবিতে পৌঁছে শিন গোনজালেসের কাছ থেকে চেয়ে নেবে ওরা। পর্তুগীজ লোকটা সম্ভাব্য সব কিছু সরবরাহ করতে পারে, তবে টাকা একটু বেশি নেয় সে।

সাবেনা সেভেন-জিরো-সেভেন ঠিক টার্মিনাল ভবনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ফার্স্ট ক্লাস সেকশনে জানালার পাশের একটা সীটে বসেছেন স্যার ওয়েনডেল, টাইয়ের নট ঠিক করে বললেন, 'কি ব্যাপার, লয়াল, আমি তো কোন ওয়েলকামিং কমিটি দেখছি না!'

'সত্যি তিনি আসেননি?' অবাক দেখাল মেজর গেভিন লয়ালকে। এর আগে যতবারই লুগাম্বায় এসেছেন স্যার ওয়েনডেল, সমস্ত প্রটোকল ভেঙে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এয়ারপোর্টে উপস্থিত থেকেছেন বোগামুরা। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'এখানে আমি লুগাম্বার প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়, স্যার ওয়েনডেলের একজন প্রিয় শিষ্য হিসেবে উপস্থিত হয়েছি।'

'এখনও তো দেখছি না।'

'তাহলে বোধহয় সর্দি লেগেছে, স্যার। সর্দি কিন্তু ছোঁয়াচে, আমাদের কি ফিরে যাওয়া উচিত, স্যার?'

প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে টারমাকে নেমে এলেন স্যার ওয়েনডেল, পিছনে থাকল মেজর লয়াল। আধ মাইল দূরে কাঁটাতারের বেড়ার সামনে তিনটে মিগ ফিফটিন দাঁড়িয়ে রয়েছে, যান্ত্রিক পিঁপড়ের মত লাগছে দেখতে। ওগুলোর পাশেই দমকল বাহিনীর কয়েকটা গাড়ি আর ফুয়েল ট্যাঙ্কার।

আকাশে কোন মেঘ নেই, বাতাসও ছাড়েনি। পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরে দরদর করে ঘামছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল স্যার ওয়েনডেল। দীর্ঘদেহী মানুষ তিনি, কানের দু'পাশে পাক ধরেছে চুলে। মেজর লয়াল একহারা গড়নের, চোখ দুটো যেন কৌতুকের অফুরন্ত উৎস।

টার্মিনাল ভবনে ঢোকার মুখে সিঁড়ির নিচে কয়েকজন লোককে দেখা গেল। তবে তাদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নেই। মনে মনে উদ্বেগ বোধ করছেন স্যার ওয়েনডেল। দলটা থেকে এক লোক এগিয়ে এসে হাত বাড়াল, বলল, 'গুড মর্নিং। আমি ডেভিড হোপ, অ্যাকটিং হাই কমিশনার। আপনার পরিচয় আমি জানি।' হ্যান্ডশেক করলেন ওঁরা, মেজর লয়ালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ওয়েনডেল। তারপর ডেভিড হোপ গলা খাদে নামিয়ে বললেন, 'ইয়ে, মানে, আপনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে হিজ এক্সেলেন্সী এখানে উপস্থিত নেই। তিনি অবশ্য বার্তা পাঠিয়েছেন…ইয়ে, মানে, দুঃখ প্রকাশ করেছেন, বলেছেন আপনি তাঁর অপরাধ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আপনাকে

অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে ব্রিগেডিয়ার জসুয়া আগনিকে পাঠিয়েছেন তিনি। ইন্সপেকসনের সময়ও ব্রিগেডিয়ার আগনি আপনাকে সঙ্গ দেবেন।'

অপেক্ষারত দলটার দিকে এগোলেন ওঁরা। জসুয়া আগনিকে শুধু কালো একটা ফুটবলের সঙ্গে তুলনা করা চলে, এত মোটা। বোঝা গেল প্রটোকল সম্পর্কে বা এমনকি সামাজিক ভদ্রতা সম্পর্কেও তাঁর কোন ধারণা নেই, জানা কথা এ-ধরনের অনুষ্ঠানে আগে কখনও তাঁকে দায়িত্ব পালন করতে হয়নি। ওয়েনডেল হাত বাড়াতে সেটার দিকে কয়েক সেকেন্ড বোকার মত তাকিয়ে থাকলেন তিনি, তারপর নিজের হাতটা চোখের সামনে তুলে দেখলেন, যেন নোংরা হয়ে আছে কিনা পরীক্ষা করলেন, হ্যান্ডশেক করার পরও একবার চোখ বুলালেন তালুর ওপর। ওয়েনডেল গুড মর্নিং বললেও কোন জবাব পেলেন না। ডেভিড হোপ লুগাম্বার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলফ্রেড আমবুরার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁর সুটের কাপড় ডোরা কাটা উজ্জ্বল রঙের। গলায় ইটন টাই, ওয়েনডেলের মনে হলো নিশ্চয়ই সেকেন্ডহ্যান্ড মার্কেট থেকে কেনা। অসম্ভব ভারি ফ্রেমের একটা সানগ্লাস চোখে। ব্রিগেডিয়ার বা পররাষ্ট্রমন্ত্রী, কেউ নড়াচড়া করছেন না, যেন রক্ত-মাংসের পুতুল, দম দেয়া হয়নি।

'গুড গড!' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড় বিড় করল মেজর লয়াল। 'সালাহউদ্দিনকে তাড়াবার পর এদেরকে তুলে আনা হয়েছে?'

ওয়েনডেল আরেকদিকে তাকিয়ে আছেন। খানিক দূরে একদল সৈনিক অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারমানে বোগামুরা গার্ড অভ অনার-এর ব্যবস্থা করেছেন। দেখা গেল সঙ্গে ব্যান্ডও আছে। ব্যান্ড মাস্টার আর তার সঙ্গীদের পরনে শুধু কৌপিন, প্রায় উলঙ্গই বলা যায়। সারা গায়ে রঙ মেখে সং সেজে আছে। কারও কারও মাথায় দীর্ঘ জটা দেখা গেল।

'এড়ানো যায় না?'

ওয়েনডেলের প্রশ্নের উত্তরে ডেভিড হোপও ফিসফিস করলেন, 'বোগামুরা অপমান বোধ করতে পারেন।' তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে ব্রিগেডিয়ারের দিকে তাকালেন ওয়েনডেল।

অবিশ্বাস্য দৃশ্য, ব্রিগেডিয়ার জোসুয়া আগনি অলস ভঙ্গিতে ঊরুসন্ধি চুলকাচ্ছেন।

মেজর লয়াল গুঙিয়ে উঠে বলল, 'এ-সব কি দেখছি আমি? ওই লোক যদি ব্রিগেডিয়ার হয় তাহলে পোপ একজন ইহুদি।'

'সম্প্রতি পদোন্নতি দেয়া হয়েছে,' জানালেন ডেভিড হোপ।

'কি থেকে? কর্পোরাল?'

'কাছাকাছি,' বললেন ডেভিড হোপ। 'হপ্তা দুই আগে বোগামুরার ড্রাইভার ছিলেন উনি।'

'আমার হার্ট বন্ধ হয়ে গেলে আপনাকে দায়ী করা হবে,' বলল লয়াল, দেখল কানের ভেতর ঢুকিয়ে একটা আঙুল ঘোরাচ্ছেন জোসুয়া আগনি।

'ব্রিগেডিয়ার কিন্তু ইংরেজি জানেন না।'

'মানুষকে বিস্মিত করার আপনার যে ক্ষমতা, সত্যিই তার কোন তুলনা হয় না।'

'ইয়ে, ইন্সপেকশন...' বললেন ডেভিড হোপ, লক্ষ করলেন ব্রিগেডিয়ার এবার তাঁর অপর কানের ভেতর আঙুল ভরেছেন।

এগিয়ে এসে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বললেন. 'পারহ্যাপস ইউ উড কেয়ার টু ফলো মি, জেনারেল?'

নিজেকে সামলে নিয়ে মুখে ভদ্রতার মুখোশ আঁটলেন ওয়েনডেল। 'অফকোর্স।'

ব্যান্ড পার্টি বাজনা বাজাতে শুরু করল। রোদের মধ্যে পুড়ে ইন্সপেকশন শেষ করলেন ওয়েনডেল। তারপর সরকারী কর্মকর্তারা তাঁকে নিয়ে টার্মিনাল ভবনের ভেতর ঢুকলেন।

'এখন কি?' ডেভিড হোপকে জিজ্ঞেস করলেন ওয়েনডেল। 'বোগামুরার সঙ্গে আমরা দেখা করব কখন?'

'আপনারা আমার বাড়িতে উঠছেন,' জানালেন ডেভিড হোপ। 'দেখা···সেটা তাঁর সময় মত জানাবেন তিনি।' ঘাড় ফিরিয়ে মেজর লয়ালের হাতের ব্রিফকেসটার দিকে একবার তাকালেন। 'চিঠিটা এনেছেন তো?'

'এই যা!' পিছন থেকে জবাব দিল মেজর লয়াল, 'ভুল করে ফেলে এসেছি।'

হতভম্ব দেখাল অ্যাকটিং হাই কমিশনারকে, তারপর লয়াল কৌতুক করছে বুঝতে পেরে নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসলেন।

'এখন তাহলে অপেক্ষার পালা? বোগামুরা যতক্ষণ না দেখা করতে চান?' জিজ্ঞেস করলেন ওয়েনডেল।

'হ্যাঁ,' বললেন ডেভিড হোপ। 'সেটা মি. সিদ্দিকীকে মেরে ফেলার পর হলেও আমি আশ্চর্য হব না।'

চার

জামিল আর জাফরকে নিয়ে নাইরোবি পৌছুল রানা, উহুরু হাইওয়ে আর সিটি হল ওয়ে-র মাঝখানে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে উঠল ওরা।

ওই একই এয়ার ফ্রান্স ফ্লাইটে চড়ে ফরহাদও এসেছে, তবে প্লেন থেকে নামেনি সে, যাবে কেনডুরা পর্যন্ত। আমস্টারডাম ত্যাগ করার আগেই এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ওদের সবার চেয়ে কালো সে, কারও মনে সন্দেহ না জাগিয়ে শহরে ঘোরাফেরা করতে পারবে। ফিল্ডওঅর্ক-এর প্রয়োজন আছে।

সবুজ সঙ্কেত না পাওয়া পর্যন্ত লুগাম্বায় সবার না যাওয়াই ভাল। ওরা তিনজন নাইরোবিতে প্রস্তুতি নেবে, সেই সঙ্গে লন্ডন থেকে রবার্ট পিলের কেবল পাবার অপেক্ষায় থাকবে। কাজটা ওরা পেয়েছে জানার পর প্লেনে চড়ে কেনডুরায় পৌছুবে, যোগ দেবে ফরহাদের সঙ্গে। ফরহাদ ওখানে চারদিন অপেক্ষা করবে, এর ভেতর নাইরোবি থেকে ওরা না পৌছুলে প্লেনে চড়ে কেনিয়ায় চলে যাবে সে, ধরে নেবে মিশন বাতিল হয়ে গেছে।

তোবড়ানো একটা মার্সিডিজে চড়ে কেনডুরা এয়ারপোর্ট থেকে শহরের মাঝখানে ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে যাচ্ছে ফরহাদ। স্পোর্টস শার্ট আর গ্রে স্ল্যাকস পরে আছে সে, জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখছে। গিয়ার বদলের সময় ড্রাইভার কোন নিয়ম মানছে না, অকস্মাৎ ঝাঁকি খেয়ে বারবার জানালার ওপর আটকানো স্ট্র্যাপ ধরে নিজেকে

সামলাতে হচ্ছে তার।

প্লেন থেকে মাত্র বারোজন আরোহী নামলেও, ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস-এর আনুষ্ঠানিকতা শেষ হতে দু'ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়েছে। কি কারণে ফরহাদের ভাল ধারণা নেই, ওদের সবার জন্যে নকল পাসপোর্ট যোগাড় করেছে রানা। নকল হলেও এমন নিখুঁত যে কেউ ধরতে পারবে না। চারজনই মুসলমান অথচ পাসপোর্টে দেখা যাবে সবাই ওরা খ্রিস্টান। কাগজ-পত্র পরীক্ষা করার পর শুরু হলো জেরা। কেন আসা হয়েছে লুগাম্বায়? পরিচিত কেউ এখানে থাকে কিনা? কতদিন থাকবেন? এরকম হাজারটা প্রশ্ন। ফরহাদ বলেছে সে একজন ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্ট, নাইজিরিয়া স্টার-এর হয়ে আসন্ন ওএইউ কনফারেন্স কাভার করতে এসেছে।

কাস্টমস হলে ঢুকেই সিকিউরিটির লোকজনকে দেখতে পায় ফরহাদ। তার ধারণা হয় ওরা সম্ভবত মেজর কাগলির সিক্রেট পুলিসের সদস্য। দু'জন লোক, জোড়া এগজিট ডোর-এর পাশে দাঁড়িয়ে। গায়ে ডোরা কাটা শার্ট, কোমরে কালো ফোলা স্ল্যাকস, চোখে রিফ্লেকটিভ সানগ্লাস, কাঁধে কালাশনিকভ, কড়া চোখে অ্যারাইভাল প্যাসেঞ্জারদের ওপর নজর রাখছে। হাতে স্যুটকেস নিয়ে দরজার দিকে এগোবার সময় শিরশির করছিল ফরহাদের পেট, যদিও বোধহয় সে কুচকুচে কালো বলেই দ্বিতীয়বার তার দিকে তাকায়নি লোক দু'জন।

স্ট্যান্ডের সবগুলো ট্যাক্সিই ভাঙাচোরা তোবড়ানো, কাজেই বাছবিচারের মধ্যে না গিয়ে প্রথমটাতেই উঠেছে সে। এখনও রাজধানীর কেন্দ্র থেকে অনেকটা দূরে রয়েছে ট্যাক্সি, রাস্তার দু'পাশে খেত-খামার আর কাঠ ও টিন দিয়ে তৈরি ছোট ছোট খুপরি দেখা যাচ্ছে। বস্তির পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা বলতে কিছু নেই, খোলা নর্দমাতেই বসে পড়েছে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা। খুপরিগুলোর চারপাশে স্তূপ হয়ে আছে আবর্জনা, কুকুর ও শকুনদের সঙ্গে খাদ্যকণার সন্ধানে মানব সন্তানদেরও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা গেল। একটা একচালার ভেতর টুপি মাথায় কয়েকজন লোককে দেখে ফরহাদ ধারণা করল, উদ্বাস্তুদের ক্যাম্প এটা। মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও, বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়ার পর এখানে আশ্রয় দেয়া হয়েছে। ফরহাদ লক্ষ করল, বস্তিতে কোন যুবক বা যুবতী নেই। সে শুনেছে মুসলমান তরুণীরা এখন শাসক সম্প্রদায়ের বাড়িতে ঝির কাজ করে, আর বেশিরভাগ যুবককেই মেরে ফেলা হয়েছে। এ-ধরনের নৃশংসতা অবশ্য শুধু রাজধানীতেই বেশি হয়েছে। বনভূমির ভেতর দুর্গম গ্রামগুলোয় তেমন সুবিধে করতে পারেনি পুলিস বা সেনাবাহিনী।

এরপর শুরু হলো শ্রমিকদের বহুতল ফ্ল্যাট বাড়ি। এগুলোয় এক সময় এশিয়ান ব্যবসায়ীরা থাকত, তাদের মধ্যে বেশিরভাগ ভারতীয় বা বাংলাদেশী। বোগামুরা ক্ষমতায় আসার আগে ট্যুরিস্টদের দর্শনীয় স্পট ছিল গোটা এলাকা। এশিয়ানদের দেশ থেকে বের করে দেয়ার পর খ্রিস্টান শ্রমিকদের বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ফ্ল্যাটগুলো। একেকটা ফ্ল্যাটে সাত থেকে দশজন থাকতে পারে, কিন্তু দেখে মনে হলো প্রতিটিতে অন্তত এক দেড়শো লোক থাকছে। বাগান বলে এখন আর কিছু নেই, খুপরি বানিয়ে সেখানেও শ্রমিকরা মাথা গুঁজেছে। আবর্জনা আর দুর্গন্ধময় পরিবেশ দেখে সন্দেহ হয় রাজধানীতে পৌর কর্তৃপক্ষ বলে কিছু আছে কিনা।

এরপর ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে জমিন, আকাশের গায়ে ঝোপ-ঝাড় আর গাছপালার

রেখা দেখা যায়। উপনিবেশ আমলের ভিলা চোখে পড়ল, সবগুলো আকারে বিশাল. তবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পড়ো পড়ো অবস্থা হয়েছে। ইতিমধ্যে শুরু হলো অ্যামব্যাসী আর কনসুলেট এলাকা। বেশিরভাগ কূটনীতিককেই বহিষ্কার করেছে লুগাম্বা সরকার, তাঁদের বাড়ি-ঘর দখল করে নিয়েছে মন্ত্রী-মিনিস্টার ও আমলারা। যারা এখনও আছেন লুগাম্বায়, তাঁদেরকে শহরের অন্য এলাকায় সরিয়ে দেয়া হয়েছে—রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা থেকে বাঁচানোর জন্যে। কূটনীতিকরা এখন কাঁটাতারের বেড়া ঘেরা একটা এলাকায় থাকেন, চলাফেরা করেন পুলিস নিয়ে।

হোটেলে পৌঁছুল ট্যাক্সি। কোন দারোয়ান বা গার্ড নেই। গাড়ি থেকে নেমে পকেট হাতড়াল ফরহাদ। টাকা বদলের সময় পায়নি সে, আমেরিকান ডলার দিল ড্রাইভারকে। বিশ ডলারের নোট ছোঁ দিয়ে নিয়ে পকেটে ভরে ফেলল লোকটা।

'এরকম আরও অনেক আছে আমার কাছে,' বলল ফরহাদ, খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে ড্রাইভারকে।

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল লোকটা। পকেট থেকে কয়েকটা নোট বের করে দেখাল ফরহাদ। ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল ড্রাইভার। 'শহরটা ঘুরে দেখতে চাই। এই ধরো দু'ঘণ্টা,' বলল ফরহাদ।

'ও, আচ্ছা, বুঝেছি, স্পেশাল ট্যুর। ঠিক আছে, স্যার। ট্যুরিস্ট, তাই না?'

'সাংবাদিক।'

'ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করছি। আপনি নাম লিখিয়ে সুটকেসটা রেখে আসুন।'

'এখন নয়,' বলল ফরহাদ। 'সন্ধে ছ'টার দিকে আসবে তুমি।'

কালো হয়ে গেল ড্রাইভারের চেহারা। 'সন্ধের পর শহর ফাঁকা হয়ে যায়।' মাথা নাড়ল সে।

লোকটার হাতে আরও দুটো বিশ ডলারের নোট গুঁজে দিল ফরহাদ।

দোকানটার মাথায় সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে: শিন গোনজালেস— ইমপোর্টস অ্যান্ড এক্সপোর্টস। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। এমপোরিয়াম-এর দেয়ালগুলো পশুর চামড়া আর স্থানীয় কার্পেটে ঢাকা পড়ে আছে। আরও আছে হরিণ, গণ্ডার ও জেব্রার মাথা। খোলা কেবিনেটে আদিবাসীদের প্রিয় মুখোশ, নৃত্য ভঙ্গিমায় পুতুল, আইভরি আর জেড পাথরের স্ট্যাচু, হাতীর দাঁত দিয়ে তৈরি দাবার ঘুঁটি। আরেক পাশে সাজানো রয়েছে কুমিরের চামড়া দিয়ে বানানো হাতব্যাগ, স্নেকস্কিনস বেল্ট ইত্যাদি।

স্বচ্ছ একটা পর্দা সরিয়ে দোকানে বেরিয়ে এল এক ভারতীয়, কোন কারণ ছাড়াই বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে। 'বলুন স্যার, আপনার জন্যে কি করতে পারি আমি? ভারতীয় মুক্তো আছে...।'

'গোনজালেসের সঙ্গে দেখা করতে চাই,' বলল রানা।

'দুঃখিত, স্যার। মালিক ব্যবসার কাজে বাইরে গেছেন।' কথা বলার ফাঁকে পর্দাটার দিকে চট করে একবার তাকাল লোকটা।

'ধরা পড়ে গেছেন,' বলল রানা। 'ডাকুন তাকে। আমার নাম বলুন—মাসুদ রানা।'

দু'মিনিট পরই হাজির হলো গোনজালেস। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স, কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা, গোঁফ এত চওড়া যে ঠোঁট দেখা যায় না। ভারতীয় কর্মচারীর হাসিটা তার দ্বারাই সংক্রমিত—সবগুলো দাঁত সারাক্ষণ বেরিয়ে আছে, তার মধ্যে একটা সোনা দিয়ে বাঁধানো।

'আপনি! স্যার! আপনি!' বিনয়ে বিগলিত হলো গোনজালেস, যেন রানা দোকানে পা দিয়ে তার জীবন ধন্য করেছে। 'কত যুগ পরে এলেন! আমি ভাবতেই পারিনি···।'

'কত যুগ? তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে আঠারো মাস আগে।'

'আমি একজন ছোটখাট ব্যবসায়ী, স্যার।' হাত কচলাচ্ছে গোনজালেস। 'লক্ষ্মী খদ্দেররা যদি আঠারো মাসে একবার আসেন, বউ-বাচ্চা নিয়ে বাঁচি কিভাবে! আঠারো মাসকেই মনে হয়···।'

'তোমার সঙ্গে নির্জনে কথা হওয়া দরকার,' বলল রানা।

দোকানের পিছনে ছোট্ট একটা অফিসে রানাকে এনে বসাল গোনজালেস।

কোন ভূমিকা না করে রানা বলল, 'চারজন লোকের ইকুইপমেন্ট লাগবে। ট্র্যান্সপোর্টও।'

'হে-হে, আপনি এমনভাবে কথা বলছেন, আমি যেন এখনও সাইড বিজনেস করছি।' গোনজালেসের হাত কচলানো থামছে না।

'করছ। ছেড়ে দিলে আমি খবর পেতাম।'

'আপনি আমার লক্ষ্মী, কাজেই ফিরিয়ে দিতে পারি না। তবে এবারই শেষ, হে-হে···।'

'এ-কথা তুমি সববারই বলো।'

'কি কি লাগবে, স্যার? একটু যদি বিস্তারিত বলেন···।'

'মেশিন পিস্তল, হ্যান্ড গান, স্পেয়ার অ্যামুনিশন, ম্যাশেটি, ডিটোনেটর ও টাইমার সহ প্লাস্টিক। হ্যান্ড গানের জন্যে প্যাক ও শোল্ডার হোলস্টার চাই আমার। ম্যান স্টপার হতে হবে, ব্রাউনিং হলে ভাল হয়। আর, কমব্যাট ড্রেস।'

'আপনি স্যার ট্র্যান্সপোর্টের কথাও বলেছেন।' এখন আর হাসছে না গোনজালেস।

'পাইলট সহ হালকা প্লেন, পাঁচজন লোকের জায়গা হতে হবে।'

'এ-সব আপনার কখন দরকার, স্যার?'

'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। খুব বেশি হলে ছত্রিশ ঘণ্টা।'

চিন্তিত দেখাল গোনজালেসকে, মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে। 'কাজটা সহজ হবে না, স্যার। অস্ত্রগুলো সমস্যা নয়, কিন্তু প্লেনের ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে।'

'আমাদের হাতে সময় নেই,' বলল রানা। 'শহরে আমার পরিচিত কে কে আছে, জানো?'

কাঁধ ঝাঁকাল গোনজালেস। 'সুনীল বোস কাল জিম্বাবুইয়ে চলে গেছে। চ্যাং ওয়েন গেছে জাম্বিয়ায়, কপার বেল্টে চার্টার সার্ভিস।'

'বাকি সবাই?'

'নাসিম আছে···।'

'নাসিম? নাসিম নাইরোবিতে?' উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার মুখ। 'তার শেষ খবর

জানি আমি, গাজায় মহিলা পুলিসদের ট্রেনিং দিচ্ছে।'

মাথা নাড়ল গোনজালেস। 'নাসিম খুব হতাশ। ইয়াসির আরাফাতের মুখের ওপর বলে এসেছে, আপনি ভুল করছেন, ইতিহাস আপনাকে ক্ষমা করবে না। চাকরি ছেড়ে দিয়ে...।'

'সে এখন কোথায়?'

মাথা নাড়ল গোনজালেস। 'নাইরোবিতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল, তবে তারপর আর যোগাযোগ নেই। আপনি তো জানেন, সে একা থাকতে পছন্দ করে।'

'ঠিক আছে, নাইরোবিতে যখন আছে, আমি তাকে ঠিকই খুঁজে নিতে পারব,' বলল রানা। 'তবে চ্যাং ওয়েনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কিনা দেখো। বলবে খুব মোটা বোনাস আছে।'

'ঠিক আছে। স্যার, এখনও আপনি বলেননি প্লেন নিয়ে কোথায় আপনারা যেতে চান।'

'মাসামবাবুল-এর একটা হাসপাতালে নামিয়ে দিয়ে আসতে হবে আমাদের।'

এমন লাফিয়ে উঠল, যেন সাপে কামড়েছে গোনজালেসকে। 'সর্বনাশ! মাসামবাবুল? সে তো লুগাম্বায়!'

'হ্যাঁ। তো কি হলো? তুমি তো আর আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ না!'

মাথা চুলকে গোনজালেস বলল, 'না, মানে, লুগাম্বা এখন মুসলমানদের জন্যে স্রেফ নরক, তাই বলছিলাম...তবু তো আঠারো মাস পর এসেছেন, কিন্তু যদি মারা যান...।'

'ইন্টারন্যাশনালে উঠেছি,' বলল রানা। 'সব যোগাড় করে খবর পাঠাবে তুমি, ঠিক আছে?'

চোখ মিটমিট করল পর্তুগীজ ব্যবসায়ী। 'আরেকটা কথা, স্যার। কানে এল কয়েক রাত আগে ডেল নিকোলাসের ওখানে নাকি দেখা গেছে নাসিমকে।'

'জুয়া খেলার ক্লাব না ওটা?' বিস্মিত দেখাল রানাকে।

ম্লান হয়ে গেল গোনজালেসের চেহারা। 'শুনলাম ওখানে একটা সীন ক্রিয়েট হয়। বড় ধরনের একটা খেলায় বসে বড় অঙ্কের টাকা হেরে গেছে নাসিম।'

গোনজালেস মিথ্যে কথা বলবে না, তবু ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য লাগল রানার। 'ঠিক আছে, খোঁজ নিয়ে দেখো কোথায় থাকে ও।'

হোটেলে ফিরে এসে রিসেপশন ডেস্কে দাঁড়াল রানা। না, কোন মেসেজ আসেনি। পিল অবশ্য এত তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করবে না। নাইরোবিতে ওরা এসেছে পুরো একদিনও তো হয়নি। রানা এজেন্সির লন্ডন ব্রাঞ্চও কোন মেসেজ পাঠায়নি।

নিজের কামরায় ঢুকে শাওয়ার সারল রানা। সকালে নাইরোবিতে পৌঁছুবার পর থেকেই বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে ওকে, বিশ্রাম নেয়া হয়নি। প্লেনেও ঘুম আসেনি ওর। কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়েছে, এই সময় নক হলো দরজায়।

'কে?'

বাইরে থেকে অস্পষ্ট সুরে কথা বলল কেউ, তবে টেলিগ্রাম শব্দটা ধরা পড়ল কানে। হঠাৎ উত্তেজনাবোধ করল রানা। প্রত্যাশিত সময়ের আগেই মেসেজ পাঠিয়েছে পিল।

দরজা খুলতেই পিস্তলের মাজল ঠেকল ওর পেটে, ঠেলে ঘরের ভেতর দিকে নিয়ে এল ওকে। কুচকুচে কালো দু'জন আফ্রিকান। লম্বা, শক্ত-সমর্থ। একজন পরে আছে ক্রীম কালারের সুট, অপরজন বাদামী জ্যাকেট ও স্ল্যাকস। ক্ষিপ্র, আত্মবিশ্বাসী, বিপজ্জনক। পিস্তলের মাজল বুকের রোম ছুঁয়ে ওপর দিকে উঠছে। শরীর থেকে হাত দুটো যথেষ্ট দূরে সরিয়ে রাখল রানা। পিস্তলটা ক্রীম সুটের হাতে। অপর লোকটা ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

'কোন রকম ঝামেলা করবেন না, মেজর রানা।' পিস্তলধারী পিছিয়ে গেল, অপলক চোখে রানার ওপর নজর রাখছে। 'তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিন।'

লোক দু'জনকে সাবধানে লক্ষ করছে রানা। 'চিন্তা করার জন্যে দু'একটা ক্লু দাও,' বলল ও। 'টেলিগ্রামের কি হলো?'

'স্রেফ ধোঁকা দেয়ার জন্যে বলা হয়েছে, মেজর।' খাটে বসল ক্রীম সুট, রানার পেটের দিকে পিস্তল ধরে আছে। তার বোবা সঙ্গী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, হাত দুটো শরীরের দু'পাশে শিথিল ভঙ্গিতে ঝুলছে।

ডাকাতি নয়। কিছু খুঁজছেও না। মেজর বলে সম্বোধন করল। কারা ওরা, কি চায়?

কোমরে ভেজা তোয়ালে জড়িয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, বোকার মত কিছু করতে গেলে গুলি খেতে হতে পারে। কে জানে জামিল আর জাফর কি করছে। বোধহয় নিজেদের কামরায় ঘুমাচ্ছে ওরা।

'বললাম না কাপড় পরে নিন,' তাগাদা দিল ক্রীম সুট। গলার সুর শুনেই বোঝা যায় শিক্ষিত লোক সে। না, ভাড়াটে পেশী নয়।

ওয়ার্ডরোব খুলে ধীরে ধীরে কাপড়চোপড় পরতে শুরু করল রানা।

'আমরা চুপচাপ হোটেল থেকে বেরিয়ে যাব, মেজর রানা। ঝামেলা করবেন না, প্লীজ। যা বলব করে যাবেন, আপনার কোন ক্ষতি হবে না। লবিতে পৌঁছে ডেস্কে চাবি রাখবেন, কোন কথা বলবেন না। হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা সাদা মার্সিডিজে চড়বেন, গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।'

বিপদের মধ্যে পড়া সত্ত্বেও কৌতূহল হচ্ছে রানার। ঘরের ভেতর না হোক, করিডরে বা এলিভেটরে ওদেরকে কাবু করার এক-আধটা সুযোগ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ভাবছে সুযোগ বা ঝুঁকিটা নেবে কিনা। জানতে ইচ্ছে করছে কি চায় ওরা। আরও জরুরী প্রশ্ন, কার হয়ে কাজ করছে?

এলিভেটরে চড়ে নামার সময় পিস্তলটা লুকানো থাকল, লবিতেও সেটা বেরুল না, তবে ক্রীম সুট ঠিক পিছনেই থাকল রানার। সাদা মার্সিডিজে আরও একজন বসে আছে, হোটেল থেকে ওরা বেরিয়ে আসতে অলস চোখ তুলে তাকাল। রানার সঙ্গে ব্যাক সীটে বসল ক্রীম সুট। বাদামী জ্যাকেট বসল ড্রাইভারের পাশে।

শহর থেকে বেরিয়ে এসে উত্তর দিকে রওনা হলো মার্সিডিজ। কয়েকটা বাঁক ঘুরে ঢুকে পড়ল একটা প্রাইভেট এস্টেটে। ওদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে লম্বা একটা লোহার গেট। অনেক দূরে গাছপালার ভেতর সাদা চুনকাম করা একটা বাড়ি। ড্রাইভার হর্ন বাজাল। গেট হাউস থেকে বেরিয়ে এল দু'জন লোক। গেটের ভেতর থেকে গাড়িটা ভাল করে দেখল তারা। ড্রাইভারের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে রানা দেখল দু'জনের

হাতেই স্টেচিন মেশিন পিস্তল।

গেট খোলার পর ভেতরে ঢুকল মার্সিডিজ। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাতে রানা দেখল, আবার সেটা বন্ধ হয়ে গেছে।

গেট থেকে বাড়িটা প্রায় এক মাইল দূরে। দু'তলা বাড়ি, চার পাশে সারি সারি ইউক্যালিপটাস। উর্দি পরা একজন লোককে দেখা গেল— সাদা জ্যাকেট আর কালো ট্রাউজার। সে-ই পথ দেখিয়ে বাড়ির ভেতর নিয়ে এল ওদেরকে। ক্রীম সুট আর বাদামী জ্যাকেট রানার দু'পাশে থাকল।

হলের ভেতরটা ঠাণ্ডা। মেঝেতে দামী কার্পেট, বেতের ফার্নিচার। বাড়ির পিছন দিকের একটা ড্রইংরুমে ঢুকল ওরা। কামরাটা খুব বড়, দু'দিকে ফ্রেঞ্চডোর আছে। একটা দরজা দিয়ে বারান্দায় বেরুনো যায়, বারান্দা থেকে সিঁড়ির চওড়া ধাপ নেমে গেছে টেরেস আর সুইমিং পুলে। সুইমিং পুলের সামনে সবুজ লন, তারপর গাছপালার ভেতর সাদা বাউন্ডারী ওয়াল। একশো গজ দূরে পাঁচিলের কিনারা ঘেঁসে টহল দিচ্ছে এক লোক, তার সঙ্গে পায়ে পায়ে হাঁটছে একটা ডোবারম্যান। লোকটার কাঁধে একটা মেশিন পিস্তল।

ভিলাটা দুর্গবিশেষ।

টেরেসে নেমে এল ওরা। সান আমব্রেলার নিচে সাদা টেবিল চেয়ার ফেলা আছে। সান লাউঞ্জারগুলো পুল-এর দিকে মুখ করা। একপাশের একটা টেবিলে ছোট্ট বার ও টেলিফোন দেখা গেল।

একটা ছাতার নিচে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। গাঢ় নীল শার্ট, ম্যাচ করা স্ল্যাকস। কাপড়গুলো এমনভাবে কাটা ও সেলাই করা হয়েছে, দেখে মনে হবে ইউনিফর্ম। নাগালের মধ্যে টেবিলে পড়ে রয়েছে একটা ছড়ি, হাতলে চামড়ার ফালি। আন্তরিক হাসির সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন ভদ্রলোক, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'আসসালামোআলায়কুম, মেজর রানা, মাই ডিয়ার ফেলো। ওয়েলকাম, ওয়েলকাম। আপনার নাম অনেক শুনেছি, আজ পরিচিত হতে পেরে সত্যি আনন্দ লাগছে।'

ইনিও কুচকুচে কালো। মাঝারি গড়ন তাঁর। বলিষ্ঠ শরীর। চোখ দুটো একটু গর্তে ঢোকা, যদিও তা দুর্বল স্বাস্থ্য বা অসুস্থতার লক্ষণ নয়। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি তাঁর চেহারার সঙ্গে দারুণ মানিয়ে গেছে, দেখে মনে হবে কোন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। প্রায় পঞ্চান্ন বছর বয়েস। ফটোতে দেখা চেহারার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

'গুড আফটারনুন, মি. প্রেসিডেন্ট,' বলল রানা, হ্যান্ডশেক করছে। 'ভাবছিলাম আপনি কোথায় হারিয়ে গেলেন!'

রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করছেন, অথচ প্রেসিডেন্ট হাজি বাবা সালাহউদ্দিন ফালাকে দেখে মনে হবে না কোন রকম সঙ্কট বা অসুবিধের মধ্যে আছেন তিনি। কথাটা বলেও ফেলল রানা।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাত দিয়ে চারপাশটা দেখালেন বাবা সালাহউদ্দিন। 'যখন ক্ষমতায় ছিলাম, পৈত্রিক বাড়িতে বসেই দেশ চালাতাম, বিলাসিতার চর্চা করিনি। কিন্তু রাজনৈতিক আশ্রয় পাবার পর বলা হলো জীবনযাপনে জাঁকজমক না থাকলে মানুষ নাকি আমাকে নেতা বলে মানতে চাইবে না। যা কিছু দেখছেন, এ-সবই কেনিয়ার প্রেসিডেন্টের উদারতা।'

'কিন্তু আমি জানতাম আপনি তাঞ্জানিয়ায়।'

'কিছুদিন ছিলাম ওখানে,' বললেন বাবা সালাহউদ্দিন। 'বেচারা জুলিয়াস। তাঁকে অনেক চাপ সহ্য করতে হয়েছে। সে এক বিব্রতকর অবস্থা। আমার হয়ে কেনিয়া সরকারকে অনুরোধ করেন তিনি। সত্যি আমি কৃতজ্ঞ। প্রেসিডেন্ট নাই আমাকে তাঁর ডানার ভেতর আশ্রয় দিয়েছেন। ওহ্ গড, আমি আমার ম্যানার ভুলে গেছি। অ্যালাও মি টু অফার ইউ সাম রিফ্রেশমেন্ট।' কথা শেষ করে একটা আঙুল খাড়া করলেন তিনি, প্রভুভক্ত শিকারী কুকুরের মত দ্রুত ও নিঃশব্দে বার-এর দিকে এগোল বাদামী জ্যাকেট।

'আমার শুধু বিয়ার চলতে পারে,' বলল রানা। 'ঠাণ্ডা।' পশ্চিম দিকে তাকাল ও। দিগন্তের কাছাকাছি সূর্য থেকে সোনালি আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, আকাশের রঙ পালিশ করা পিতল।

'আসুন হাঁটা যাক,' রানার একটা বাহু ধরলেন বাবা সালাহউদ্দিন। 'আমার মেজবানের উদারতাও দেখবেন, কাজের কথাও হবে।'

পুলের কিনারা ধরে এগোল ওরা। স্বচ্ছ, পরিষ্কার পানি, বাতাস না থাকায় প্রতিবিম্বগুলো ভাঙছে না।

ডোবারম্যানকে নিয়ে লনের শেষ মাথায়, তারপর বাড়ির আরেক দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল টহলরত লোকটা। 'এখানে আপনার নিরাপত্তার কোন অভাব আছে বলে তো মনে হচ্ছে না, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'মন্দের ভাল বলব। অতি উৎসাহী অ্যামেচারদের ঠেকানো যাবে। তবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ একটা গ্রুপের জন্যে এসব কোন বাধাই নয়।'

'সেরকম হামলা হবার ভয় আছে নাকি?'

'অসম্ভব নয়, মেজর রানা। আমার লাশ দেখতে চায় এমন লোকের সংখ্যা কম নয়।'

'যেমন বোগামুরা?'

সামান্য হাসলেন বাবা সালাহউদ্দিন। 'তালিকায় তার নামটাই সবার ওপরে।'

'তিনি যদি আপনাকে একটা হুমকি বলে মনে করেন। আপনি কি তাই?'

'মেজর রানা, অন্যায়ভাবে আমার বৈধ সরকারকে উৎখাত করা হয়েছে। লুগাম্বা আমাকে ফেরত পেতে হবে। ওখানে কি ঘটছে আপনাকে তা নতুন করে বলার দরকার নেই। আমার দেশবাসীকে মেরে সাফ করে ফেলছে উন্মাদ জানোয়ারটা। আড়াই লাখ লোককে আমরা হারিয়েছি, বোগামুরা তাদেরকে খুন করেছে। দেশটা ডুবতে বসেছে, মেজর রানা। যে ভাবেই হোক তাকে থামাতে হবে।'

'থামাবার কাজটা কে করবে? একবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন আপনি।'

'হ্যাঁ, স্বীকার করছি, ব্যাপারটা ছেলেমানুষি হয়ে গেছে। অযোগ্য লোকদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। ত্রুটি ছিল আয়োজনেও।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হঠাৎ রানা জিজ্ঞেস করল, 'এরকম নাটক করলেন কেন? ভেবেছিলাম প্রসঙ্গটা আপনিই তুলবেন।'

'আপনি লুগাম্বায় যাচ্ছেন, মেজর রানা। আমি কারণটা জানতে আগ্রহী।'

'তারমানে গোনজালেসের সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার,' বলল রানা।

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন বাবা সালাহউদ্দিন।

চিন্তায় পড়ে গেল রানা। গোনজালেস এ কাজ কেন করল? 'আপনার সঙ্গে আমি কোন চুক্তিতে আসব না,' বলল ও।

'মেজর রানা, লুগাম্বা আমার দেশ। আমাকে অন্যায়ভাবে উৎখাত করা হয়েছে…।'

'জানি, অস্বীকারও করছি না, কিন্তু এ-ও তো সত্যি যে আপনার কিছু দুর্বলতা আপনাকে বিপদে পড়তে সাহায্য করে। আবদুর রহিম নকুইকিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে কাজটা আপনি ভাল করেননি। প্রমোশন দেয়ার আগে বোগামুরা সম্পর্কে ভাল করে খোঁজ-খবর করা উচিত ছিল আপনার।'

জবাবে কিছুই বললেন না বাবা সালাহউদ্দিন। কিছুক্ষণ পর তিনি জানতে চাইলেন, 'আপনি কি কোন অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে লুগাম্বায় যাচ্ছেন, মেজর রানা?'

'গোনজালেস আপনাকে বলেনি?'

'সে শুধু আপনাকে ইকুইপমেন্ট দেয়ার কথা স্বীকার করেছে।'

'আমি একটা কাজ নিয়ে যাচ্ছি ওখানে, হ্যাঁ,' বলল রানা। 'এর বেশি কিছু জানতে চাইবেন না, প্লীজ।'

'আমি শুনেছি আপনি বিজ্ঞানী আনিস সিদ্দিকীকে বের করে আনতে যাচ্ছেন।'

রানা কথা বলল না।

'আমার জানতে ইচ্ছে করছে, এর মধ্যে আর কিছু আছে কিনা।'

'কি আশা করেন আপনি? বিরাট একটা বাহিনী নিয়ে লুগাম্বা আক্রমণ করব আমি?'

'আপনার সুনাম সম্পর্কে আমার জানা আছে, মি. মাসুদ রানা,' বাবা সালাহউদ্দিন বললেন। 'বিরাট একটা বাহিনী নিয়ে যান বা না যান, আমার ধারণা ছিল বোগামুরার বিরুদ্ধে কিছু একটা করবেন আপনি—বিশেষ করে লুগাম্বায় যখন যাচ্ছেন।'

'আপনাকে হতাশ করার জন্যে আমি দুঃখিত, মি. প্রেসিডেন্ট।'

বিয়ার নিয়ে হাজির হলো বাদামী জ্যাকেট। লোকটা চলে যাবার পর পুলের পানিতে চোখ রেখে আবার তিনি বললেন, 'আমার একটা প্রস্তাব ছিল, মেজর রানা।'

'শুনে আমার ভাল লাগবে বলে মনে হয় না।'

'মেজর রানা, কেউ যদি বোগামুরাকে মারতে পারে আমি তাকে দুই মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুরস্কার দেব।'

কাছাকাছি একটা টেবিলে হাতের গ্লাসটা নামিয়ে রাখল রানা, মাত্র একবার চুমুক দিয়েছে। 'না।'

'না কেন?'

'আমি প্রফেশন্যাল অ্যাসাসিন নই, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'আপনি তাহলে মানবিক দিকটা উপেক্ষা করবেন?' বাবা সালাহউদ্দিনের ভরাট গলায় আবেদনের সুর।

দ্বিধা বোধ করছে রানা। উত্তর দিতে দু'সেকেন্ড দেরি করল। 'এরইমধ্যে আমি একটা অপারেশন করব বলে একজনকে কথা দিয়েছি, মি. প্রেসিডেন্ট। আনিস সিদ্দিকীকে উদ্ধার করে আনাই আমার একমাত্র দায়িত্ব। আমার ক্লায়েন্ট একশো ভাগ

ডেডিকেশন আশা করেন, পাবেনও তাই।'

'দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয়বারের মত আপনি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন,' ধীরে ধীরে বললেন বাবা সালাহউদ্দিন। 'তবে ভাববেন না যে তাই বলে আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টে গেল। আমি এখনও বিশ্বাস করি আপনি অত্যাচারীকে ঘৃণা করেন, কোথাও জুলুম হচ্ছে দেখলে সহ্য করেন না। আমি ধরে নিচ্ছি, টাকা নিতে আপনার আপত্তি আছে, তবে সুযোগ পেলে কাজটা আপনি করবেন। সে যাই হোক, আপনার সময় নষ্ট করার জন্যে ক্ষমা চাই।' নিজের হাতটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে হাসলেন তিনি। 'আমি আপনার সাফল্য কামনা করি, মেজর রানা। কামনা করি সুস্থ শরীরে ফিরে আসুন লুগাম্বা থেকে। আমার লোকেরা হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দেবে আপনাকে।'

রানা চলে যাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে ক্ষীণ হাসলেন বাবা সালাহউদ্দিন, যেন গোপন কি একটা কথা মনে পড়ে গেছে তাঁর। হাতে গ্লাস রয়েছে, খেয়াল হতে চুমুক দিলেন তিনি, সামান্য অন্যমনস্ক দেখাল তাঁকে। টেরেসের দিকে পিছন ফিরে গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, যেন ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে বোঝার চেষ্টা করছেন।

লোকটা টেরেস থেকে নিঃশব্দে নেমে এল। এখনও অনেকটা দূরে সে, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সর্তক করে দেয়ায় হঠাৎ ঝট করে ঘুরলেন বাবা সালাহউদ্দিন।

লোকটা দৃঢ় ও দ্রুত পদক্ষেপে কাছে চলে এল।

'তোমার চলাফেরা চিতার মত, মবুতু,' প্রশংসা করলেন বাবা সালাহউদ্দিন।

কাছে এসে দাঁড়াল তারিক মবুতু। 'লোকটা কে ছিল?'

'অন্য এক জগতের মানুষ, চেষ্টা করলেও আমরা তাঁকে বুঝতে পারব না। উনি তোমাকে দেখেননি তো?'

মাথা নাড়ল মবুতু।

তাকে খুঁটিয়ে দেখলেন বাবা সালাহউদ্দিন। শরীর মানে মেদবিহীন পেশীর সমষ্টি, প্রায় ছ'ফুট লম্বা। মাথাটা কামানো, চোখ দুটো অসম্ভব উজ্জ্বল আর চকচকে। তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে প্রায় গোয়ার্তুমির ভাব নিয়ে। নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে এই লোকের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। মবুতু একজন জুলু, বয়েস তেত্রিশ। তার পূর্ব-পুরুষরা বীর ছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেছে সবাই। মবুতুর রক্তেও সাহস ও বীরত্বের বীজ লুকিয়ে আছে। 'বসো, মবুতু।' ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখালেন তিনি।

খোলা জানালাগুলোর দিকে মুখ করে বসল মবুতু।

'জানো তো, তুমি এখানে কেন?' বাবা সালাহউদ্দিন জিজ্ঞেস করলেন।

'আমাকে বলা হয়েছে, আপনি আমাকে একটা কাজ দেবেন।'

'হ্যাঁ, বিশেষ একটা কাজ।'

'আমার সব কাজই বিশেষ,' বলল মবুতু। 'বলুন, কাকে খুন করতে হবে?'

'বোগামুরা।'

চেহারায় কোন ভাবান্তর হলো না, মবুতু বলল, 'বেশ। আমাকে ফি দিতে হবে এক লাখ মার্কিন ডলার।'

'একটু বেশি হয়ে যায় না?'

'এটাই আমার সাধারণ ফি। রাষ্ট্রপ্রধানকে মারব বলে ডিসকাউন্ট দিতে পারি না।

তাছাড়া, ফেরিওয়ালাদের মত দর কষাকষিও পছন্দ নয় আমার।'

'ঠিক আছে, এক লাখ ডলার। ক্যাশ?'

'স্বভাবতই।'

'অর্ধেক এখন, বাকি অর্ধেক কাজ সারার পর, ঠিক আছে?'

'চলবে।'

'গুড। এবার বলো, কাজটা কিভাবে করতে চাও তুমি।'

চেয়ার ছেড়ে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়াল মবুতু যেন একটা সাপ কুণ্ডুলী ছাড়াল। 'আপনি আমাকে টাকা দিচ্ছেন, আমি আপনার কাজ করে দেব। কিভাবে করব সেটা আমার ব্যাপার, জানতে চাইবেন না। এক হপ্তার মধ্যে খবর পাবেন বোগামুরা নেই।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বাবা সালাহউদ্দিন বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার কথা আমি মেনে নিলাম। কাল সকালে প্রথম কিস্তির টাকা তোমার কাছে পৌঁছে যাবে। তোমাকে একজনের নামও দেয়া হবে, বোগামুরার কাছাকাছি আছে সে। তার সাহায্য তোমার কাজে লাগবে।'

'এখন তাহলে আমি আসি।'

পাঁচ

রিসেপশনিস্ট চাবির সঙ্গে একটা মেসেজ দিল রানাকে। মেসেজটা পাঠিয়েছে গোনজালেস। নাসিমের ঠিকানা পেয়েছে সে।

প্রথমবার নক করতেই দরজা খুলে দিল জামিল। তার চুল ভিজে, বাথরূমে ছিল। 'রানা! কোথায় ছিলে তুমি? ডেস্ক থেকে বলল দু'জন লোকের সঙ্গে বেরিয়ে গেছ। ব্যাপার কি?'

বিছানায় শুয়ে রয়েছে জাফর, হাত দুটো মাথার পিছনে, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে একটা চুরুট। রানাকে দেখে ঝট করে চুরুটটা লুকিয়ে ফেলল সে, উঠে বসল। 'আমরা আপনার জন্যে দুশ্চিন্তা করছিলাম, মাসুদ ভাই।'

কি ঘটেছে সংক্ষেপে ওদেরকে জানাল রানা।

'বাবা সালাহউদ্দিন নাইরোবিতে? কি চান তিনি?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল জামিল।

'বোগামুরাকে পথ থেকে সরাতে চান। দুই মিলিয়ন ডলারের অফার।'

তোয়ালে দিয়ে মাথার পানি মুছছিল জামিল, হাত দুটো স্থির হয়ে গেল। ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে দাঁড়াল জাফর।

'আমি বলেছি—না।'

কেউ প্রতিবাদ করল না, এমন কি বাবা সালাহউদ্দিনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার কারণও জানতে চাইল না। তবে দু'জনেই ওরা গোনজালেসের ভূমিকা শুনে রেগে গেল। 'একজনকে বললে আরেকজনকে বলতে অসুবিধে কি?' বলল জামিল। 'গোনজালেসকে একটু টাইট দেয়া দরকার।'

জাফর বলল, 'আপনি বললে তার একটা পা ভেঙে দিয়ে আসি, মাসুদ ভাই—আমাদের সাপ্লাই ডেলিভারি পাবার পর।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ও ব্যাটা পর্তুগীজ পুব-আফ্রিকায় প্রধান ব্রোকার, বাবা সালাহউদ্দিন তার সঙ্গে অনেক দিন থেকে যোগাযোগ রাখছেন। গোনজালেস যদি কারও সঙ্গে কোন চুক্তি করে আর সেটা যদি বোগামুরা বা লুগাম্বার বিরুদ্ধে যায়, তিনি তো জানতে চাইবেনই। তাছাড়া, বাবা সালাহউদ্দিন আমার সম্পর্কে জানেন। এর আগে গোনজালেসের মাধ্যমেই প্রথমবার প্রস্তাবটা আমাকে দিয়েছিলেন।'

'আমরা কাউকে খুন করার দায়িত্ব নিতে পারি না,' বলল জামিল, রানার ব্যাখ্যা মেনে নিল।

রানাকে সামান্য অন্যমনস্ক দেখে জাফর জিজ্ঞেস করল, 'মাসুদ ভাই, আপনাকে যেন চিন্তিত মনে হচ্ছে?'

'আমাকে রাজি করানোর জন্যে বাবা সালাহউদ্দিন খুব জোরের সঙ্গে চেষ্টা করেননি,' বলল রানা, মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে। 'কেন বুঝতে পারছি না।'

'আবার বলো,' তোয়ালে ফেলে দিয়ে চুলে চিরুনি তুলল জামিল।

'আমি প্রত্যাখ্যান করার পর উনি আর কিছু বললেন না। মনে হলো আমি রাজি হব না তা তিনি জানতেন।' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ব্যাপারটা আমার কল্পনাও হতে পারে।'

'গোনজালেসের সঙ্গে কি কথা হলো, সব সে দিতে পারবে তো?'

'পারবে, শুধু পাইলট পেতে একটু দেরি হতে পারে। সুনীল বোস আর চ্যাং ওয়েন শহরে নেই। তবে সে আমার এক পুরানো বন্ধুকে খুঁজে বের করেছে।'

'কে সে? আমরা চিনি?' জানতে চাইল জামিল।

'নাসিম,' মুচকি হেসে বলল রানা।

জামিল বলল, 'আমি শুনেছি নাসিম লেবাননে, হামাস বাহিনীর জন্যে প্লেনে করে মেডিকেল সাপ্লাই পৌঁছে দিচ্ছে।'

'দেখা যাচ্ছে তুমি আমার চেয়ে বেশি খবর রাখো,' বলল রানা। 'আমি জানতাম সে গাজায় মহিলা পুলিসদের ট্রেনিং দিচ্ছে। তবে গোনজালেস আমাদের দুজনের চেয়ে বেশি জানে। নাসিম এখন নাইরোবিতে।'

'আপনি বললেই দলে যোগ দেবে সে,' বলল জাফর। 'আপনি তো তার হিরো।'

'এয়ারফিল্ডে যাচ্ছি আমি,' বলল রানা। 'কথা বলে দেখি।'

মেইনটেন্যান্স হ্যাঙ্গারে আলো জ্বলছে। চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতায় লাল-সাদা পাইপার চীফটানকে দেখতে লাগছে অপারেশন টেবিলে ফেলে রাখা রোগীর মত, সার্জেনের আসার অপেক্ষায় রয়েছে। হ্যাঙ্গারের জোড়া দরজা খোলা, বাইরের অন্ধকার টারমাকে মোটা এক ফালি আলো বেরিয়ে এসেছে। হ্যাঙ্গারের বাইরে, এক পাশে সারি সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে প্লেনগুলো—সেসনা, বিভার, কমান্ডার, লিয়ার জেট। এ-সবই একটা প্রাইভেট তেল কোম্পানীর সম্পত্তি।

ভেতরে, চীফটানের ফিন থেকে সামান্য দূরে, যন্ত্রপাতি ছড়ানো ওঅর্ক বেঞ্চের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে নাসিম, চেহারায় গভীর মনোযোগের চিহ্ন। ছেঁড়া ফুয়েল লাইনটা মরা সাপের মত পড়ে রয়েছে পায়ের কাছে।

এক প্রস্থ ওভারঅল পরে রয়েছে নাসিম, দেখে বোঝার উপায় নেই এককালে ওটা

দুধের মত সাদা ছিল। মেইনটেন্যান্স-এর কাজ নিজেই করে সে, তেল-কালি লেগে যা তা অবস্থা। এই মুহূর্তে তার হাত ও মুখও নোংরা হয়ে রয়েছে। তবে তার দেহসৌষ্ঠব বা চেহারার সৌন্দর্য তাতে এতটুকু ম্লান হয়নি।

টারমাক থেকে কোন শব্দ পায়নি নাসিম, লোক দু'জন হ্যাঙ্গারে ঢোকার পরও টের পায়নি সে। দু'জনেই ওরা রবারের সোল লাগানো জুতো পরে আছে।

'বেশ, বেশ। দেখা যাচ্ছে পাইলট নিজেই মেকানিক।'

ঝট করে আধ পাক ঘুরল নাসিম, হাতে একটা স্প্যানার চলে এসেছে।

নাসিমের মুখের ওপর হাসল জন বেরি। সে একজন ইউরোপিয়ান, মাথায় সোনালি চুল। তার সঙ্গীর নাম মার্ক রডনি, সে-ও ইউরোপিয়ান। বেরির চেয়ে এক ফুট খাটো রডনি, তবে শরীরটা খুব চওড়া তার।

'কি চাও তোমরা?' হাতের স্প্যানারটা বেঞ্চের ওপর নামিয়ে রাখল নাসিম।

খয়েরি চোখ দিয়ে নাসিমের পা থেকে মাথা পর্যন্ত লোভাতুর দৃষ্টি বুলাল রডনি। কাজটায় এত মগ্ন সে, কথা বলার সময় পেল না।

বেরি এখনও হাসছে। 'মিস্টার ডেল নিকোলাস পাঠালেন আমাদের। তিনি তোমার কাছে টাকা পান, সেটা চেয়েছেন।'

'তাঁকে তো আমি বলেছি, দু'একটা দিন অপেক্ষা করতে হবে।'

'মি. নিকোলাস অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত নন,' বলল বেরি। 'তিনি তাঁর টাকা এখুনি চান।'

'যাও, গিয়ে বলো আমি তাঁর সঙ্গে টাকা নিয়েই দেখা করব—দু'একদিনের মধ্যেই,' বলল নাসিম। 'ছ'হাজার ডলার কেউ নিজের সঙ্গে রাখে না।'

'সাত হাজার,' বলল বেরি। 'সুদের কথা ভুলে যেয়ো না।'

'দু'দিনে এক হাজার ডলার সুদ? এ তোমরা কি বলছ, বেরি?'

'আমার তো মনে হয় সুদের এই হার খুবই যুক্তিসঙ্গত,' হাসিমুখে জবাব দিল বেরি। 'ক্লাব থেকে বেরিয়ে আসার সময় মি. নিকোলাসকে তুমি কথা দাও দু'দিনের মধ্যে টাকাটা দিয়ে আসবে। দেনাদারকে ক্লাব থেকে বেরিয়ে আসতে দিয়েছেন তিনি, এই-ই তো বেশি। এখন কথা হলো, মাঝরাত হতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। বারোটা বাজলেই তৃতীয় দিন শুরু হবে। মি. নিকোলাস যদি পাওনাদার হন, সুদের হার তিনিই ঠিক করে দেন।'

'নির্দিষ্ট দিনে টাকা দিতে পারিনি, তাই দু'জন গুণ্ডাকে পাঠিয়েছেন তিনি?'

অদ্ভুত একটা আওয়াজ হলো, যেন একটা কুকুর রেগে গিয়ে গলার ভেতর ঘড়ঘড় শব্দ করছে। রডনির দিকে তাকাল নাসিম, জিজ্ঞেস করল, 'রডনি, তোমার পূর্ব-পুরুষ কেউ কুকুর ছিল নাকি?'

'তুমি আমাদেরকে গুণ্ডা বলায় রডনি রেগে গেছে,' বলল বেরি। 'অনেক কষ্টে ওকে আমি সামলে রেখেছি। কিন্তু এরপর যদি অপমান করো, আর তখন যদি ও কামড়ে দেয় তোমাকে, আমাকে দোষ দিতে পারবে না।'

'তোমার দোহাই লাগে, বেরি,' বলল রডনি, 'আমাকে ছেড়ে দাও। কথা দিচ্ছি শুধু একটা কামড় দেব।'

'দেখলে?' চোখ নাচিয়ে বলল বেরি।

'শোনো, বেরি,' বলল নাসিম। 'ক্লাব থেকে এসে পরদিন সকালেই ব্যাংকে চেক জমা দিয়েছি। লেবানন থেকে টাকা আসতে দেরি হচ্ছে বলে ক্যাশ হয়নি ওটা। সেজন্য আমি দায়ী নই, ব্যাংক দায়ী। তুমি মি. নিকোলাসকে গিয়ে বলো…।'

'না, দুঃখিত। মি. নিকোলাস বলে দিয়েছেন কোন খোঁড়া অজুহাত তিনি মানবেন না।'

'প্লীজ, বেরি, আমার হয়ে তুমি তাঁকে একটু বোঝাও। আর অন্তত একটা দিন সময় দেয়া হোক আমাকে।'

'মি. নিকোলাস বলেছেন টাকা তোমার না দিলেও চলবে। সাত হাজার ডলার, এ তাঁর হাতের ময়লা। টাকা দিয়ো না, তার বদলে একমাস তুমি তাঁর বাংলোয় থাকো…।'

নাসিমের চোখ থেকে আগুন ঝরল। 'কি বললে? আবার বলো তো!'

'আর তা না হলে, মি. নিকোলাস বলে দিয়েছেন, বীমা হিসেবে এখান থেকে একটা কিছু নিয়ে যেতে হবে আমাদের।'

'একটা কিছু নিয়ে যেতে হবে মানে? কি নিয়ে যাবে? আমার ডান হাত?'

'ওটার কথা পরে ভাবা যাবে,' বলল বেরি। 'উনি ওটার কথা ভেবেছেন।' আঙুল তুলে চীফটানটা দেখিয়ে দিল সে।

'তোমরা পাগল হয়ে গেছ!' গলা চড়ছে নাসিমের, অসহায় দেখাচ্ছে তাকে। 'ছ'হাজার ডলারের জন্যে তোমরা আমার প্লেনে হাত দিতে চাও?'

'সাত হাজার,' বলল বেরি।

'ইউ, সান অভ আ বীচ!' হিসহিস করে উঠল নাসিম। 'প্লেনে হাত দিতে হলে আমার লাশ ডিঙাতে হবে তোমাদের…।'

'সেটা কঠিন কোন কাজ নয়,' শান্ত সুরে বলল বেরি। 'আমাকে প্ররোচিত কোরো না।'

'খোদার কসম বলছি, বেরি! কাল সকালে টাকাটা ব্যাংকে এসে যাবে।'

'ব্যাপারটা আমাকে নিয়ে নয়, নাসিম। মি. নিকোলাসকে নিয়ে। তোমার ওপর তার নজর পড়েছে। আমি বলি কি, রাজি হয়ে যাও। একটা মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে, সময়টা তুমি উপভোগও করবে।' চেহারায় প্রশংসার ভাব ফুটিয়ে বলল, 'বয়স হলে কি হবে, এখনও খুব ভাল পারেন।'

'বেরি, আমি কিন্তু পুলিস ডাকব!' চোখ রাঙাল নাসিম।

'পুলিস তো মি. নিকোলাসের পকেটে থাকে,' বলল বেরি। 'দাও, চাবি আর ডকুমেন্টগুলো দাও। নিজে থেকে যদি না দাও, কেড়ে নিয়ে যাব, তুমি জানো।'

বেঞ্চ থেকে আবার স্প্যানারটা তুলে নিল নাসিম, সেটা বাগিয়ে ধরে লাফিয়ে পড়ার ভঙ্গি নিল সে।

'দেখো দেখি কাণ্ড, তুমি দেখছি আহত হতে চাইছ!' অবাক হয়ে বলল বেরি।

সামনের দিকে ঝুঁকে আক্রমণের ভঙ্গি নিল রডনি, ধীরে ধীরে ডান পাশে সরে আসছে।

বেরি সরে যাচ্ছে বাম দিকে।

নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল না নাসিম, সে একদৃষ্টে বেরির দিকে তাকিয়ে আছে,

রডনির অস্তিত্ব সম্পর্কে যেন সচেতন নয়। ধীরে ধীরে তার পিছন দিকে আসার চেষ্টা করছে বেরি, তার সঙ্গে ঘুরে যাচ্ছে নাসিম। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে মনে মনে হাসল রডনি। ঠিক যখন লাফ দেয়ার সময় হয়েছে তার, লাফ দিয়েওছে, এই সময় হাতের স্প্যানারটা সবেগে চালাল নাসিম—বেরির দিকে নয়, রডনির দিকে।

মেরেছিল মাথার পাশে, লাগল কাঁধের ওপর। কাতরে উঠল রডনি, বসে পড়ল হ্যাঙ্গারের মেঝেতে, চোখে সর্ষে ফুল দেখছে।

রডনিকে মেরেই বেরির দিকে ঘুরে গেছে নাসিম। হাত দুটো দু'পাশে মেলে এগিয়ে এল বেরি। এত দ্রুতবেগে হাত চালাল নাসিম, স্প্যানারটা ভাল করে দেখাই গেল না। লক্ষ্যস্থির করেছে বেরির মাথায়। লাগল না, স্যাৎ করে নাগালের বাইরে সরে গেছে বেরি। নাসিম পিছন ফিরে থাকায় রডনিকে দেখতে পায়নি, ইতিমধ্যে দাঁড়িয়েছে সে। ঝাঁপিয়ে পড়ল, পিছন থেকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল নাসিমকে। এই সুযোগে এগিয়ে এসে ঠাস করে তার গালে চড় মারল বেরি, হাত থেকে কেড়ে নিতে চেষ্টা করল স্প্যানারটা। ধস্তাধস্তির মধ্যে মেঝেতে পড়ে গেল সেটা।

নাসিমের চওড়া পিঠে সওয়ার হলো রডনি। সামনের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য করল তাকে। নাসিমের ভাঁজ করা হাঁটু মেঝে স্পর্শ করল। সামান্য পিছিয়ে এসে নাসিমের গালে দু'হাতের আঙুল বুলাল বেরি। 'ছুঁয়েও আরাম,' হাসতে হাসতে বলল সে। পিঠে ভারি বোঝা থাকা সত্ত্বেও তাকে লক্ষ্য করে একটা ঘুসি মারল নাসিম, কিন্তু বেরি সরে যাওয়ায় লাগল না সেটা। এবার পাল্টা ঘুসি মারার জন্যে মুঠোটা শক্ত করল বেরি।

'থামো!' গর্জে উঠল কে যেন।

চমকে উঠে ঘুরল বেরি। দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে রানা, বাম পা সামান্য এগিয়ে, কোমরের দু'পাশে হাত দুটো শক্ত।

নাসিমকে ধরে অনবরত ঝাঁকাচ্ছে রডনি।

'ওকে ছেড়ে দিতে বলো,' নিচু গলায় হিসহিস করে উঠল রানা।

'তুমি বাপু যেই হও,' বলল বেরি, 'ভাল চাও তো কেটে পড়ো। তা না হলে কিন্তু সারাজীবন পস্তাতে হবে।'

'ভুল করছ,' বলল রানা। 'যা বলছি শোনো। তোমার লোককে বলো এখুনি ওকে ছেড়ে দিক।'

বেরির কাছ থেকে দু'গজ দূরে রানা। হেসে উঠে বেরি বলল, 'পরে আবার বলো না যে আমি তোমাকে সাবধান করিনি।' রানার দিকে এগোল সে।

আধ পা সামনে বাড়ল রানা। দেখে মনে হলো মুহূর্তের জন্যে টলে উঠল শরীরটা, পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল। এমন চোখের পলকে কেউ নড়ে উঠতে পারে, বেরির ধারণা ছিল না। সে কিছু বুঝতে পারার আগেই রানার একটা বুট আঘাত করল বুকের খাঁচার এক ইঞ্চি নিচে। হোঁচট খেতে খেতে পিছিয়ে এল সে, সিলিন্ডার থেকে গ্যাস বেরিয়ে আসার মত শব্দ পাওয়া গেল নাক-মুখ থেকে। বেরি মেঝেতে তখনও পড়েনি, রডনির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে রানা।

হতভম্ব দেখাচ্ছে রডনিকে, তবে নাসিমকে এখনও ছাড়েনি সে। এখনও তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে পাইলট। নাসিম ও আগন্তুক, দু'জনের মধ্যে আগন্তুককেই হুমকি বলে

মনে হলো রডনির। নাসিমকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ তুলে রানার দিকে এগোল সে।

ছিটকে ওঅর্কবেঞ্চের গায়ে পড়ল নাসিম, কপালটা পায়ার সঙ্গে ঠুকে যাওয়ায় কেটে গেল চামড়া।

রডনি আক্রমণ করবে, রানা অপেক্ষা করছে।

কিন্তু আক্রমণ করল রডনি বা রানা নয়। হাতে একটা লম্বা রেঞ্চ, সেটা রডনির পায়ের ওপর গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে নামিয়ে আনল নাসিম। এক পায়ে যেভাবে লাফাতে শুরু করল রডনি, কমিক বইয়ের একটা চরিত্র বলে মনে হলো তাকে। হাতের রেঞ্চটা আবার চালাল নাসিম, অক্ষত পায়ের হাঁটু লক্ষ্য করে। মেঝেতে বসে তীব্র ব্যথায় গোঙাতে শুরু করল রডনি।

নাসিম ওঅর্ক বেঞ্চের গায়ে নেতিয়ে পড়ল, চোখ বন্ধ। কপাল থেকে রক্ত ঝরছে। এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রাখল রানা। ওর পিছনে ধীরে ধীরে সিধে হচ্ছে বেরি, ফ্যাকাসে হয়ে আছে চেহারা।

মাথাটা ঝাঁকিয়ে কাতর রডনিকে দেখাল রানা, বলল, 'ওকে নিয়ে বিদায় হও। জলদি।'

এক হাতে পেট খামচে ধরে অপর হাত দিয়ে রডনিকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করল বেরি। হ্যাঙ্গারের মেঝেতে খানিকটা বমি করল রডনি।

আঙুলের ডগা দিয়ে কপালের ক্ষতটা আলতোভাবে স্পর্শ করল নাসিম। তার মাথা ঘুরছে, চোখ খুলতে পারছে না।

বেরির কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াচ্ছে রড়নি, দু'জনই কাতরাচ্ছে, ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছে হ্যাঙ্গার থেকে।

নাসিমের হাতটা সরিয়ে দিয়ে ক্ষতটা পরীক্ষা করল রানা। 'তেমন সিরিয়াস কিছু নয়। আর কোথাও ব্যথা পেয়েছ?'

নাসিমের মনে হলো কে যেন তাকে শুধু শুধু বিরক্ত করছে। মাথাটা ঘুরছে তার, অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক। অনেক কষ্টে চোখ খুলল সে। প্রথমে সব কিছু ঝাপসা লাগল। তারপর মায়াভরা একজোড়া চোখ দেখতে পেল। কালো চোখ, কালো চুল, গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামলা। এতক্ষণে চিনতে পারল সে।

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'তোমার কথা ভেবে আমি খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম।'

'ও আল্লা, তু-তু-তুমি...?'

'উফ্, মাগো! রানা, আমার লাগছে তো!'

চীফটানে রয়েছে ওরা। প্লেনের ফার্স্ট এইড বক্স থেকে আইওডিন বের করে সেলিনা নাসিমের কপালে লাগিয়ে দিচ্ছে রানা। তুলোর একটা বল তৈরি করে অ্যান্টিসেপটিকে ভিজিয়েছে, ক্ষতটা পরিষ্কার করে নিয়েছে আগে। 'নড়বে না!' ধমক দিল ও।

নাসিমের সবুজ চোখে কৌতুক। 'কেউ তোমাকে বলেছে কখনও, বেডসাইড ম্যানার বলতে কিছুই তোমার জানা নেই?'

ঝিক করে উঠল রানার দাঁত, নিঃশব্দে হাসছে। 'আগে তো কখনও অভিযোগ

করোনি।'

ঠোঁট ফোলাল নাসিম, ফর্সা মুখ সামান্য লালচে দেখাল। 'তখন আমি ছোট আর বোকা ছিলাম।'

ক্ষতটা এক ফালি টেপ দিয়ে মুড়ে দিল রানা। 'এবার বেঞ্চটা দেখি। যন্ত্রপাতি সব ছড়িয়ে পড়েছে।'

রানার একটা হাত ধরে ফেলল নাসিম। 'যেয়ো না, পাশে বসে থাকো কিছুক্ষণ।'

ফার্স্ট এইড বক্সটা লকারে রেখে ফিরে এল রানা, বসল নাসিমের পাশে। 'কিছু বলবে?'

রানার উরুর ওপর মাথা তুলে চোখ বুজল নাসিম। 'তুমি আমাকে ওর সেই গল্পটা বলো…সেই যে, জিম্বাবুইয়ে যেবার তোমরা হাতি শিকারে গিয়ে সিংহের মুখে পড়েছিলে…।'

'অনেক বার তো শুনেছ,' ইতস্তত করছে রানা। 'তুমি কি অতীত নিয়েই বেঁচে থাকতে চাও, নাসিম? ও মারা গেছে আজ চার বছর হতে চলল…।'

'তোমাকে দেখলেই নাসিমের কথা বেশি করে মনে পড়ে আমার। বারবার বলত, আমার যদি কিছু হয়, রানা তোমাকে দেখবে—সেটা বোধহয় কারণ। হ্যাঁ, রানা, নাসিমকে আমি চিরকাল মনে রাখব। বলো না গল্পটা, আরেকবার শুনি, প্লীজ!'

নাসিমের মত এত সুন্দরী মেয়ে খুব কম দেখেছে রানা। শুধু যে শরীর আর চেহারা সুন্দর তা নয়, মনটাও ভারি সুন্দর। তবে তার সবচেয়ে বড় সম্পদ চারিত্রিক গুণ ও পবিত্রতা। তার ছেলেমানুষি দেখে অনেকে ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু বন্ধুর স্ত্রীকে খুব ভাল করে চেনে রানা, ভুল বোঝার কোন অবকাশ নেই। ছেলেমানুষি বলতে, নাসিম যাকে বিশ্বাস করে তার সঙ্গে কোন রকম সংকোচ না করে পুরুষ বন্ধুর মত মেলামেলা করার প্রবণতা। স্বামী মারা যাবার পর থেকে নয়, এটা তার ছেলেবেলার স্বভাব। ছেলে বা পুরুষ সাজতেও খুব পছন্দ করে সে। মেয়েলি পোশাকে তাকে কখনও দেখেছে কিনা মনে পড়ে না রানার। চলাফেরা, পেশা নির্বাচন, মেলামেশা, সব কিছুতে পুরুষদের অনুসরণ বা অনুকরণ করে নাসিম। পুরুষদের না বলে বলা উচিত স্বামীকে। এমনকি স্বামীর নামটাও ব্যবহার করছে সে।

খুব কম লোকই জানার সুযোগ পায় যে নাসিম মেয়ে। জানার পর চুম্বুকের মত আকৃষ্ট হয় তারা। কিন্তু নাসিমের অন্তরে উঁকি মারার সুযোগ কেউ কোনদিন পায় না। মেয়েটার স্বাধীনচেতা মনোভাব, দু'কূল ছাপানো যৌবন, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি দেখে মুগ্ধ ও বিহ্বল না হয়ে পারা যায় না, কিন্তু তাকে পাবার আশা করলে শুধু হতাশই হতে হবে।

নাসিম বখতিয়ার ছিল তাঞ্জানিয়ার ন্যাশনাল গেইম রিজার্ভ-এর চীফ ওয়ার্ডেন। তার মনটাও ছিল বিশাল বনভূমির মত উদার, যে বনভূমির সে রক্ষাকর্তা ছিল। বাবার সঙ্গে শিকার করতে এসে তার সঙ্গে পরিচয় হয় সেলিনার, বিশ বছর বয়েসে। মাত্র দশ দিনের পরিচয়েই সেলিনা সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, বাকি জীবনটা এই লোকের সঙ্গেই কাটাবে সে। হবু স্ত্রীর চেয়ে বারো বছরের বড় ছিল বখতিয়ার। মোম্বাসার একটা রেজিস্ট্রি অফিসে বিয়ে করে ওরা, রিজার্ভের চারদিকে ঘুরে বেড়িয়ে এক মাস হানিমুনে কাটায়। বখতিয়ারের কাছ থেকে একটা রোগ উপহার পায় সেলিনা—আফ্রিকার প্রতি গভীর

ভালবাসা। ভালবাসা যায় এমন আরও একটা শখ আবিষ্কার করে সে—আকাশে ওড়া।

পোচাররা বিপজ্জনক হয়ে উঠছে দেখে বখতিয়ারের পরামর্শে পুলিস বিভাগে নাম লেখায় সেলিনা, ছ' মাসের ট্রেনিং নিয়ে একদল মহিলা পুলিসের সঙ্গে রিজার্ভেই চাকরি নেয়। ওদের বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল রানা, পরে আরও দু'বার ওদের রিজার্ভে বেড়াতে এসে সেলিনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পায় ও।

বিয়ের দু'বছর পর নিহত হয় বখতিয়ার, একা হয়ে যায় সেলিনা।

কয়েক মাস ধরেই একদল পোচারের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছিল বখতিয়ার। দাঁত, চামড়া আর শিং-এর লোভে নৃশংসভাবে হাতি, সিংহ আর গণ্ডার মারছিল তারা। একদিন খবর এল রিজার্ভের নির্জন এক কোণে হাতি মেরে দাঁত কেটে নিচ্ছে পাঁচ-সাতজন লোক। জমিনে ছড়িয়ে থাকা স্থানীয় রেঞ্জারদের সঙ্গে রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ করার পর অস্টার প্লেন নিয়ে এলাকাটার উদ্দেশে রওনা হলো সে, ইচ্ছে আইভরি সহ হাতে-নাতে পোচারদের ধরবে।

নিচের বনভূমিতে চোখ বুলাতে এত মগ্ন ছিল বখতিয়ার যে প্রকাণ্ড শকুনটাকে দেখতেই পায়নি সে। হঠাৎ তীব্র দমকা বাতাসের মধ্যে পড়ে যাওয়ায় শকুনটাও বুঝতে পারেনি যে দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। বিস্ফোরিত একটা গ্রেনেডের মত তীব্র গতিতে প্রপেলারের সঙ্গে ধাক্কা লাগল, উইন্ডশীল্ড ঢাকা পড়ে গেল রক্ত আর পালকে। একটা মাত্র এঞ্জিন, দলা পাকানো শকুনের অবশিষ্ট জড়িয়ে যাওয়ায় অচল হয়ে পড়ল, খসে পড়ল একটা ডোবার কিনারায়, জমিনের সঙ্গে সংঘর্ষের মুহূর্তেই বিস্ফোরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বাঁচার কোন সুযোগই পায়নি বখতিয়ার।

খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় প্লেনটা নিয়ে রওনা হলো সেলিনা।

জমিনে ছড়িয়ে থাকা রেঞ্জাররা দেখতে পেল সেলিনার প্লেন থেকে পোচারদের দলের ওপর বোমা ফেলা হচ্ছে। ছুটল তারা, পৌঁছে গেল পোচারদের ক্যাম্পে। আক্ষরিক অর্থেই জান বাঁচাবার জন্যে রেঞ্জারদের কাছে ছুটে এসে আশ্রয় চাইল পোচাররা, মাথার ওপর ম্যানিয়াকটার হাত থেকে বাঁচার আর কোন উপায় তাদের ছিল না।

প্যালেস্টাইনে জন্ম হলেও, সেলিনাদের পরিবার অনেক দিন থেকে লন্ডনে বসবাস করে আসছিল। বখতিয়ার মারা যাবার পর আপনজনেরা তাকে লন্ডনে ফিরে যাবার প্রস্তাব দেয়। সেলিনা রাজি হয়নি। বন্ধু বখতিয়ারকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্যে রানাও তাকে ওর এজেন্সিতে চাকরি অফার করে। কিন্তু সেলিনা স্বাধীন থাকার সিদ্ধান্ত নেয়।

বীমা কোম্পানীর টাকা হাতে পাবার পর একটা সেকেন্ড হ্যান্ড বিভার প্লেন কেনে সে, কিস্তিতে। শুরু হলো তার নতুন পেশা, প্লেন চার্টার। স্বামী মারা যাবার পর নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছে সে, তবে তাকে অসুখী বলা যাবে না। বখতিয়ার নেই, ফলে তার শারীরিক চাহিদার যেন ইতি ঘটেছে। কারও সঙ্গে মেলামেশা করতে সঙ্কোচ বোধ করে না, তবে ঘনিষ্ঠ হয় না ভুলেও। ব্যতিক্রম শুধু রানা।

প্রয়োজনে যখনই তাকে ডেকেছে রানা, সব কাজ ফেলে ছুটে এসেছে নাসিম। সেই সূত্রেই জামিল, জাফর ও ফরহাদও তাকে চেনে।

রানা ও নাসিমের ঘনিষ্ঠতা ঠিক দুই পুরুষ বন্ধুর মত। বন্ধুর স্ত্রী, সেটা একটা

কারণ, আরও বড় কারণ নিজেকে নাসিমের কলুষিত হতে না দেয়ার অটল সিদ্ধান্ত—তার উপস্থিতিতে জৈব ক্ষুধা অনুভব করে না রানা। আর রানাকে নাসিম বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করে।

শিকারের গল্প বলা শেষ হতে রানা দেখল চোখ বুজে নাসিম যেন ঘুমাচ্ছে। উরু থেকে তার মাথাটা সাবধানে নামাতে চেষ্টা করছে, মিটিমিটি হাসল নাসিম।

জিজ্ঞেস করল, 'বললে না তো কেন এসেছ?'

পকেট থেকে চিরুনি বের করে নাসিমের চুল আঁচড়ে দিল রানা। 'আগে বলো, কি নিয়ে ঝামেলা বাধল?'

'ডেল নিকোলাস আমার কাছ থেকে টাকা পায়। জুয়ায় বসে হেরে গেছি।'

'জুয়া?'

'জানি রাগ করবে তুমি। নিজের ওপর আমারও কি কম রাগ হচ্ছে? তবে চিন্তা কোরো না, ওটাই ছিল প্রথম ও শেষ বার। আসলে পুরুষদের সব কাজই তো করে দেখেছি, ভাবলাম ওটাই বা বাকি থাকে কেন। স্বীকার করছি অন্যায় হয়ে গেছে, মাফ করে দাও।'

'কত টাকা?' জিজ্ঞেস করল রানা। অঙ্কটা শুনে গম্ভীর হয়ে গেল।

'চিন্তার কিছু নেই, ব্যাঙ্কে আরও বেশি আছে আমার। লেবানন থেকে পৌছুতে দেরি হচ্ছে এই যা।'

'নিকোলাস অত্যন্ত বাজে লোক,' বলল রানা। 'খেলায় চুরি করে সে। এত থাকতে তার ক্লাবে তুমি খেলতে গেলে!'

'বাজে লোক হলেও ক্লাবটা তার প্রথম শ্রেণীর, বাছা বাছা লোকেরা আসা-যাওয়া করে—শুধু মন্ত্রী-মিনিস্টার, পুলিস কমিশনার, এনজিও ডিরেক্টর আর নামকরা ব্যবসায়ীদের মেম্বারশিপ দেয়া হয়। যদি কোন কারচুপি হয়ও, কর্তৃপক্ষ চোখ ফিরিয়ে রাখে। এখানকার সমাজে সে একটা পিলার, রানা।'

'এ-সব পিলার ভেঙে ফেলা উচিত,' শান্ত সুরে বলল রানা।

'বাদ দাও, এ ঝামেলা আমি একাই মিটিয়ে ফেলতে পারব। এবার বলো, হঠাৎ তুমি কোত্থেকে এলে?'

'আমার একজন পাইলট দরকার, নাসিম।'

ঠোঁট ফোলাল সেলিনা। 'আর আমি ভেবেছি আমাকে অনেক দিন দেখোনি বলে ছুটে এসেছ। কিন্তু না, সেলিনা নয়। পাইলট দরকার···কোথায় যেতে হবে, রানা?'

সন্ধে হতে না হতে কেনডুরা ফাঁকা হয়ে গেছে, রাস্তার অবস্থা দেখে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ফরহাদের।

হোটেল থেকে বেরিয়ে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যেতে চান, স্যার?'

'এদিক ওদিক একটু ঘুরব, শহরটা দেখতে চাই।'

তোবড়ানো মার্সিডিজ নির্জন রাস্তা ধরে ছুটল। সবুজ রঙের মিলিটারি ভ্যান আর জীপ দেখা যাচ্ছে মাঝে মধ্যে, মেশিন পিস্তল বাগিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে বা বসে আছে সৈনিকরা। দু'একটা দরজার সামনে, আধো অন্ধকারের ভেতর, কয়েকজন তরুণকে দেখা গেল, কি যেন পরামর্শ করছে, অস্থির ও উত্তেজিত, বোধহয় লুঠপাট করার তালে

আছে। বেশিরভাগ দোকান পাটের সামনে লোহার জাল দেখা যাচ্ছে, দাঙ্গায় যাতে ক্ষতি না হয়। কোন অফিস বা দোকান খোলা নেই।

'লোকজন নেই কেন, কোথায় তারা?'

'সন্ধের পর লোকজন সব ঘরের ভেতর থাকে। শুধু খ্রিস্টান যুবকরা বেরোয়, লুঠপাট করার জন্যে।'

আরও তথ্য পাবার চেষ্টা করল ফরহাদ।

ড্রাইভার বলল, 'আমার টাকা দরকার, তাই জান হাতে করে বেরিয়েছি, স্যার। আমি একজন মুসলমান, ধরে নিয়েছি যে-কোন দিন মারা যাব।'

'মানুষ তাহলে এখানে বেঁচে আছে কি করে?'

'আমার মত অভাগা ছাড়া রাজধানীতে মুসলমান খুব কমই আছে, স্যার। যা রোজগার করি তার অর্ধেক পুলিসকে দিয়ে দিতে হয়, তা না হলে গ্রেফতার করবে। আর একবার গ্রেফতার হলে ছাড়া পাওয়া যায় না। মানুষ কিভাবে বেঁচে আছে? কেন, কুকুর-বিড়াল যেভাবে বেঁচে থাকে।'

বাঁক ঘুরল মার্সিডিজ। একদল সৈনিককে দেখা গেল। কাঁটাতারের উঁচু বেড়ার সামনে একটা জীপ দাঁড়িয়ে আছে, ওটার চারধারে কিলবিল করছে লোকগুলো। আঁতকে উঠল ড্রাইভার।

'কাঁটাতারের বেড়ার ভেতর ওটা কি?' জিজ্ঞেস করল ফরহাদ।

'কমান্ড পোস্ট,' বলল ড্রাইভার। 'প্রেসিডেন্ট বোগামুরার সিটি রেসিডেন্ট।' জানালার কাছ থেকে যতটা সম্ভব সরে বসল সে।

ব্রিটিশ আমলে তৈরি বিশাল একটা ম্যানসনকে বোগামুরার কমান্ড পোস্ট হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কাঁকর ছড়ানো চওড়া গাড়িপথের শেষ মাথায় ওটা, পথের মুখে প্রকাণ্ড লোহার গেট। প্রবেশপথের মুখে দুটা পিল-বক্স, সুরক্ষিত করা হয়েছে বালি ভর্তি বস্তার দুর্গ তৈরি করে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কোন খুঁত নেই। বালির বস্তার পিছনে দু'হাত পর পর একজন করে সৈনিক, হাতে সাব-মেশিনগান।

জীপটার পিছনে বসানো হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়ার তৈরি পুলমেট এসজিএম মেশিন গান, রাস্তার দিকে মুখ করে। জীপের চারপাশে দাঁড়ানো সৈনিকদের দেখে মনে হলো একঘেয়েমির শিকার, সবাই সিগারেট ফুঁকছে। তোবড়ানো মার্সিডিজের দিকে তাকাল তারা, তবে গুরুত্ব দিল না।

'মুক্তিদাতা বাড়িতে নেই,' ড্রাইভার বলল।

'কি করে বুঝলে?' জিজ্ঞেস করল ফরহাদ।

'প্রেসিডেন্ট থাকলে সৈনিকরা গেটের কাছে জটলা করত না। আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে সার্চও করা হত।'

'তোমাকে কি ওরা গ্রেফতারও করত?'

'সেটা সাধারণত ওদের খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর করে। গ্রেফতার করেই তিনমাসের ডিটেনশন দেয়া হয়। কিন্তু তিনমাস পর তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না, যদি সে মুসলমান হয়।'

'সেক্ষেত্রে তুমি এত বড় ঝুঁকি কেন নিলে?' জিজ্ঞেস করল ফরহাদ।

'বললাম না, আমার টাকার দরকার। তাছাড়া, সাহস পেয়েছি আপনি সাংবাদিক

বলে। বিদেশী সাংবাদিকদের সামনে ওরা সাধারণত কাউকে আটক করে না।'

গাড়ি এগিয়ে চলেছে, হাত তুলে এটা-সেটা দেখাচ্ছে ড্রাইভার। ইউনিভার্সিটি আর মাগুলা হসপিটালকে পাশ কাটাল ওরা। তারপর সামনে পড়ল আদালত ভবন, পুলিস ব্যারাক ও নিউজপেপার অফিস। সবশেষে পার্লামেন্ট বিল্ডিং। এগুলোর মাঝখানে একটা ভবন সবগুলোকে ছাড়িয়ে আকাশ ছুঁয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টার রাস্তার কিনারা থেকে মাথাচাড়া দিয়েছে কাঁচের তৈরি প্রকাণ্ড একটা সমুদ্রগামী লাইনার-এর মত। বিদেশী টাকা আর যুগোশ্লাভিয়ান লেবার ধার করে বানানো হয়েছে ওটা, কাজ প্রায় শেষ। আর ছয়দিন পর লুগাম্বায় শুরু হতে যাচ্ছে ওএইউ কনফারেন্স, ওই একই দিনে ভবনটার শুভ উদ্বোধন। সবাই জানে পরবর্তী বছরের জন্যে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বোগামুরা।

আরেকটা বিল্ডিং দেখে গা ছমছম করে উঠল ফরহাদের। ডিপার্টমেন্ট অভ স্টেট সিকিউরিটি হেডকোয়ার্টার, এটাও যুগোশ্লাভিয়ার শ্রমিকরা বানিয়েছে। উঁচু পাঁচিলের ভেতর বিল্ডিংটা, বোগামুরা লজ থেকে মাত্র একশো গজ দূরে। বোগামুরা লজ প্রেসিডেন্টের আরও একটা ঠিকানা। অসমর্থিত খবর হলো, দুটো ভবনের মাঝখানে গোপন টানেল আছে, লজে হামলা হলে বোগামুরা যাতে পালাতে পারেন। ডস হেডকোয়ার্টারের পাশের বাড়িটা এক সময়ে পিএলও-র অফিস ছিল, এখন সেটা ইসরায়েলি দূতাবাস।

হাতঘড়ি দেখল ফরহাদ। প্রায় একঘণ্টা হতে চলল ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। বুঝতে পারল, ড্রাইভার খুব নার্ভাস বোধ করছে। 'আর শুধু একটা জিনিস দেখার আছে,' বলল সে। 'মাবোরু।'

কাত হয়ে গেল গাড়ি, ফুটপাথের ধার ঘেঁষে গাড়ি থামাল ড্রাইভার। চেহারা দেখে মনে হলো বরফ হয়ে গেছে সে। 'আপনি স্যার পাগল হয়ে গেছেন! ওটার কাছে যাওয়া তো দূরের কথা, নামটাও আমরা কেউ উচ্চারণ করি না।'

আঠারোশো চল্লিশ সালে মাস্কাট-এর সুলতান জাঞ্জিবার দ্বীপ থেকে বার্বার আইভরি শিকারী ও ক্রীতদাস ব্যবসায়ী হাজি শাহাইনকে ধন-সম্পদ সংগ্রহের জন্যে পাঠান।

শাহাইন ছিলেন বীর ও দুঃসাহসী অভিযাত্রী, জলযান নিয়ে লেক ভিক্টোরিয়া অতিক্রম করেন, ঘাঁটি গাড়েন উত্তর-পশ্চিম তীরে। তাঁর এই ঘাঁটি থেকে চারদিকে হামলা চালানো হত, আইভরি আর ক্রীতদাস সংগ্রহের জন্যে।

বন্দী লোকজনের সংখ্যা এক সময় এত বেড়ে গেল যে ঘাঁটির চারপাশে রীতিমত একটা শহর গড়ে উঠল। ক্রীতদাসরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হলো, তৈরি হলো ওয়াচটাওয়ার, বন্দীশালা। স্থানীয় উপজাতীয়রা আপনজনদের ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে মাঝে মধ্যে বন্দীশালায় হামলা চালাত, ফলে প্রতিরক্ষা আরও শক্তিশালী করতে হলো শাহাইনকে। এক সময় বন্দীশালাটা হয়ে উঠল দুর্গম একটা দুর্গবিশেষ, পাঁচিলগুলো হলো আট ফুট চওড়া।

আইভরি হান্টারদের ধাওয়া খেয়ে প্রকাণ্ড এক বুল এলিফেন্ট পালাচ্ছিল, সেই হাতির পায়ের তলায় চাপা পড়ে মারা যান হাজি শাহাইন। বেওব্যব গাছের ছালে মুড়ে তাঁর ক্রন্দনরত শিষ্যরা লাশটা ওয়াচটাওয়ারে ফিরিয়ে আনে।

মৃত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বন্দী শিবিরের সবাইকে জবাই করে তারা। সব মিলিয়ে সে-সময় একশো ষাট জন বন্দী ছিল, তাদের মধ্যে যুবতী ছিল প্রায় অর্ধেক। এরপর লাশ নিয়ে ফিরে যায় তারা জাঞ্জিবারে, ওয়াচটাওয়ারটা থেকে যায় স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। উপজাতীয়দের গ্রাম, যেগুলো খালি করে ফেলেছিল শাহাইন, মরা লোকদের পাহাড় নামে পরিচিতি পায়।

এরপর আসে ইউরোপিয়ানরা। স্পিকি, গ্র্যান্ট আর বেকারস। তাদের সঙ্গে আসে পাদ্রীরা। এই পাদ্রীরাই ওয়াচটাওয়ারটাকে একটা মিশন বানায়, স্থানীয় উপজাতীয়দের ধর্মান্তরিত করার 'মহৎ' উদ্দেশ্য নিয়ে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, যুদ্ধবাজ জার্মানরা যখন দাপট দেখাতে শুরু করেছে, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন ওয়াচটাওয়ার দখল করে নিয়ে সৈন্যদের জন্যে ব্যারাক হিসেবে ব্যবহার শুরু করে। শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ অফিসাররা পাদ্রীদের ওপর খুব অসন্তুষ্ট হলো, কারণ এতদিনেও তারা স্থানীয় উপজাতীয়দের সবাইকে খ্রিস্টান বানাতে পারেনি। অফিসাররা সৈনিকদের নির্দেশ দিল, 'শালাদের ধরে এনে যীশুর মন্ত্রে দীক্ষা দাও।' অর্থাৎ আবার ওয়াচটাওয়ারটা বন্দী শালায় পরিণত হলো।

ওদিকে ধীরে ধীরে কেনডুরা শহরটা গড়ে উঠছিল, শহরের কাছে ভিক্টোরিয়া লেকের কিনারায় কারাগারটা এক সময় একটা প্রয়োজন হয়ে দেখা দেয়। বাবা সালাহউদ্দিনের আমলে মাবোরু কারাগারে রাজনৈতিক বন্দী খুব কমই ছিল, বিশেষ করে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নেতা বা কর্মীদের কাউকেই তিনি জেলে ভরেননি। মাবোরু নরক হয়ে উঠল জোসেফ বোগামুরার আমলে। বন্দীদের ভিড়ে কারাগার উপচে পড়ছে, এ-কথা বলা যাবে না। বিদেশী সাংবাদিকদের ডেকে প্রায়ই দেখানো হয় কারাগারে বন্দীর সংখ্যা বিশ-পঁচিশজনের বেশি নয়। বোগামুরা খুব চালাকির সঙ্গে বন্দীর সংখ্যা কমিয়ে ফেলেন। তাঁর নির্দেশে সন্দেহজনক লোককে গ্রেফতার করতে কোন মানা নেই, তবে গ্রেফতার কৃত লোকটি মুসলমান হলে তাকে ছেড়ে দেয়া নিষেধ, কাজেই দায়িত্ব প্রাপ্ত মেজর কাগলি বিশ-পঁচিশজন বন্দীকে কারাগারে রেখে বাকি সবাইকে নিয়মিত প্রতিদিন মেরে ফেলার ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছে।

মাবোরুর দিকে তাকিয়ে থাকার সময় ফরহাদের গা শিরশির করে উঠল। কেনডুরা থেকে গাড়ি নিয়ে উত্তরে চলে এসেছে ওরা, হাইওয়ে ধরে, তারপর লেকের দিকে বাঁক নিয়েছে। আর কোন দিকে না ঘুরে সোজা মেইন গেটের দিকে চলে এসেছে রাস্তাটা। আকাশে চাঁদ আছে, মেঘ থেকে বেরিয়ে এলে ধূসর রঙের দীর্ঘ পাঁচিল দেখা যায়, আরও দূরে লেকের উত্তর পাড়।

বাঁক ঘোরার পর এক মাইল এগিয়ে আর সাহস পায়নি ড্রাইভার, ফরহাদকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেছে। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল লোকটা, ফরহাদ তাকে বাধা দেয়নি।

পথটার দু'পাশে ঘন ঝোপ-ঝাড়, একপাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে ফরহাদ, বোঝার চেষ্টা করছে সদ্য চলে যাওয়া মার্সিডিজের আওয়াজ শুনে কেউ এগিয়ে আসছে কিনা। তার চারপাশে স্থির হয়ে আছে ঘন গাছপালা। গা ছমছমে ভৌতিক পরিবেশ।

বাইরের দিকের পাঁচিল ত্রিশ ফুট উঁচু, প্রতিটি কোণে একটা করে গার্ড টাওয়ার। কারাগারে প্রবেশপথটা পুব দিকের পাঁচিলে, খিলান আকৃতির। খিলানের নিচে ভারি

কাঠের দরজা। প্রবেশপথের মাথায় দাঁড়িয়ে রাস্তাটা অনেকদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পায় সেন্ট্রিরা। প্রতিটি গার্ড টাওয়ারে আলোর আভা দেখা যাচ্ছে। ফরহাদ জানে, প্রতিটি টাওয়ারে সার্চ লাইট আছে, গোটা কমপাউন্ড কাভার করে।

বাইরের দিকে পাঁচিলে কোন জানালা নেই, ভেতরে ঢোকার একমাত্র উপায় মেইন গেট। হতাশ বোধ করছে ফরহাদ। ওদের অপারেশন সফল হবার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই। যা দেখার দেখে নিয়েছে সে। ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়েছিল, সেভাবেই ফিরে এল হাইওয়েতে। এখান থেকে কেনডুরা বা হোটেল দু'মাইলের পথ।

যেখানে সম্ভব হলো অলিগলি ধরে এগোল ফরহাদ। ভাগ্য ভাল যে ডস বা সাসু টহল দলের সামনে একবারও তাকে পড়তে হলো না, গাড়ি আসছে দেখলেই তাড়াতাড়ি কোথাও গা ঢাকা দিল সে।

হোটেলের কাছাকাছি চলে এসেছে, এই সময় ফরহাদ বুঝতে পারল পিছনে লোক লেগেছে। ভয় পায়নি, বরং কৌতূহল হচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে একবারও তাকাল না, তবে পিছনের অস্পষ্ট পদশব্দ কান পেতে শুনছে। ভাবল, লোক বোধহয় একজন নয়, আরও একজন থাকার কথা। দ্বিতীয় লোকটা সম্ভবত সামনের বাঁকে অপেক্ষা করছে।

দেখা গেল, সব মিলিয়ে তিনজন ওরা।

তিনজনই তরুণ, কাপড়চোপড়ের বাহার আর নাদুসনুদুস চেহারা দেখে বোঝা গেল খেয়ে-পরে সুখেই আছে তারা। একটা গলি থেকে বেরিয়ে এল দু'জন, পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এগিয়ে আসছে। ফরহাদ শুনতে পেল পিছনের লোকটাও কাছে চলে এসেছে, তার হাঁপানোর আওয়াজ পাচ্ছে সে। সামনের দু'জনের হাতে অস্ত্র রয়েছে, একটা করে লোহার রড।

মনে মনে দূরত্বের একটা হিসাব করে নিয়ে ঝট করে পাঁচিলে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ফরহাদ। যতটা সম্ভব কম জায়গা দিতে চায় প্রতিপক্ষকে। একই সময়ে প্রতিপক্ষদের সবাইকে দেখতেও চায়।

কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা, খুঁটিয়ে লক্ষ করছে ফরহাদকে। দামী পোশাক আর হাতঘড়ি দেখে আন্দাজ পাবার চেষ্টা করছে সঙ্গে কি পরিমাণ টাকা আছে। যে ছেলেটা অনুসরণ করে এসেছে তার হাতে একটা ছুরি বেরিয়ে এল, ফলাটা সরু ও লম্বা। ডান হাতে ধরে আছে, ফলার গোড়ায় বুড়ো আঙুল।

পিছনে পাঁচিল, ফরহাদ আত্মরক্ষার ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পা দুটো সামান্য ভাঁজ করা, হাতের কনুই পাঁজরের কাছে, শক্ত হয়ে আছে মুঠো। এই ভঙ্গিতে পাথরের মত নিরেট সে, যে-কোন দিক থেকেই হামলা হোক, সবই হজম করতে পারবে।

ছুরিটা ছুটে এল নিচে দিয়ে, অত্যন্ত দ্রুত বেগে। ফরহাদের বাম হাতের বাহু ঝুলে পড়ে ঠেকিয়ে দিল আক্রমণটা, হামলাকারীর হাতটা ফিরিয়ে দিয়ে শরীরটা মেলে দিল টার্গেট হিসেবে। একই সঙ্গে ছেলেটার পাঁজরে ডান হাত দিয়ে একটা ঘুসি মেরেছে ও। পিছন দিকে ছিটকে পড়ল প্রতিপক্ষ, হাত থেকে ছুটে গেল ছুরি।

আবার আগের ভঙ্গি নিয়ে অপেক্ষা করছে ফরহাদ। বাকি ছেলে দুটোর দিকে

তাকিয়ে হাসছে সে।

ওরা দু'জন একসঙ্গে এগিয়ে এল, হাতের রড দুটো সবেগে ঘোরাচ্ছে। ফরহাদের পিছিয়ে যাবার কথা, অন্তত সেরকমই আশা করেছে ওরা। কিন্তু ফরহাদ হামলা করল। তার হাঁটু উঁচু হলো, জুতোর তলা আঘাত করল বাম দিকের ছেলেটাকে, তার হাঁটুর মালাইচাকি স্থানচ্যুত হলো। আর্তনাদ করে উঠে হাতের রড ছেড়ে দিল ছোকরা। তৃতীয় প্রতিপক্ষ এত দ্রুত সামনে চলে আসছিল, চেষ্টা করেও ঝোঁকটা সামলাতে পারল না, হাতের রড ফরহাদের মাথার পাশ ঘেঁষে আঘাত করল পাঁচিলে। তাল হারিয়ে ফেলে অরক্ষিত হয়ে পড়ল সে, কনুই দিয়ে তার পেটে প্রচণ্ড এক গুঁতো মারল ফরহাদ। সিধে হলো সে, ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলল, শিথিল করে দিচ্ছে পেশী। পঙ্গু তিনজনের দিকে ঘৃণাভরে তাকাল সে।

ওদের ভাগ্যই বলতে হবে, একজনকেও খুন করেনি ফরহাদ।

অকুস্থল থেকে দ্রুত সরে আসছে সে, ছায়া ছেড়ে আলোয় বেরুচ্ছে না একবারও।

ছয়

সেদিন সন্ধ্যায় পেট ব্যথা শুরু হলো।

প্রথমে আনিস সিদ্দিকী ধারণা করলেন ব্যাপারটা বদহজম। কিন্তু ব্যথাটা ধীরে ধীরে বাড়ছে, সামনের দিকে ঝুঁকলে বেশি কষ্ট হয়। সেলের কোণে বালতির ভেতর বমি করলেন তিনি, হাতের ভাঁজে রাইফেল নিয়ে দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে গার্ড, চেহারায় সহানুভূতির লেশমাত্র নেই।

সেলের ভেতর দুর্গন্ধ পাগল করে দেয়ার মত। প্রচণ্ড ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছেন আনিস সিদ্দিকী, বমি করার সময় মনে হলো পেশীগুলো ছিঁড়ে যাবে এবার। দরদর করে ঘামছেন তিনি।

যেন অনন্তকাল পরে কোন রকমে দাঁড়ালেন, ভাবছেন ফুড পয়জনিং হলে বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে হবে তাঁকে। বিছানা বলতে নোংরা একটা কম্বল, সেটার ওপর নেতিয়ে পড়লেন তিনি, অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছেন। প্যাসেজে বুটের শব্দ হচ্ছে। একটু পর ধরাধরি করে তোলা হলো তাঁকে, সেল থেকে বের করে আনা হলো, কিছুই তিনি জানতে পারলেন না।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে কালো ও হলুদ রঙের একটা বেল জেট রেঞ্জার হেলিকপ্টারে চড়লেন স্যার পল ওয়েনডেল, সঙ্গে মেজর গেভিন লয়াল। দু'জনের পরনেই সামরিক উর্দি, ফলে দরদর করে ঘামছেন। হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই রাত দুপুরে ঘুম থেকে তুলে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডাকছেন। কোথায়? না, জিমবুতে।

জিমবু হলো বোগামুরার গ্রামের বাড়ি, রাজধানী থেকে দেড়শো মাইল দূরে।

'আমি সাব্বির,' পরিচয় দিল পাইলট। 'আর সঙ্গের উজবুকটা কর্পোরাল মিনসার। আপনারা আরাম করে বসুন।'

মেজর লয়াল কৌতূহলী হলো। মুসলমানদের নাকি মেরে সাফ করে ফেলা হয়েছে? তাহলে সরকারী কপ্টারের পাইলট একজন মুসলমান হয় কি করে?

উত্তরে সাব্বির দোনাভিচ জানাল, 'আমি আলবেনিয়ান, এখনও বেঁচে থাকার সেটা একটা কারণ। আরও একটা কারণ, ওদের দক্ষ পাইলট নেই, আমাকে ওদের দরকার।'

ক্রুদের অপর সীটটায় বসে আছে কর্পো. মিনসার, সারা শরীরে অস্ত্র বোঝাই। হিপ হোলস্টারে রয়েছে ভারি একটা অটোমেটিক, কোমরে খাপের ভেতর ম্যাশেটি; হাতে কালাশনিকভ অটোমেটিক রাইফেল। তাকে দেখিয়ে সাব্বির আবার বলল, 'ও এখানে আপনাদের নিরাপত্তার দিকটা দেখার জন্যে আছে। কিরে, শুয়োরের বাচ্চা, ঠিক বলেছি না?' আরোহীদের দিকে ফিরে হাসল সে। 'বুঝতেই পারছেন, ব্যাটা ইংরেজি বোঝে না।'

ওয়েনডেল আর লয়ালের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো।

দু'হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ছে হেলিকপ্টার। উত্তর দিকের একটা নদী ধরে এগোল কিছুক্ষণ, তারপর ঘুরে গিয়ে অনুর্বর সমতলভূমির মাথায় চলে এল, নিচে শুধু কাঁটা-ঝোপ আর আঁকাবাঁকা রেখার মত শুকনো নদী। ইতিমধ্যে ভোর হয়েছে, পুব আকাশ রক্তের মত লাল হয়ে উঠল।

অনেকক্ষণ ধরে একা একাই কথা বলে যাচ্ছে সাব্বির—তার কোন পিছুটান নেই, আকাশকে সে ভালবাসে, সামরিক জান্তা তার দু'চোখের বিষ। তারপর সে জানাল, 'প্রায় পৌঁছে গেছি আমরা। সিগারেট নিভিয়ে ফেলুন, সেফটি বেল্ট বাঁধুন।'

তার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল লয়াল। শুকনো একটা উপত্যকার উপর রয়েছে ওরা। সামনে দুটো পাহাড় মাথাচাড়া দিয়েছে একজোড়া স্তনের আকৃতি নিয়ে, সেগুলোর মাঝখানে কয়েকটা কুঁড়েঘর দেখতে পেল সে। আরও নিচে নামতে ঘরগুলো থেকে লোকজন বেরিয়ে এল। আশপাশে গরু-ছাগল চরছে।

হেলিকপ্টার থেকে নামলেন ওয়েনডেল, পিছনে লয়াল। মেজর কাগলি অপেক্ষা করছিল, এগিয়ে এসে একটা হাত বাড়িয়ে দিল। 'গুড মর্নিং, জেনারেল। হিজ এক্সেলেন্সী আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।' কিছু শোনার অপেক্ষায় না থেকে ঘুরে দাঁড়াল সে, বাধ্য হয়ে তার পিছু নিলেন ওয়েনডেল ও লয়াল।

গ্রামের লোকজন সবাই খুব দুস্থ। পুরুষরা গম্ভীর, মেয়েরা হাড্ডিসার, শিশুরা উলঙ্গ। চারদিকে কুকুর আর মুরগী ছুটোছুটি করছে। গ্রামের সব লোকজন বিদেশী মেহমানদের পিছু নিল। একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা, গ্রামের আর সব ঘরের চেয়ে এটা একটু বড়। দরজাটা খুব নিচু, ঢোকার সময় কুঁজো হতে হলো। ভেতরটা অন্ধকার, মানুষের ঘাম আর ছাগলের গন্ধ ধাক্কা মারল নাকে। ভেতরে পা দিতেই হোঁচট খেলো মেজর লয়াল, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে; তার গায়ে পা বেধে যাওয়ায় একই অবস্থা হলো জেনারেল ওয়েনডেলেরও। মর্যাদা ইত্যাদি সব ধুলোয় লুটাচ্ছে।

অমসৃণ দেয়াল, গায়ে ছোট ছোট ফুটো আছে, সেই ফুটো দিয়ে যতটা সম্ভব আলো ঢুকছে ঘরের ভেতর। পশুর চামড়া বিছানো একটা টুলে বসে আছেন জোসেফ বোগামুরা, আবছা আলোয় কোন রকমে ঠাহর করা গেল। তাঁর মাথায় একটা মুকুট. অস্ট্রিচ পাখির পালক দিয়ে তৈরি। সিংহের দাঁত দিয়ে বানানো একটা কণ্ঠহার পরে আছেন, হারের নিচের দিকটা তাঁর চর্বিসর্বস্ব থলথলে পেটের মোটা ভাঁজে হারিয়ে গেছে। পিছনে বিশাল এক সিংহের চামড়া ঝুলছে। পিছনেই, দু'পাশে, দাঁড়িয়ে রয়েছে

আর্মি ফেটিগ পরা দু'জন বডিগার্ড, সারা শরীর অস্ত্রে বোঝাই।

মেজর কাগলি বোগামুরার পাশে দাঁড়াল।

বোগামুরার চকচকে কালো চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। প্রায় উলঙ্গই বলা যায় তাঁকে, পরনের কৌপিন শুধু উরুসন্ধি কোনরকমে ঢাকতে পেরেছে। 'ওয়েলকাম, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস্!' হুঙ্কার ছাড়লেন তিনি। 'কত বছর পর আবার আপনাদের দেখার সৌভাগ্য হলো আমার।'

'ইট ইজ আ গ্রেট অনার, এক্সেলেন্সী,' বিড়বিড় করে বললেন স্যার ওয়েনডেল।

'দুঃখিত, রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকায় এয়ারপোর্টে আমি থাকতে পারিনি,' বললেন বোগামুরা। 'আপনাদের খাতির-যত্নে কোন খুঁত নেই তো?'

'না, সবাই খুব খেয়াল রাখছেন।'

খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করল মেজর লয়াল।

স্যার ওয়েনডেল বললেন, 'সবাই আমরা জানি, এক্সেলেন্সী, আমি আর মেজর লয়াল কেন এখানে এসেছি। আপনি অনুমতি দিলে প্রসঙ্গটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি আমরা। আমার সঙ্গে একটা চিঠি আছে…।'

'চোপ! একদম চোপ!' গর্জে উঠলেন বোগামুরা। 'কিসের আলোচনা? কে আপনাকে কথা বলার অনুমতি দিল? পল ওয়েনডেল, আপনি এখন আর আমার কমান্ডিং অফিসার নন। নাকি ভুলে গেছেন কথাটা? এখানে আপনি এসেছেন আমার দয়ায়। কথাটা ভুলবেন না।'

স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকলেন ওয়েনডেল। লয়ালও পাথর হয়ে গেছে।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার, তারপরই হাসতে শুরু করলেন বোগামুরা। 'কেনডুরা থেকে এতটা পথ এলেন, আপনাদের রিফ্রেশমেন্ট দরকার। আমার হেলিকপ্টারটা কেমন দেখলেন, জেনারেল? চমৎকার না? ইটালি সরকার আমাকে ওটা দান করেছে।'

'ও।'

'আসুন, এগিয়ে আসুন, বসুন এখানটায়। ওসব ফরমালিটি বাদ দিন, আমরা পুরানো কমরেড। বসুন, বসুন।'

কিন্তু কোথায় বসবেন ওয়েনডেল? ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে কয়েক সেকেন্ড লেগে গেল, ওঁদেরকে মেঝেতে বসতে বলা হচ্ছে। অগত্যা তাই বসতে হলো।

হাততালি দিলেন বোগামুরা। কাপ-পিরিচের আওয়াজ পাওয়া গেল, দরজা দিয়ে কুঁজো হয়ে রোগা-পাতলা এক লোক ঢুকল ঘরের ভেতর, তার হাত ধরা ট্রেটা কাঁপছে। ট্রেতে চীনামাটির টিপট, তিনটে কাপ, পিরিচ, চিনি ভর্তি পেয়ালা ইত্যাদি রয়েছে। উবু হয়ে বসে থাকা মেহমানদের পাশ কাটিয়ে এগোল লোকটা, বোগামুরার সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়াল, হুকুমের অপেক্ষায় রয়েছে।

লোকটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মেজর লয়াল। ছায়া থেকে লোকটার মুখ আলোয় আসতেই সে শুনতে পেল স্যার ওয়েনডেল সশব্দে দম আটকালেন। ওদের স্তম্ভিত বিস্ময় দারুণ উপভোগ করছেন বোগামুরা।

আনিস সিদ্দিকীর মাথা নত হয়ে আছে, তাঁর হাত দুটো এখনও থরথর করে কাঁপছে, প্রাণপণ চেষ্টা করছেন ট্রেটা যাতে হাত থেকে পড়ে না যায়। তাঁর পা ও গা খালি, মুখে রঙ মাখানো হয়েছে।

'গড ইন হেভেন!' বোগামুরার দিকে ফিরে ফিসফিস করলেন স্যার ওয়েনডেল। 'এর মানে কি, এক্সেলেন্সী?'

'আমার নতুন হাউস-বয়,' হাসতে হাসতে বললেন বোগামুরা। 'এখনও আনাড়ি, তবে খুব তাড়াতাড়ি আমি শিখিয়ে-পড়িয়ে নেব। অনুমতি দিন, আপনাদের চা পরিবেশন করি··· ।'

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন স্যার ওয়েনডেল। 'আমি এর প্রতিবাদ করছি! এ ঘোরতর অন্যায়! হার ম্যাজেস্টি সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি···এখানে স্বাভাবিক মানবিকতা লঙ্ঘিত হয়েছে··· ।'

'হ্যাঁ। আপনি ক'চামচ চিনি নেন, জেনারেল?' জানতে চাইলেন বোগামুরা।

আনিস সিদ্দিকীর চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই, চোখ দেখে মনে হলো তিনি যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছেন, সম্ভবত নেশা হয় এমন কিছু খাওয়ানো হয়েছে তাঁকে।

'মি. প্রেসিডেন্ট, আমি এই অমানবিক ও অপমানকর আচরণের প্রতিবাদ করছি···,' একই কথা বারবার বলছেন ওয়েনডেল, প্রচণ্ড রাগে তাঁর মাথা কাজ করছে না।

ওয়েনডেলকে ধরে আবার বসিয়ে দিল মেজর লয়াল। ফিসফিস করল তাঁর কানে, 'আমাদের উচিত হিজ এক্সেলেন্সী কি বলেন মন দিয়ে শোনা, স্যার। হাজার হোক, আমরা তাঁর অতিথি।'

ওয়েনডেলের দু'চোখ থেকে আগুন ঝরছে। তবে তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'হ্যাঁ, তা ঠিক, তা ঠিক। মাফ করবেন, স্যার। আমার উত্তেজিত হয়ে ওঠা উচিত হয়নি।'

বোগামুরা একটা আঙুল নাড়লেন। টলতে টলতে একপাশে সরে, মেহমানদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন আনিস সিদ্দিকী। এরপর নিজের হাতে মেহমানদের চা পরিবেশন করলেন প্রেসিডেন্ট। বললেন, 'আপনারা প্রমাণ পেলেন, মি. সিদ্দিকী সুস্থ ও সবল শরীরে দিব্যি বেঁচে আছেন। নিজেদের চোখেই তো দেখলেন, তিনি আমাদের একজন হয়ে উঠেছেন। সেই সঙ্গে প্রমাণ হয়ে গেল ব্রিটিশ প্রেস আমাদের সম্পর্কে যে-সব কথা রটাচ্ছে তার সবই মিথ্যে। জিজ্ঞেস করে দেখুন, আমরা তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি কিনা।'

'মি. সিদ্দিকী,' বললেন ওয়েনডেল। 'আপনি কি জানেন এখানে কেন এসেছি আমরা?' ইঙ্গিতে মেজর লয়ালকে দেখালেন তিনি।

কোন উত্তর এল না।

'মি. সিদ্দিকী, আমি জেনারেল পল ওয়েনডেল, আর আমার সঙ্গে ইনি মেজর লয়াল। আমরা এখানে আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি। আমি জানতে চাই, আপনি ভাল আছেন কিনা।'

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন আনিস সিদ্দিকী, যেন ওয়েনডেলের কথা বুঝতে পারছেন না। তারপর তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'ওরা আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছে। আমার সেল পরিষ্কার, খাবারদাবার ভাল।'

'শুনলেন তো!' হেসে উঠলেন বোগামুরা।

ওয়েনডেল বললেন, 'মি. সিদ্দিকীর সঙ্গে আমি একা কথা বলতে চাই।'

'তা সম্ভব নয়,' বললেন বোগামুরা।

'কেন?'

'আমি বলছি, তাই।'

অনেক কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখলেন ওয়েনডেল। একটা আঙুল নাড়লেন বোগামুরা, ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আনিস সিদ্দিকী।

'আপনি বললেও, স্যার, মি. সিদ্দিকীর শরীর-স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হতে পারলাম না,' নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ওয়েনডেল। 'তাঁকে আমার দুর্বল ও দিশেহারা বলে মনে হলো।'

বোগামুরা কাঁধ ঝাঁকালেন। 'জেলে রাখা হয়েছে তাঁকে, রেস্ট হাউসে নয়। এখনও যে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, এই-ই তো বেশি।'

'তারমানে সত্যি আপনারা এখনও তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চান?'

'অবশ্যই।' বোগামুরা হাসছেন। 'আইন তো আর ভাঙতে পারি না। ভাল কথা, রাজকীয় নিমন্ত্রণে আমি উপস্থিত থাকতে পারব না, তবে রানীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে একটা চিঠি লিখেছি, ছেলে-মেয়েকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছি—চিঠিটা আপনাদের মাধ্যমে পাঠাতে চাই আমি।'

কিছুই বুঝতে পারলেন না ওয়েনডেল, তাকালেন এইডের দিকে।

মেজর লয়াল বলল, 'আমি নিশ্চিত, হার ম্যাজেস্টি আপনার অসুবিধে উপলব্ধি করবেন।' তার যতটুকু মনে আছে, রাজ-পরিবারের বিবাহ অনুষ্ঠানে যাদেরকে আমন্ত্রণ করা হবে তাদের তালিকায় জুলিয়াস বোগামুরার নাম ছিল, তবে পরে নামটা বাদ দেয়া হয়। এ-খবর শুনে বোগামুরা ঘোষণা করেছিলেন নিমন্ত্রণ না পেলেও অনুষ্ঠানে হাজির হবেন তিনি। এর আগে কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে দু'শো সহকারীকে নিয়ে হাজির হবার কথা ঘোষণা করেছিলেন তিনি, বলেছিলেন কারও অনুমতির তোয়াক্কা না করে তাঁর নিজস্ব ৭০৭ প্লেন লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করবে। যদিও সম্মেলন শুরু হবার একদিন আগে শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে তিনি তাঁর সফর বাতিল করেন।

'সিদ্দিকীর ব্যাপারটা ভালয় ভালয় শেষ হলে,' বলে চলেছেন বোগামুরা, 'রাষ্ট্রীয় সফরে আমি একবার ইংল্যান্ডে যাব। লন্ডনের রাস্তায় শোভাযাত্রা করব, আমার পাশে থাকবেন রানী। আমরা অনেক বিষয়ে আলাপ করব তখন।'

'রানী একটা চিঠি পাঠিয়েছেন, স্যার,' বললেন ওয়েনডেল। লয়ালের হাত থেকে চিঠিটা নিলেন তিনি, বাড়িয়ে দিলেন বোগামুরার দিকে।

'জানি এতে কি লেখা আছে,' বললেন বোগামুরা। 'আনিস সিদ্দিকীর প্রাণভিক্ষা চাওয়া হয়েছে।' এনভেলাপ খুলে চিঠিটা তিনি পড়লেন, তারপর সেটা ওয়েনডেলের নাকের সামনে বার কয়েক দোলালেন। 'এতে লুগাম্বার সঙ্গে ইংল্যান্ডের সুসম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। দিস ইজ আ ভেরি ফাইন সেন্টিমেন্ট। ব্যাপারটা নিয়ে আমি চিন্তা করব। কি সিদ্ধান্ত হয় পরে আপনারা জানতে পারবেন।' দাঁড়ালেন তিনি, বডিগার্ডরা দ্রুত পাশে চলে এল। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মেজর কাগলি। 'এখানেই আরাম করুন, বন্ধুরা। খাবার ও পানীয় সব পৌঁছে যাবে। যদি বলেন, ভাল দেখে একটা মেয়েকে পাঠিয়ে দিতে বলি। সময় কাটাতে সাহায্য করবে।'

ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছেন ওয়েনডেল।

'লোকটা পাগল,' বোগামুরা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বিড়বিড় করল মেজর লয়াল।

'এখন আমাদের কি করা উচিত, স্যার?'

'কিছুই করার নেই,' বললেন ওয়েনডেল, আঙুল দিয়ে কপাল টিপে ধরলেন। 'আমরা শুধু আনিস সিদ্দিকীর জন্যে প্রার্থনা করতে পারি।'

বোগামুরার ভিলার পিছনের বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে বসে আছেন সের্গেই বেকভ, মেজর কাগলি আর বডিগার্ডদের নিয়ে সেখানে উদয় হলেন প্রেসিডেন্ট। সের্গেই বেকভ লুগাম্বায় সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছেন, পঞ্চাশের মত বয়েস, কিয়েভ ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় বক্সিং-এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় বহু কাজে তাঁর পরামর্শ নেন বোগামুরা। বোগামুরার উপদেষ্টাই বলা যায় তাঁকে।

'আপনি ওদের কি বললেন, মি. প্রেসিডেন্ট?'

'অপেক্ষা করতে বলেছি।'

'চিঠিটা কি আমি একবার দেখতে পারি?' হাত বাড়ালেন বেকভ। পড়ার পর বললেন, 'কথার মালা , সারবস্তু বলতে কিছুই নেই। এ-সব ফাঁকা বুলি কি আপনার সিদ্ধান্তে কোন প্রভাব ফেলতে পারবে? চিঠিতে স্পেয়ার পার্টস-এর কথা উল্লেখই করা হয়নি, মিথ্যে প্রচার-প্রচারণা বন্ধ করার কোন প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি। না, আপনার কোন শর্তই ব্রিটিশ সরকার মেনে নেয়নি। আমি তো আপনাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন বোগামুরা, তারপর জানতে চাইলেন, 'আমি তাহলে এখন কি করব?'

একটা হাত তুললেন বেকভ। 'এক্সেলেন্সী, সে-কথা আমার বলা সাজে না। সিদ্ধান্তটা আপনার একার হতে হবে। তবে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আপনাকে ভাবতে হবে। নতুন কল-কারখানা আর বাড়ি-ঘর তৈরি করার জন্যে আমার সরকার তিন মাস আগে কি ঋণ দেয়ার কথা বলেনি? সম্প্রতি মিগ ফাইটার দিয়ে আমরা কি বন্ধুত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইনি? আপনাদের পাইলটদের ট্রেনিং শেষ হলে ইস্ট আফ্রিকায় এক শুধু লুগাম্বারই থাকবে অত্যাধুনিক অপারেশনাল স্কোয়াড্রন। আর ঠিক এই মুহূর্তে আপনার জন্যে নতুন ব্যাটল ট্যাংক খালাস করা হচ্ছে মোম্বাসা বন্দরে…।'

'ওই ট্যাংকগুলো সত্যি আমার দরকার। ধন্যবাদ, মি. অ্যামব্যাসাডর। ওগুলো পৌছুলে তাঞ্জানিয়া আক্রমণের জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি পেয়ে যাব আমি। বলুন, মি. অ্যামব্যাসাডর, ওগুলো আমি কবে নাগাদ দেখতে পাব?'

'কাল সন্ধের মধ্যে, প্রতিশ্রুতি অনুসারে কেনিয়া সরকার যদি ক্লিয়ার প্যাসেজ দিতে অস্বীকার না করে।'

সরু হয়ে গেল বোগামুরার চোখ। 'কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট খুব ভাল করেই জানেন যে আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালে তাঁর কপালে খারাবি আছে।'

'আপনার উদ্বিগ্ন হবার কোনই কারণ নেই,' আশ্বাস দিয়ে বললেন বেকভ। সোভিয়েত সরকার প্রেসিডেন্ট নাই-এর ওপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করছে। ট্যাংকগুলো সময় মতই পৌছে যাবে, আপনি নিশ্চিত থাকুন।'

লেদার চেয়ারে হেলান দিয়ে ডেস্কের ওপর পা তুলে দিল ডেল নিকোলাস। সুমো

কুস্তিগীরের মত শরীর তার, মাথায় মরচে রঙের চুল, গোঁফ জোড়া হিটলারী কায়দায় ছাটা। ক্রীম কালারের কার্ডিন সুট পরে আছে সে, দুই কব্জিতে সোনার ব্রেসলেট। সফল একজন ব্যবসায়ী সে, তার ক্লাবে শুধু ধনী লোকজন সদস্য হতে পারে। লোক হিসেবেও সে খুব বিপজ্জনক। তার ক্লাবের সঙ্গে রেস্তোরাঁ, ক্যাসিনো ও ড্যান্স ফ্লোর আছে—ড্যান্স ফ্লোরে মেয়েদের নগ্ন নৃত্যও হয়।

ক্রোম আর গ্লাস দিয়ে সাজানো অফিসটা; একদিকের দেয়ালে বার, অপরদিকে স্টেরিও ইকুইপমেন্ট ও ভিডিও স্ক্রীন দেখা যাচ্ছে। চালু করা হলে স্ক্রীনে গোটা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ইঞ্চি দেখা যায়, এমনকি গেস্টরুমের ভেতর কে কি করছে তা-ও দেখার সুযোগ আছে।

ডেস্কের সামনে দাঁড়ানো মেয়েটা খুবই সুন্দরী, বয়েস হবে সতেরো কি আঠারো। নিকোলাস বলল, 'ঠিক আছে, দেখা যাক কাপড়ের নিচে কেমন তুমি।'

নীল ঠাণ্ডা চোখে নিকোলাসের দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা। 'এখানে?' সে জানে চাকরির ইন্টারভিউয়ে পাস করতে হলে মালিকের মনোরঞ্জন করতে হবে।

'অসুবিধে কি?' হাসল নিকোলাস।

বিশ মিনিট পর দু'জনকে সোফায় দেখা গেল। মেয়েটার ওপর চড়াও হয়ে হাপরের মত হাঁপাচ্ছে নিকোলাস। এই সময় ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে রিসিভার তুলল সে, কথা না বলে অপরপ্রান্তের বক্তব্য শুনল, তারপর চিৎকার করে বলল, 'না! ঘাড় ধরে বের করে দাও!' রিসিভারটা ঝনাৎ করে নামিয়ে রাখল সে।

দু'মিনিট পর হাঁপাতে হাঁপাতে মেয়েটা জানতে চাইল, 'আমি কি পাস করেছি?'

তাকে ছেড়ে সিধে হলো নিকোলাস, কাপড় পরছে।

হঠাৎ খুলে গেল দরজা, ভেতরে ঢুকল রানা। ওর পিছনে জামিল, বেরির ঘাড় ধরে আছে।

রাগে গর্জে উঠল নিকোলাস। 'হোয়াট ইজ দিস?'

'আমি মাসুদ রানা, আর আমার সঙ্গে এ হাসান জামিল,' বলল রানা। 'মেয়েটাকে বের করে দাও।'

তাড়াতাড়ি কাপড় পরে ছুটে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল মেয়েটা। বেরির ঘাড়ে একটা ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দিল জামিল, হোঁচট খেতে খেতে নিকোলাসের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। তার দিকে কটমট করে তাকাল নিকোলাস, বলল, 'বেরি, তোমাকে না আমি বললাম ওদেরকে বের করে দাও?'

'চেষ্টা করেছিল,' বলল রানা, 'কিন্তু সফল হয়নি।'

ঘাড়টা ডলছে বেরি।

এতক্ষণে ব্যাপারটা ধরতে পারল নিকোলাস। 'ও, তুমিই সেই লোক, নাসিমের বন্ধু, বেরি আর রডনির সঙ্গে লেগেছিলে?' ডেস্কের পিছনে বসল সে।

'সাবধান!' বলল রানা, পা দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। 'দেরাজে হাত দেবে না, নিকোলাস। বিপদ হতে পারে।'

হাত দুটো ডেস্কের ওপর রাখল নিকোলাস। 'তোমরা তাহলে আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ?'

'ভুল করছ,' বলল রানা। 'আমরা তোমার পাওনা টাকা দিতে এসেছি।'

ধীরে ধীরে জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরছে বেরি।

'হাত নামাও, বেরি,' বলল জামিল। 'এক চুল নড়বে না।'

'টাকা দিতে এসেছ?' হঠাৎ হেসে উঠল নিকোলাস। 'শুনলে, বেরি? দেখা যাচ্ছে মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো উচিত নয়।' রানার দিকে তাকাল সে। 'নাসিমের কাছ থেকে ছ'হাজার ডলার পাব আমি, তারপর সুদ···।'

'ছ'হাজার পাবে, কোন সুদ দেয়া হচ্ছে না।' আগেই গোনা ছিল, পকেট থেকে নোটগুলো বের করে ডেস্কের ওপর ছুঁড়ে দিল রানা। সেদিকে হাত বাড়াতে যাবে নিকোলাস, বাধা দিল ও, 'একটা কথা। তুমি বা তোমার লোকজন যদি ভবিষ্যতে কখনও নাসিমকে বিরক্ত করো, তোমার খোঁজে আসব আমি। কি বলছি বুঝতে পারছ তো?'

'পরিষ্কার,' জবাব দিল নিকোলাস, তার চোখ দুটো রাগে জ্বলছে।

'গুড। তুমি কি বলো, বেরি?'

দ্রুত ও ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল বেরি। রানা ও জামিল কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে দরজার দিকে থুথু ফেলল সে, 'বাস্টার্ডস!'

'চলে যাবার পর গাল দিচ্ছ?' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল নিকোলাস।

'হৈ-হাঙ্গামা হলে ক্লাবের সুনাম নষ্ট হবে, তাই কিছু বলিনি,' উত্তর দিল বেরি। 'আমি জানি, আপনার কাছ থেকে বুদ্ধি নিয়ে ওদেরকে আমরা ঠিকই শায়েস্তা করতে পারব।'

'শেষ যে মেয়েটাকে পাঠিয়েছিলে তার নামটা আমার জানা হয়নি,' বলল নিকোলাস। 'নাম ও ঠিকানা যোগাড় করে আনো। আর রডনিকে খবর দাও, সে যেন এখুনি আমার সঙ্গে দেখা করে। তুমিও তার সঙ্গে আসবে। ওরা আমাকে হুমকি দিয়ে যাবে, এ আমি সহ্য করব না। আমার একটা সুনাম আছে।'

দুপুরে আবার হাজির হলেন বোগামুরা। 'আহ, জেনারেল ওয়েনডেল, আশা করি সময়টা উপভোগ করেছেন। দেরি হলো বলে দুঃখিত। আসলে বিবেকের সঙ্গে কথা বলছিলাম।'

'আমি আমার সরকারের কাছে কি উত্তর নিয়ে যাব, মি. প্রেসিডেন্ট?' গরমে দরদর করে ঘামছেন স্যার ওয়েনডেল।

'রানীকে আপনি বলবেন যে তাঁর চিঠি পেয়ে আমি খুশি হয়েছি। আর আপনাদের প্রধানমন্ত্রীকে জানাবেন যে আনিস সিদ্দিকীকে দেয়া মৃত্যুদণ্ড বাতিল করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। চারদিন পর ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে হবে তাঁকে।'

সাত

দ্বিতীয় দিনটা কেনডুরার পথে পথে ঘুরে কাটিয়ে দিল ফরহাদ, শহরটাকে চিনে নিচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল না যে এক সময় লুগাম্বাকে বলা হত পার্ল অভ আফ্রিকা। এমনকি কেনডুরা রোডেও, রাজধানীর প্রধান সড়কে, দোকান-পাট সব খালিই বলা যায়। বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান-পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, এখনও সরানো হয়নি

র্জনার স্তূপ। প্রতি পাঁচটা দোকানের মধ্যে একটা অক্ষত দেখা গেল, সেগুলোর প্রতি রটের মধ্যে একটায় যৎসামান্য কিছু পণ্য আছে—কয়েক জোড়া প্লাস্টিকের জুতো, টিনে ভরা খাবারদাবার বা বুটপালিশের কৌটো। ফুটপাথে অবশ্য কিছু হকারকে দেখা গল, এটা-সেটা বিক্রি করছে।

লুগাম্বা জ্বালানি সঙ্কটে ভুগলেও রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা কম নয়, অবশ্য বেশিরভাগই সামরিক ভ্যান। প্রাইভেট কারগুলো সম্ভবত ডস ও সাসুর লোকজন ব্যবহার করছে।

হাসপাতাল, ইউনিভার্সিটি ও সদ্য তৈরি কনফারেন্স সেন্টার পেরিয়ে এল ফরহাদ। দেশের মানুষ খেতে পাচ্ছে না, অর্থনীতি রসাতলে যাচ্ছে, তারপরও এত টাকা খরচ করে কনফারেন্স সেন্টার তৈরি করার কি দরকার ছিল, বোধগম্য হলো না তার।

কনফারেন্স সেন্টার ছাড়িয়ে, পুলিস ব্যারাকের সামনে, বড় একটা এলাকা জুড়ে প্যারেড গ্রাউন্ড। জায়গাটা কর্ডন করে রাখা হয়েছে। ট্রাফিকের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠছে হাতুড়ি আর করাতের শব্দ। কি ঘটছে দেখার জন্যে থামল ফরহাদ। দেখল শ্রমিকরা একটা গ্র্যান্ডস্ট্যান্ড তৈরি করছে। এক কোণে অনেকগুলো ট্রাক দেখা গেল, পেছনে ফোল্ডিং চেয়ার ভর্তি। সে ধারণা করল ওএইউ কনফারেন্স উদ্বোধন উপলক্ষে এখানে সম্ভবত কোন অনুষ্ঠান হবে, তারই আয়োজন চলছে। হয়তো বিশাল জনসভা ডেকে বিদেশী মেহমানদের কাছে নিজের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন বোগামুরা, তৃতীয় বিশ্বের যা দস্তুর। কিন্তু না, জনসভা করার ইচ্ছে থাকলে এত সামরিক ভ্যান কেন আনা হবে? তারপর সে বুঝতে পারল, এখানে সামরিক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হচ্ছে। ট্যাংক, কামান, আর্মারড কার, অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান ইত্যাদি দেখানো হবে। আরেক পাশে দেখা গেল দ্বিতীয় মঞ্চটা। প্রথমটা আকারে বড়, ওখানে সম্ভবত ডেলিগেটেরা আসন গ্রহণ করবেন। আর দ্বিতীয়টায় থাকবেন বোগামুরা, মার্চ পাস্টে স্যালুট গ্রহণ করবেন।

গোটা ব্যাপারটায় আনিস সিদ্দিকীর ভূমিকা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারল ফরহাদ। বোগামুরা যদি ব্রিটিশ সরকারকে তাঁর শর্ত মেনে নিতে বাধ্য করতে পারেন, ওএইউ সদস্যরা বিনা দ্বিধায় আগামী বছরের জন্যে তাঁকে চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করবেন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, ব্রিটেন যদি নতি স্বীকার না করে, কিভাবে মুখরক্ষা করবেন বোগামুরা? ফলাফল হবে ভয়াবহ, কল্পনা করতেও ভয় লাগে।

চিন্তিত ফরহাদ হোটেলে ফিরে এল। রিসেপশনিস্ট একটা মেসেজ দিল তাকে। চাবি নিয়ে নিজের কামরায় চলে এল সে। রানার পাঠানো টেলিগ্রাম। রবার্ট পিল জানিয়েছে, অপারেশন শুরু করা যেতে পারে।

নিজের জিনিস-পত্র সব গোছগাছ করে নিল ফরহাদ। পরবর্তী পর্যায় হলো হাসপাতাল তথা এতিমখানায় রানা ও বাকি সবার সঙ্গে মিলিত হওয়া। দুর্গম বনভূমির ভেতর দিয়ে ত্রিশ মাইল পথ, অথচ তার কোন বাহন নেই। তারমানে একটা গাড়ি হাইজ্যাক করতে হবে। হোটেলের কার পার্কে গাড়ির অবশ্য অভাব নেই। কারও চোখে ধরা না পড়লেই হয়।

ছাইরঙা কর্ড জিনস আর টার্টল নেক সোয়েটার পরল ফরহাদ। তার বাকি সব কাপড় অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে হোল্ডঅলে ভরল, কিছু ভুলে গেল কিনা দেখার জন্যে

সার্চ করল কামরা ও বাথরুম। সাবধানের মার নেই, দরজার নবে 'ডু নট ডিসটার্ব' লিখে একটা কাগজ ঝোলাল। দরজা বন্ধ করে খুলে ফেলল একটা জানালা।

তার কামরাটা দোতলায়, হোটেলের পিছন দিকে। প্রথমে হোল্ডঅলটা নিচে ফেলে দিল সে। জানালার কার্নিশে হাত রেখে ঝুলে পড়ল, ঝপ করে নামল নরম মাটিতে। উবু হয়ে বসে থাকার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে আছে, কয়েক সেকেন্ড নড়ল না। চারদিক প্রায় অন্ধকার, কাছাকাছি থেকে কোন শব্দ আসছে না। হোল্ডঅলটা হাতে নিয়ে সিধে হলো সে। পাঁচিল ঘেঁষে এগোল কার পার্কের দিকে।

কার পার্কে সব মিলিয়ে গাড়ি রয়েছে আটটা। চারটে টয়োটা, একটা পুজো, ভাঙাচোরা একটা করে হোন্ডা ও নিশান, একটা তোবড়ানো ফোক্সওয়াগন। ভাগ্যই বলতে হবে, আশপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। প্রথম গাড়িটার দিকে এগোবে, এই সময় হেডলাইটের আলো পড়ল কার পার্কে, তারপর এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল। পিছিয়ে এসে অন্ধকারে গা ঢাকা দিল ফরহাদ।

গাঢ় রঙের একটা রেঞ্জ রোভার এসে থামল। দেখেই পছন্দ হয়ে গেল তার, এটাই তাকে নিতে হবে। গাড়িটা ঝকঝক করছে, একেবারে নতুন, সম্ভবত ডস ভেহিকেল। তারপর লক্ষ করল, ড্রাইভার গাড়িটা দাঁড় করিয়েছে তেরছাভাবে—এ যেন তার দক্ষতার অভাব। হেডলাইট নিভে গেল, দরজা খুলে নিচে নামল ড্রাইভার। লোকটা টলছে। তারমানে মাতাল। সে একা নয়, তার সঙ্গিনীও টলতে টলতে নেমে এসে ড্রাইভারকে ধরে তাল সামলাল, খিলখিল করে হাসছে। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে হোটেলের দিকে এগোল তারা। দু'বার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার উপক্রম করল মেয়েটা, মাতাল সঙ্গী আবার তাকে সিধে হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

ওপরের উনি আমাকে পছন্দ করেন, ওদেরকে চলে যেতে দেখে ভাবল ফরহাদ। ড্রাইভার এমনকি রেঞ্জ রোভারে তালাও দেয়নি। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল সে। এঞ্জিনের বনেট খুলে কারিগরি ফলিয়ে স্টার্ট দিতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগল তার।

অন্ধকার শহরের ভেতর দিয়ে গাড়ি ছোটাবার সময় ভয়ে ও আশঙ্কায় বুকটা দুরুদুরু করছে ফরহাদের। শহর থেকে না বেরুনো পর্যন্ত স্বস্তি নেই। রাস্তায় কোথাও দাঁড় করানো না হলে ত্রিশ মাইল যেতে খুব বেশি সময় নেবে না রেঞ্জ রোভার। আচ্ছা, হঠাৎ যদি থামানো হয় ওকে, জেরার উত্তরে কি বলবে সে? সঙ্গে কাগজ-পত্র আছে, সাংবাদিক বলে পরিচয় দেয়া যাবে। তবে এটা যদি ডস ভেহিকেল হয়, রোডব্লকে ওকে থামানো না-ও হতে পারে।

দেখা যাক না কি হয়। তবে হাসপাতালে রানার আগে পৌছুতে হবে তাকে অন্তত মাঝরাতের আগে। রানা যাতে দলবল নিয়ে নিরাপদে পৌছুতে পারে, তার আয়োজন করতে হবে তাকে। ডাক্তার ভদ্রলোককে সব কথা খুলে বলতে সময়ও লাগবে।

অদ্ভুত এক মানুষ এই ডাক্তার। পঁয়ষট্টি বছর বয়েস, অথচ দেখে মনে হবে এখনও চল্লিশ পেরোননি। মানুষ চিনতে ওরা যদি ভুল না করে থাকে, লুগাম্বায় অন্তত একজন লোক এখনও বেঁচে আছেন যিনি বোগামুরা বা তাঁর সৈনিকদের এতটুকু ভয় পান না—তিনি হলেন ড. ওসমান গনি। যুবা বয়েসে পালেস্টাইনে আহত সৈনিকদের সেবা করেছেন তিনি, পেশার স্থান হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল।

ড. ওসমান গনি মাসামবাবুলে একটা হাসপাতাল চালান, তাঁর হাসপাতালে ছ'জন নার্সের সবাই এতিমখানা থেকে এসেছে। হাসপাতালের সঙ্গেই ওটা, তিনিই ওটার প্রতিষ্ঠাতা। ইতিহাস নিলে জানা যাবে বোগামুরা ক্ষমতায় আসার পর মুসলমান যে-সব দম্পতিকে মেরে ফেলা হয়েছে তাদেরই মেয়েগুলোকে এতিমখামায় তুলে এনেছেন ড. গনি। শুধু আশ্রয় ও খাবারই নয়, মেয়েগুলোকে তিনি কারিগরি শিক্ষাও দান করছেন। হাসপাতাল ও এতিমখানার সঙ্গেই একটা টেকনিক্যাল স্কুল চালাচ্ছেন তিনি।

ফরহাদ ভাবল, হঠাৎ রাতের অন্ধকার থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে দেখলে কি ভাববেন ড. গনি। তারপর যখন শুনবেন কি চায় সে, কি চায় ওরা, কেমন হবে ভদ্রলোকের প্রতিক্রিয়া? অনেক দিন হলো ওদের কারও সঙ্গেই তাঁর দেখা হয়নি। তবে ওদেরকে যে তিনি ভুলে যাননি, সে-ব্যাপারে ফরহাদ নিশ্চিত।

ওই একই রাতে কেনিয়ান-লুগাম্বান সীমান্ত পেরুল তারিক মবুতু। কালো একটা মাজদা জীপ চালাচ্ছে সে, কাদা মাখিয়ে নেয়ায় দূর থেকে সহজে চেনার উপায় নেই। প্রাচীন গেম ট্রেইল ব্যবহার করায় দু'দেশেরই বর্ডার পেট্রল এড়িয়ে যেতে পেরেছে সে। ট্রেইলটা এককালে আইভরি পোচাররা ব্যবহার করত, লুগাম্বান গেম পার্কে আসা-যাওয়ার সময়। বোগামুরা ক্ষমতায় আসার পর অবহেলায় নষ্ট হয়ে গেছে পার্কগুলো। প্রাণভয়ে পালিয়ে যায় স্টাফরা, অভয়ারণ্যের প্রাণীকূলকে রক্ষা করার জন্যে কেউ ছিল না। ফল হয়েছে এই যে দশ হাজার হাতির মধ্যে টিকে আছে মাত্র কয়েকশো। পোচাররা এখন নজর দিয়েছে লুগোপা নদীর দিকে, কুমিরের চামড়া ছাড়াচ্ছে তারা।

মবুতু আশা করছে রাত শেষ হবার আগেই রাজধানী কেনডুরায় পৌঁছে যাবে সে। পথে বোগামুরার পেট্রল থাকবে, সন্দেহ নেই, তবে মেইন হাইওয়ে ধরে যাবে না সে।

আঁকাবাঁকা ও উঁচু-নিচু মেঠোপথে স্পীড বাড়ানো উচিত হচ্ছে না, জানে মবুতু, বিশেষ করে এই পথে আগে কখনও আসেনি যখন; তবু ঝুঁকিটা তার না নিয়েও উপায় নেই। ভোরের আলো ফোটার আগেই রাজধানীতে পৌঁছুতে হবে তার।

এরপর যা ঘটল, সেজন্যে নিজেকেই দায়ী করল মবুতু। ঘন ঘন বাঁক নিয়ে ঢালু হয়ে নেমে গেছে পথটা। হেডলাইট জ্বলছে, তা সত্ত্বেও সামনের বাঁকটা হিসাবে ভুল করে ফেলল। একপাশের উঁচু পাড়ে বাড়ি খেলো জীপ, তারপরই চাকাগুলো এমন পিছলাতে শুরু করল যেন বরফের ওপর পড়েছে। দ্রুত স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার চেষ্টা করল সে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো বিপদ কেটে যাচ্ছে, কিন্তু তারপরই নাক বরাবর সামনে দেখতে পেল বোল্ডারটা। পথের ওপর আড়াআড়ি হয়ে গেল জীপ, সেই অবস্থায় বোল্ডারের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটল। ছিটকে পড়ল গাড়ি, পথের কিনারা থেকে সোজা একটা গর্তের ভেতর, সেখান থেকে ড্রামের মত গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে খাদের তলায়।

খাদটা মাত্র পনেরো ফুট গভীর, তাসত্ত্বেও মবুতুর মনে হলো অনন্তকাল ধরে নেমে যাচ্ছে সে। প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে স্থির হলো গাড়ি, চার চাকায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তবে ফ্রন্ট আক্সেল পচা বৃক্ষশাখার মত মট করে ভেঙে গেছে, আওয়াজ পেয়েছে সে। ড্যাশবোর্ডের সঙ্গে বার কয়েক ঠুকে গেছে তার কপাল, মাথার ভেতর কিসের যেন শব্দ হচ্ছে একটানা। ফেটে যাওয়া রেডিয়েটর থেকেও হিসহিস শব্দ বেরুচ্ছে। তারপর আর

কিছু মনে নেই তার।

নিজেকে হালকা করার প্রয়োজন আরও যদি পাঁচ মিনিট আগে অনুভব করত কর্পোরাল আব্রাহাম লুকু, তার ভবিষ্যৎ যথেষ্ট দীর্ঘায়িত হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তার ব্লাডার ফেটে যাবার অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে, তারপর সঙ্গী প্রাইভেট ডানিয়েল নাফতাকে সমস্যাটার কথা জানাল। ঢালু রাস্তা, খানা-খন্দে ভরা, গাড়ি থামতেই লাফ দিয়ে নিচে নেমে ঝোপের দিকে ছুটল লুকু, ট্রাউজারের চেইন খুলছে। স্বস্তির একটা আওয়াজ ছেড়ে ঝোপঝাড়ের ওপর পানি ছিটাতে শুরু করল সে।

ল্যান্ড রোভারে বসে আঙুল মটকাচ্ছে প্রাইভেট নাফতা, লুকুর দেরি হচ্ছে দেখে মনে মনে বিরক্ত। তাড়াতাড়ি ব্যারাকে ফিরতে চায় সে, পাঁচ-সাতটা বিয়ারের ক্যান নিয়ে সোজা চলে যাবে কাছাকাছি কোন গ্রামে, সুন্দরী দেখে একটা মেয়ে বাছবে, রাত কাটাবে তার সঙ্গে। আপনমনে হাসল নাফতা। ইউনিফর্ম পরা সৈনিক দেখলেই মেয়েগুলোর স্বামী বা বাপ-ভাইরা যা বোঝার বুঝে নেয়, চোখ রাঙিয়ে সাবধান করে দেয় বাড়ির বউ, বোন বা ঝিকে—প্রতিবাদ আপত্তি কোরো না, যা বলে শোনো। নাফতার অবশ্য বউ পছন্দ নয়, চোদ্দ বছরের কুমারীদের ওপরই তার দুর্বলতা। আগে মুসলমান পরিবারের মেয়েগুলোর দিকে তাকানোই যেত না, ছোঁয়া তো দূরের কথা; বোগামুরা ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতি একেবারে উল্টে গেছে।

এই এলাকায় গত কয়েক মাসে অন্তত দশ-বারোবার টহল দিয়েছে ওরা, কিছুই চোখে পড়েনি।

আরামবোধ করছে লুকু, চেইন টেনে তৈরি হচ্ছে গাড়িতে ফেরার জন্যে।

অন্ধকার থেকে মাথাচাড়া দিল মবুতু ঠিক একটা কেউটের মত মাত্র তিন গজ দূরে, গুলি করল সরাসরি লুকুর মাথায়। লুকুর নাকের পাশে ঢুকল বুলেটটা, মুখের একটা পাশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, হাড় আর মাংসের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল অন্ধকার বাতাসে। কাপড়ের তৈরি তোবড়ানো পুতুলের মত ভেঙেচুরে গেল কর্পোরালের শরীর, ঝোপের ভেতর পড়ে গেল।

চোখের পলক ফেলারও সময় পেল না নাফতা, দেখল একটা অটোমেটিকের মাজল ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অস্ত্রটার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে ভূতের মত লাগছে। কপালটা রক্তাক্ত, কাপড়চোপড়ে ধুলো। মাথার ওপর হাত তুলে ল্যান্ড রোভার থেকে নামার সময় সঙ্গীর লাশ দেখতে পেল নাফতা, আতঙ্কে ফোঁপাতে শুরু করল সে।

মবুতু ভাবছে, অদ্ভুত শব্দটা কিসের? তারপর বুঝতে পারল—তার সামনে দাঁড়ানো লোকটার দু'সারি দাঁত পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে। সরাসরি নাফতার পেটে অটোমেটিক তাক করল সে। 'কাপড়চোপড় খুলে ফেলো সব,' নির্দেশ দিল সে।

বিস্ফারিত হয়ে গেল নাফতার চোখ।

'জলদি!' ঘেউ ঘেউ করে উঠল মবুতু। 'এখুনি!' তার হাতের অস্ত্র এক চুল নড়ছে না।

নাফতা যেন একটা বাঁদর, কাপড় খুলতে গিয়ে নাচানাচি শুরু করল। ইউনিফর্মটা খুলে ল্যান্ড রোভারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকল সে, ঠকঠক করে কাঁপছে।

'এবার তুমি আমার দিকে পিছন ফিরে বসো, মাটিতে মাথা ঠেকাও।'

ইতস্তত করছে নাফতা।

'কি বললাম!' গর্জে উঠল মবুতু।

পিছন ফিরল নাফতা, বসল, সামনের দিকে মাটিতে কপাল ঠেকাল। এগিয়ে এসে তার খুলির পিছনে মাজল ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনে নিল মবুতু।

নিজের কাপড়চোপড় খুলে ইউনিফর্মটা তাড়াতাড়ি পরে নিল সে, পরিত্যক্ত বসন ছুঁড়ে দিল ল্যান্ড রোভারে। অন্ধকারের ভেতর ছুটে ঝোপের ভেতর ঢুকল, ফিরে এল লুকিয়ে রাখা ইকুইপমেন্টগুলো নিয়ে। লাফ দিয়ে ল্যান্ড রোভারে চড়ে বসল সে, গিয়ার এনগেজ করে ক্লাচ ছাড়ল।

পশ্চিম দিকে রওনা হলো ল্যান্ড রোভার।

অস্ত্রগুলো জার্মানে তৈরি হেকলার অ্যাণ্ড কোচ এমপিফাইভ, ছাব্বিশ ইঞ্চি লম্বা, ওজন ছ'পাউন্ড। ত্রিশ বা পনেরো রাউন্ড ম্যাগাজিন ভরা যায়। দেখে খুশি হলো রানা, ও ভেবেছিল গোনজালেস ওদেরকে আমেরিকান ইনগ্রাম গছিয়ে দেবে।

অস্ত্র ও প্যাকগুলো হ্যাঙ্গারের বেঞ্চে পড়ে রয়েছে। চীফটানটাকে বের করে অ্যাপ্রন-এ নিয়ে যাওয়া হয়েছে, শেষবারের মত চেক করে দেখে নিচ্ছে নাসিম।

গোনজালেস চারটে ব্রাউনিং পিস্তলও পাঠিয়েছে, সাইলেন্সার সহ, চেম্বারে তেরোটা গুলি ভরা যায়। সঙ্গে আছে দু'ফলা ছুরি, আর চারটে ম্যাশেটি। এছাড়া রয়েছে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, ডিটোনেটর, টাইমার, স্পেয়ার ম্যাগাজিন ও গ্রেনেড।

শটগানও আছে। টুয়েল্ভ বোর, রেমিংটন পাম্প অ্যাকশন, ব্যারেল প্রায় হ্যান্ডগ্রিপ পর্যন্ত কাটা।

'মাশাল্লা!' উদ্ভাসিত হয়ে উঠল জামিলের চেহারা। 'আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারি।'

'এত সব নিয়ে যেতে পারব, মাসুদ ভাই?' জিজ্ঞেস করল জাফর। 'ওজন বেশি হয়ে যাবে না?'

'একেকজন একেকটা বেছে নাও,' বলল রানা। 'রেমিংটন অথবা এইচ অ্যান্ড কে। যেগুলো লাগবে না ফেরত নেবে গোনজালেস। সে আমাদের জন্যে ক্যামোফ্লেজ সুটও পাঠিয়েছে, কাপড় ছেড়ে এখানেই সব পরে নেব আমরা। ভুলেও কারও সঙ্গে যেন আইডি থেকে না যায়। ওগুলো নাসিমের হাতে দাও, সে লুকিয়ে রাখবে কোথাও।'

তাড়াতাড়ি ক্যামোফ্লেজ সুট পরে প্যাক চারটের ইকুইপমেন্ট নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল ওরা। জাফর আর জামিল হেকলার অ্যান্ড কোচ পছন্দ করল, ফরহাদের জন্যে নিল রেমিংটন। রানা নিল শটগান, নিজের প্যাকের পাশে রেখে দিল। চীফটানের কাছ থেকে ফিরে এল নাসিম।

'কোন সমস্যা?' জিজ্ঞেস করল রানা, জানে কোন সমস্যা হবে না।

'সব ঠিক আছে। ফুয়েল ভরা হয়েছে, টাওয়ারকে ফ্লাইট প্ল্যানও জানিয়ে দিয়েছি।'

'গন্তব্যের কথা কি বললে?'

'কারাঙ্গা, হু-র ফিল্ড রিসার্চ স্টেশন। কেনিয়া সীমান্ত থেকে পনেরো মাইল

এদিকে। ওদেরকে প্রায়ই আমি কুরিয়ার সার্ভিস দিই, ভাগ্য ভাল যে এবার একটা মেসেজ পাঠিয়ে আমাকে ওরা ডেকেছে—অ্যানালাইজ করার জন্যে নাইরোবিতে কিছু নমুনা আনতে হবে। কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারবে না। আমাকে শুধু একটু ঘুরপথে যেতে হবে, এই যা। তোমাদেরকে আমি মাসামবাবুলে নামিয়ে দিয়ে ফেরার পথে কারাঙ্গা হয়ে আসব।'

ড্রপ সম্পর্কে জানতে চাইল রানা।

নাসিম প্রথমে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল। লুগাম্বান সীমান্ত রক্ষীরা বেরিয়ে যাবার পথে লোকজনকে বাধা দেয়, ঢোকার পথে নয়। এয়ার পেট্রলের কোন অস্তিত্ব নেই। লুগাম্বা এয়ার ফোর্সের বেশির ভাগ প্লেন স্পেয়ার পার্টসের অভাবে অচল হয়ে পড়ে আছে, আর মিগ পাইলটরা এখনও অনভিজ্ঞ। বিশেষ করে রাতে তারা আকাশে উঠবে না। সবশেষে নাসিম বলল, 'তাছাড়া, আমি খুব নিচ দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাব তোমাদের, রাডারে কিছু ধরা পড়ার আগেই নাগালের বাইরে চলে যাবে চীফটান।'

'সেক্ষেত্রে,' বলল রানা, 'আমরা তৈরি।'

যে যার অস্ত্র আর প্যাক তুলে নিয়ে নাসিমের পিছু পিছু চীফটানে উঠল। নাসিমের সঙ্গে বসল রানা, জামিল আর জাফর বসল কেবিনে। হেড মাইকের মাধ্যমে টাওয়ারের সঙ্গে কথা বলল নাসিম, অনুরোধ করল ক্লিয়ার‍্যান্স দাও। কয়েক মিনিট পর টারমাক ধরে ছুটল চীফটান।

ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, এখন আর সেটা ফিরিয়ে আনার কোন উপায় নেই। আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, অপারেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত রবার্ট পিল ওদের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ করতে পারবে না। লুগাম্বার কোথায় ওরা যাচ্ছে তা তাকে জানানোই হয়নি।

সার্জেন্ট জোসেফ নিকলি উদ্বেগে ছটফট করছে। তার দু'জন লোকের বর্ডার পেট্রল থেকে ফিরে আসার সময় পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ হলো। কর্পোরাল লুকু আর প্রাইভেট নাফতার ফিল্ড বেসে রিপোর্ট করার কথা দু'ঘণ্টা আগে, অথচ শেষবার রেডিওতে যোগাযোগ করেছে চার ঘণ্টা হতে চলল। শেষ মেসেজে বলেছে, রুটিন পেট্রলে রয়েছে ওরা। তাহলে এত দেরি হবার কি কারণ? বিপদে পড়লে কি করতে হবে দু'জনেই ওরা জানে। সঙ্গে সঙ্গে রিইনফোর্সমেন্ট চেয়ে পাঠাতে হবে। কিন্তু আর কোন কল আসেনি। এমন হতে পারে, ভাবল নিকলি, অ্যাক্সিডেন্ট করেছে ওরা, নষ্ট হয়ে গেছে রেডিও।

কিংবা…আরও খারাপ কিছু ঘটেছে।

তার লোকজন সময় মত না ফিরে এলে কোম্পানী কমান্ডারকে রিপোর্ট করতে হবে। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, ঘটনাচক্রে তার কোম্পানী কমান্ডার প্রেসিডেন্ট বোগামুরার খালাতো ভাই। তার সামনে দাঁড়াতে ভয় লাগছে নিকলির, কারণ জানে রিপোর্ট করতে গেলে লোক দু'জনের ভাগ্য নিয়ে আলোচনা হবে না, আলোচনা হবে একটা সামরিক যান হারানো নিয়ে—ওদের ল্যান্ড রোভারটা নিয়ে।

কি করা উচিত ঠিক করে ফেলল নিকলি। কর্পোরাল মেকানাকিকে ডেকে পাঠাল সে। একজন ট্রুপারকে নিয়ে রওনা হয়ে যাক মেকানাকি। যে পথ ধরে পেট্রলের ফেরার

কথা সেই পথ ধরে এগোতে থাকুক। কিছু দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে রেডিও মেসেজ পাঠাবে।

আট

মাসামবাবুলে ড. ওসমান গনির প্রতিষ্ঠানের কাঠামো ইংরেজি ইউ অক্ষরের আদলে তৈরি। গোড়ার দিকে অফিস আর রিসেপশন রুম। বাম বাহুতে এতিমখানা ও স্টাফদের বাসস্থান। ডান বাহুতে ইমার্জেন্সী ওয়ার্ড, জেনারেল ওয়ার্ড ও কেবিন। ডান দিকেই আরও একটা বড় কাঠামো আছে, বিশাল এক দোচালা—এক ভাগে মসজিদ, অপর ভাগে টেকনিক্যাল স্কুলের ক্লাস বসে।

এয়ারস্ট্রিপটা পিছন দিকে। এয়ারস্ট্রিপ বলতে এক মাইল লম্বা শক্ত ও সমতল মাটি, পুব-পশ্চিমে বিস্তৃত। ড. গনির সেবাশ্রম ও এয়ারস্ট্রিপ সমতল জমিনের ওপর হলেও, উত্তর দিকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে একটা গভীর খাদে, এককালে ওই খাদ মভলা নদীর শাখা ছিল।

ড. গনি রোগীর দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছেন। এই মুহূর্তে তাঁর রোগী একজন উপজাতীয় খ্রিস্টান যুবক, থরথর করে কাঁপছে। সেবাশ্রমের পিছন থেকে জেনারেটরের মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন ভেসে আসছে। এগজামিনেশন টেবিলের ওপর আলোটা বার কয়েক মিটমিট করে স্থির হলো, ড. গনি রোগীর দিকে ঝুঁকে বললেন, 'এ তুমি নিজের পাপে ভুগছ, মাইকেল। ব্যাটা লোফার, কতবার বলেছি মদ খাওয়া ছাড়! বুঝি না তোদের পিছনে আমিই বা কেন এত সময় নষ্ট করি! আহ্, সিস্টার তসলিমা, শক্ত করে ধরো ওকে। এই ব্যাটা, তোর কান্নাকাটি থামা, তা না হলে আমি কিন্তু লাত মেরে অ্যানেসথেশিয়ার কাজ সারব।'

ঠোঁপ চেপে গম্ভীর হলো সিস্টার তসলিমা। নরম হাত দিয়ে মাইকেল আবিল-এর হাড়সর্বস্ব কাঁধ দুটো চেপে ধরল সে। আবিল শুধু একা নয়, উপজাতীয় খ্রিস্টান যুবকদের প্রায় সবারই এই রোগ, অতিরিক্ত মদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়া, নয়তো কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসা। এ-ধরনের রোগী দেখলেই গালাগালি শুরু করেন ড. গনি, তবে তাদের কাছ থেকে ফি বা ওষুধের পয়সা কিছুই নেন না।

অ্যান্টিসেপটিকের বোতল কাত করে হাতের তুলো ভিজিয়ে নিলেন ড. গনি, তারপর সেটা রোগীর বাহুতে চেপে ধরলেন। গুঙিয়ে উঠল আবিল।

ক্ষতটা কনুইয়ের ভেতর থেকে কব্জি পর্যন্ত লম্বা। খুব একটা গভীর না হলেও চামড়ার সঙ্গে বেশ খানিকটা মাংস গায়েব হয়ে গেছে। রক্ত ঝরছে এখনও।

চোখে পানি, ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে থাকল আবিল। তুলোটা বিন-এ ফেলে দিয়ে টেবিল থেকে হাইপডারমিক সিরিঞ্জটা তুলে নিলেন তিনি। আবিলের মনে হলো, সিরিঞ্জ নয়, ওটা একটা তরোয়াল, তাকে জবাই করা হবে। যতই গালাগালি করুন, লোকাল অ্যানেসথেটিক পুশ করার সময় গভীর মনোযোগ দিতে দেখা গেল তাঁকে, নরম হাতে যত্নের সঙ্গে সারলেন কাজটা।

'ঘাবড়াবার কিছু নেই,' বললেন তিনি। 'বেশি সময় নেব না, দেখতে দেখতে সেলাই করা হয়ে যাবে। ঠিক বলেছি না, সিস্টার?'

চোখে সন্দেহ নিয়ে ডাক্তার ও সিস্টারের দিকে তাকাল আবিল, অনুভব করল তার হাতটা অসাড় ও ভারি হয়ে উঠছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাত দুটো খানিক শিথিল করল সিস্টার, তবে রোগীকে একেবারে ছেড়ে দিল না। ড. গনি সূচে সুতো পরাচ্ছেন দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠল আবিল, জ্ঞান হারাল সঙ্গে সঙ্গে।

'ব্যাটা খুব চালাক, দেখার ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ল,' কৌতুক করলেন ড. গনি।

সেলাইটা দ্রুত হাতে করা হলো, দেখতে হয়তো সুন্দর হলো না, তবে উদ্দেশ্যটা পূরণ হলো। সেলাই করার পর রক্ত পড়া বন্ধ হলো।

কয়েকটা বিদেশী এনজিও ওষুধ-পত্র ও সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করে, তাই দিয়ে কোনরকমে হাসপাতালটা চলছে।

'তোমার জিম্মায় রেখে যাচ্ছি ওকে, তসলিমা। জ্ঞান ফিরলে বলবে আমাকে যেন একটা ধন্যবাদ দেয়। ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ো, কেমন? আমি যাই, বিছানায় একটু কাত হই।' কাঁচাপাকা চুলে আঙুল চালালেন ড. গনি। 'সারাটা দিন আজ খুব ধকল গেছে।'

'ঠিক আছে, কাকা,' বলল তসলিমা, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'জানি কি ভাবছ,' বললেন ড. গনি। 'যে সম্প্রদায়ের লোকজন তোমার মা-বাবাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে, তাদের সেবা করতে হচ্ছে তোমাকে। কিন্তু যদি এভাবে ভাবো—সেবা ব্যাপারটা স্বর্গীয়, জাতি-ধর্ম-গোত্র-বর্ণ নির্বেশেষে সবার প্রাপ্য, তাহলে তোমার খারাপ লাগবে না। বলো তো, সেবার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত কে রাখছেন? স্বয়ং আল্লাহ পাক। রিজিক দিয়ে তিনি আমাদের সেবা করছেন, তাঁর সেবা-যত্ন ছাড়া কেউ আমরা জীবন ধারণ করতে পারতাম না। তিনি খ্রিস্টানদের কম ভালবাসেন, এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি…।'

'সবই জানি, কাকা, সবই বুঝি,' চোখ ভরা পানি, মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল তসলিমা। 'আপনার কাছ থেকে আমরা শিখেছি, সেবা পরম ধর্ম। কিন্তু…।'

'অন্যায়-অপরাধ যারা করে তাদের দূরদৃষ্টি সীমিত, তসলিমা। সেজন্যে দায়ী অজ্ঞতা ও অশিক্ষা। ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে আজ আমাদের এই অবস্থার জন্যে আমরা নিজেরাও কম দায়ী নই। যখন সুযোগ ছিল তখন আমরা লেখা-পড়া শিখিনি, ট্রেনিং নিয়ে নিজেদেরকে সুরক্ষিত করিনি। অশুভ শক্তি সব সময় ছিল, চিরকাল থাকবে— সেজন্যে শুভ শক্তিরও সত্যিকার শক্তি থাকা দরকার। কথাটা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। তবে একটা কথা, দুঃসময় চিরকাল থাকে না। আমি বলছি, তুমি দেখো, লুগাম্বায় আবার শান্তি ফিরে আসবে।'

ড. গনি প্রায়ই এ-সব কথা বলেন, কোন্ যুক্তিতে বলেন বুঝতে পারে না তসলিমা। বোগামুরা ক্ষমতায় আসার পর বড় বড় সব পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে মুসলমানদের, রাজধানী এখন মুসলমান শূন্য বললেই হয়। নামাজের সময় মসজিদগুলো নাকি খালি থাকে, অনেক মসজিদ ভেঙেও ফেলা হয়েছে। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হাজী বাবা সালাহউদ্দিন দেশ থেকে বিতাড়িত, তাঁর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আর যে-সব নেতা ছিলেন, হয় তাঁদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে, নয়তো দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন, কিংবা প্রাণভয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন গভীর জঙ্গলে। তাহলে কে এই অত্যাচারী বোগামুরাকে সরাবে? আর তাকে না সরাতে পারলে দেশে

শান্তি আসবে কিভাবে?

ড. গনি চলে যাবার পর রোগীর দিকে তাকাল তসলিমা। মাইকেলকে সে ছোটবেলা থেকে চেনে, একই গ্রামে মানুষ হয়েছে তারা। খ্রিস্টানরা তার মা-বাবা ও আত্মীয়স্বজনকে খুন করেছে বলে মাইকেল বা গ্রামের অন্য সব খ্রিস্টানদের ওপর তার কোন রাগ বা ঘৃণা নেই, কারণ অপরাধটার জন্যে তাদের গ্রামের খ্রিস্টানরা দায়ী ছিল না। দায়ী ছিল দূর গ্রামের লোকজন। তার নিজের গ্রামের খ্রিস্টানরা বেশিরভাগই শান্তিপ্রিয়, মুসলমানদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীলও। ড. গনির সেবাশ্রম টিকে থাকার সেটাই প্রধান কারণ। সেবাশ্রমে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়, এ অভিযোগ তুলে কয়েকবারই পুলিসী তদন্ত হয়েছে, কিন্তু প্রমাণের অভাবে আর গ্রামবাসীদের প্রতিবাদের মুখে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। স্টাফ, ডাক্তার ও নার্সদের ওপর ড. গনির কড়া নির্দেশ আছে কোন খ্রিস্টান রোগীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। সে নির্দেশ সবাই অক্ষরে অক্ষরে মেনেও চলে, কারণ সবাই জানে যে স্থানীয় খ্রিস্টানদের সমর্থন না পেলে সেবাশ্রমের অস্তিত্বই থাকবে না।

পঁয়ষট্টি বছর বয়েসেও ড. গনি আঠারো ঘণ্টা পরিশ্রম করেন। তিনি এই এলাকার লোক নন, পশ্চিমের গভীর জঙ্গলে তাঁর জন্ম। সেবাশ্রমের কেউ তাঁর সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানে না। তিনি ইংল্যান্ড, হল্যান্ড ও আমেরিকায় পড়াশোনা করেছেন, আন্তর্জাতিক যুব আন্দোলনের একজন নেতা ছিলেন, ইংল্যান্ডে প্রবাসী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির স্বার্থ রক্ষার আন্দোলনে জেল খেটেছেন, হাজি বাবা সালাহউদ্দিনের আমলে জেল খেটেছেন লুগাম্বাতেও, এ-সবই আবছাভাবে তাদের কানে আসে। ড. গনিকে জিজ্ঞেস করলে কোন উত্তর পাওয়া যায় না।

আরও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাজে মন দিল সিস্টার তসলিমা।

'কাকা!'

নিজের অফিসের কাছে চলে এসেছেন, এই সময় ডাকটা শুনতে পেলেন তিনি। ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে এল সিস্টারদের মধ্যে সবচেয়ে যার কম বয়েস, আসমা। ষোলো কি সতেরো বছর বয়েস তার, খুবই সুন্দরী। জন্মের পরই বাবাকে হারায় সে, তিন বছর আগে দাঙ্গাবাজ একদল লোক তাদের গ্রাম লুঠ করতে এসে তার মাকে ধরে নিয়ে গেছে, সেই থেকে মহিলার আর কোন খোঁজ নেই। গ্রামের কিছু লোক তাকে ড. গনির হাতে তুলে দিয়ে যায়। আসমা কথা বলে খুব নরম সুরে, যেন সব সময় কি একটা ভয় তাকে তাড়া করছে।

মিষ্টি করে, অভয় দিয়ে হাসলেন ড. গনি। 'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে আছ। রাত তো কম হয়নি। কি হয়েছে, মা?'

'কাকা, বাইরে থেকে কারা যেন আসছে।'

ড. গনির কাঁচাপাকা ভুরু সামান্য একটু উঁচু হলো। 'এত রাতে? কিভাবে বুঝলে তুমি?'

'আমার জানালা দিয়ে হেডলাইটের আলো দেখলাম।'

'বলো কি। চলো তো দেখি। বোগামুরা আবার পুলিস পাঠাননি তো?'

গাড়িটা রেঞ্জ রোভার। একজনই আরোহী, লম্বা ও কুচকুচে কালো। গাড়ি থেকে

নেমে এগিয়ে আসছে সে। তার হাঁটার ভঙ্গিটা লক্ষ করলেন ড. গনি। খুব নরম পায়ে হাঁটছে, ধরনটা চেনা চেনা লাগল। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন ড. গনি। তারপর সবিস্ময়ে বললেন, 'ও আল্লা, ফরহাদ। সৈয়দ ফরহাদ! এ তো আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। তুমি···এখানে?'

ফরহাদ হাসছে। যাক, ড. গনি তাহলে ওকে ভুলে যাননি।

'একা? তুমি একা? তোমার সঙ্গে রানা নেই?' এ-কথা জিজ্ঞেস করার কারণ হলো, এর আগে যে-ক'বার এসেছে ফরহাদ, প্রতিবার রানার সঙ্গেই এসেছে। 'এত বছর পর··· ।'

পরস্পরকে আলিঙ্গন করল ওরা। দোরগোড়া থেকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে আসমা, বৃদ্ধ ডাক্তারের চোখে পানি চিকচিক করছে।

মৃদু কণ্ঠে কি যেন বলল ফরহাদ। তাকে ছেড়ে দিয়ে ঘুরলেন ড. গনি। অপ্রতিভ হাসি তাঁর ঠোঁটে। 'আসমা, এসো, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। সৈয়দ ফরহাদ, আমার বন্ধু।'

ফরহাদের দিকে তাকিয়ে হাসল আসমা। সে ভাবছে, বয়েসের এত ব্যবধান, বন্ধু হয় কি করে?

হাত দুটো পরস্পরের সঙ্গে ঘন ঘন ঘষে আনন্দ প্রকাশ করছেন ড. গনি, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছেন না। 'ফরহাদ, ভেতরে এসো, ভেতরে এসো। আসমা, ছেলেটাকে এক কাপ চা খাওয়াবে নাকি? সঙ্গে কিছু খাবারও দিয়ো··· ।'

ফরহাদ বলল, 'স্যার, আপনি অস্থির হবেন না। আপনার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে। একটা কাজে এসেছি আমি, আপনার সাহায্য দরকার।' হাতঘড়ির দিকে একবার তাকাল সে। 'হাতে আমাদের বেশি সময় নেই।'

'আমাদের?' চোখ মিটমিট করলেন ড. গনি। 'ঠিক বুঝলাম না।'

ডাক্তারের একটা হাত ধরল ফরহাদ। 'রানা আসছে, স্যার। আজ রাতেই। ওরা প্লেন নিয়ে আসছে। এয়ারস্ট্রিপে আলো জ্বালার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'হোয়াট!'

'রানওয়ের দু'দিকে খানিক পর পর,' বলল ফরহাদ। 'খুব তাড়াতাড়ি, স্যার। আর ত্রিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে ওরা।'

হতভম্ব দেখাল ড. গনিকে। 'এ-সব কি বলছ তুমি, ফরহাদ!'

আসমা ভাবছে, বন্ধু হলে কাকাকে লোকটা স্যার বলছে কেন?

'পরে সব ব্যাখ্যা করব, স্যার।' অস্থির হয়ে উঠছে ফরহাদ। 'এই মুহূর্তে আমাদের হ্যারিকেন, টর্চ, কুপি যেখানে যা পাওয়া যায় সব আনতে বলুন, প্লীজ। রেঞ্জ রোভারের হেডলাইটও ব্যবহার করা যাবে। আপনাদের একটা ল্যান্ড ক্রুজার রয়েছে, ওটাও কাজে লাগবে। লোকজন দরকার, স্যার। ওরা সব কোথায়?'

'কোথায় মানে? রাত দুপুরে কেউ জেগে থাকে নাকি?'

'স্যার, ওদের ঘুম ভাঙান, প্লীজ!' আবেদন জানাল ফরহাদ।

ড. গনির ভুরু কপালে উঠে যাচ্ছে। ফরহাদের দিকে তাকিয়ে এক সেকেন্ড চিন্তা করলেন তিনি। 'শোনো, ফরহাদ, আমার কথা আলাদা, তোমাদেরকে সাহায্য করতে গিয়ে নিজের জীবন হারাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু আমি আমার এতিমখানা বা

হাসপাতালকে কোন বিপদে জড়িয়ে পড়তে দেব না।'

'মাসুদ ভাই আমাকে পাঠিয়েছেন, স্যার। যা বলার তাঁকে বলবেন, শুনবেনও তাঁর মুখ থেকে। আলোর ব্যবস্থা না করলেও নামতে চেষ্টা করবে ওরা, সেক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় সবাই মারা যেতে পারে। ভেবে দেখুন কি করবেন।'

'কেন আসছে ওরা, কি উদ্দেশ্যে, আমাকে তুমি বলবে না?' কঠিন সুরে প্রশ্ন করলেন ড. গনি।

'দুঃখিত, স্যার। যা বলার মাসুদ ভাই বলবেন।'

ঝাড়া দশ সেকেন্ড কথা না বলে ফরহাদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ড. গনি। মাসুদ রানাকে তিনি স্নেহ করেন, তারচেয়েও বড় কথা একাধিক কারণে ওর প্রতি কৃতজ্ঞ তিনি। লেবাননে আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করার সময় কয়েকবারই নির্ঘাৎ মৃত্যুর কবল থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছে ও। আরও একটা কথা ভুলে থাকা সম্ভব নয়। প্রতি বছর এক লাখ ডলারের একটা চেক আসে সেবাশ্রমে, একটা এনজিওর তরফ থেকে পাঠানো হয়। ড. গনি জানেন, রানা এজেন্সির একটা ফ্রন্ট ওটা। দ্বিধা কাটিয়ে উঠে আসমার দিকে ফিরলেন তিনি। 'ঠিক আছে, আসমা, চা থাক। সবার ঘুম ভাঙাও। তসলিমাকে সার্জারীতে পাবে, মাইকেলকে দেখছে। ওকেও চলে আসতে বলো।' আসমা নড়ছে না, অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে রেগে গেলেন তিনি। 'দাঁড়িয়ে থেকো না, যা বললাম করো!'

'ধন্যবাদ, স্যার। আলোর কি ব্যবস্থা করা যায় বলুন তো?'

'খালি রঙের কৌটা আছে অনেক, আর জেনারেটর চালাবার জন্যে তেল আছে। ছেঁড়া কম্বল ও ন্যাকড়া দিয়ে কুপি বানাব।'

হাসল ফরহাদ। 'বাহ্, দারুণ।'

বিশ-পঁচিশটা মেয়েকে দেখা গেল, এলোমেলো পা ফেলে আসছে, চোখ রগড়াচ্ছে হাত দিয়ে, কাঁচা ঘুম থেকে তুলে আনা হয়েছে। আসমা ফিসফিস করছে তসলিমার কানে। আর তসলিমা বারবার ড. গনি ও ফরহাদের দিকে তাকাচ্ছে, চোখে শুধু বিস্ময় নয়, সন্দেহও ফুটে রয়েছে।

'সৈয়দ ফরহাদ আমার বন্ধু,' ওদেরকে বললেন ড. গনি। 'ও যা বলে করে যাও, কেউ কোন প্রশ্ন করবে না।'

ফরহাদের নির্দেশে গাড়ি দুটো স্ট্রিপে নিয়ে এল ওরা, রানওয়ের দু'পাশে খানিক পর পর একটা করে কুপি বসানো হলো। ছেঁড়া কম্বল ও ন্যাকড়া দিয়ে বানানো সলতে ভেজানো হলো কেরোসিনে। সবাই তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে।

ফরহাদ নিষেধ করল, 'কেউ কোন কথা বলবে না।'

মেয়েদের সবার পরনে সাদা বোরখা, মশালের আলোয় ভূতের মত লাগছে তাদেরকে। আওয়াজটা ফরহাদই শুনতে পেল প্রথমে। দ্রুত কাছে চলে আসছে প্লেনটা, সন্দেহ নেই নিচের দিকে তাকিয়ে আলো খুঁজছে ওরা। চেঁচিয়ে উঠল সে, 'কুপি জ্বালো! কুপি জ্বালো! জলদি জলদি জলদি!'

এক এক করে এয়ারস্ট্রিপের দু'পাশের কুপিগুলো জ্বলে উঠল, একই সঙ্গে রেঞ্জ রোভার ও টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজারের দু'জোড়া হেডলাইট চওড়া আলোর টানেল তৈরি করল।

*

'ওই তো!' উইন্ডস্ক্রীনের উপর ঝুঁকে নিচে তাকিয়ে রয়েছে নাসিম, তার কাঁধে টোকা দিয়ে আঙুল তাক করল রানা।

'নিচে নামছি,' বলল নাসিম। 'শক্ত হও সবাই। ঝাঁকি লাগতে পারে।'

চীফটানের একদিকে ডান কাত হয়ে গেল, দ্রুত নিচে নামছে প্লেন, সারি সারি আলো আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে এসে উপত্যকায় নামছে ওরা। জমিন স্পর্শ করল চাকা, থ্রটল পিছিয়ে আনল নাসিম। এঞ্জিনের আওয়াজ কমে গেল, স্ট্রিপ ধরে ছুটছে প্লেন। শেষ একজোড়া কুপি ছাড়িয়ে এক দু'গজ সামনে এসে ঘুরে গেল, এগোচ্ছে যেদিক থেকে এসেছে, গোটা প্লেন আলোকিত হয়ে উঠল দু'জোড়া হেডলাইটের আলোয়।

রেঞ্জ রোভারে স্টার্ট দিল ফরহাদ, চীফটানের দিকে ছুটে আসছে। স্থির হয়ে দাঁড়াল প্লেন। সাইড ডোর খুলে গেল, নিচে নামানো হলো মই। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল জাফর।

'ওহে, ফরহাদ, এদিকের সব খবর কি?'

'ভাল, জাফর। আসতে কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

'অসুবিধে? নাসিম থাকতে?' দোরগোড়া থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল জাফর, একটু পর আবার ফিরে এল হাতে প্যাক ও মেশিন পিস্তল নিয়ে। ওগুলো ফরহাদের হাতে ধরিয়ে দিল সে, রেঞ্জ রোভারে রাখার জন্যে। এরপর দোরগোড়ায় দেখা গেল জামিলকে, তার হাতেও প্যাক ও মেশিন পিস্তল।

স্ট্রিপের পাশে দাঁড়িয়ে সেবাশ্রমের মেয়েরা স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। আরোহীদের সবার পরনে ক্যামোফ্লেজ সুট।

মেয়েরা দেখল প্লেনের দরজায় আরও একজন উদয় হলো। দীর্ঘদেহী পুরুষ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কঠিন চেহারা, গম্ভীর হয়ে আছে। তবে তারপর এমন ভঙ্গিতে হাসল, যেন ফরহাদকে দেখে খুব খুশি হয়েছে।

রানার পাশে আরেকজনকে দেখা গেল।

রীতিমত চমকে উঠলেন ড. গনি। সেটা খেয়াল করে পাশ থেকে সিস্টার তসলিমা ঘাড় ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকাল একবার। প্লেনের দিকে আবার তাকাতে ব্যাপারটা উপলব্ধি করল সে। 'ওমা, এ যে দেখছি একটা মেয়ে!'

'ওর নাম সেলিনা নাসিম,' বললেন ড. গনি, এখনও আড়ষ্ট হয়ে রয়েছেন তিনি।

'আপনি ওকে চেনেন, কাকা?' জিজ্ঞেস করল তসলিমা।

'হ্যাঁ, চিনি বৈকি।' ড. গনি বিস্তারিত বললেন না।

প্লেনের আরোহীরা রেঞ্জ রোভারে চড়ছে। শুধু রানা বাদে। নাসিমকে ও বলল, 'ধন্যবাদ, নাসিম। তোমার এই উপকার আমরা কোনদিন ভুলব না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে উঠল নাসিম। 'এনিটাইম, রানা।' রানাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল সে। 'ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার মাথায় ফিরে আসব আমি। এখানে তুমি থাকবে।'

'প্রাণপণ চেষ্টা করব। কাল মাঝরাতে আমরা যদি না ফিরি, নাসিম, অপেক্ষা না করে আবার তুমি নাইরোবিতে ফিরে যাবে।'

রানার একটা হাত ধরল নাসিম। 'কোন অজুহাত আমি মানব না। এসে যেন

তোমাকে আমি এখানে পাই।'

'ইয়েস, ম্যাম।'

ডান হাতটা মুঠো পাকিয়ে রানার বুকে মৃদু ঘুসি মারল নাসিম। 'বখতিয়ারকে হারিয়েছি, এখন আপন বলতে শুধু তুমি আছ। কথাটা ভুলো না।'

বুকে ঠেকে থাকা নাসিমের হাতটা ধরে মৃদু চাপ দিল রানা, বলল, 'হ্যাভ আ সেফ ট্রিপ।'

'টেক কেয়ার, রানা। তোমাকে আমি নিতে আসছি।' পিছিয়ে গেল নাসিম, মই বেয়ে উঠে পড়ল চীফটানে। মই তোলা হলো, বন্ধ হয়ে গেল দরজা। দীর্ঘ পা ফেলে রেঞ্জ রোভারের দিকে এগোল রানা। ও উঠতেই গাড়িটা ছেড়ে নিল ফরহাদ, স্ট্রিপ থেকে বেরিয়ে এসে একপাশে থামল। ইতিমধ্যেই রানওয়ে ধরে ছুটতে শুরু করেছে প্লেন। একটু পরই অন্ধকারে আকাশে উঠে পড়ল নাসিম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হারিয়ে গেল।

আলোগুলো নিভিয়ে ফেলার নির্দেশ দিল ফরহাদ। গাড়ি থেকে নেমে ড. গনির সামনে দাঁড়াল রানা। 'কেমন আছেন, ড. গনি?'

'ভাল। এ-সব কি ঘটছে, রানা?'

রেঞ্জ রোভার থেকে নেমে রানার পাশে এসে দাঁড়াল জামিল ও জাফর। সাদা বোরখা পরা কয়েকটা মেয়ে ওদেরকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সেদিকে একবার তাকিয়ে রানা বলল, 'ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন না, ড. গনি?'

শুধু বিস্মিত নয়, রীতিমত উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে মেয়েগুলোকে।

'ওরা আমার নার্সিং স্টাফ, রানা। সবাই নয়, কেউ কেউ এঞ্জিনিয়ারিং পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

মেয়েগুলোর দিকে ফিরে হাসল রানা। 'সবাইকে শুভেচ্ছা। ড. গনি, চলুন আগে আমরা আপনার সেবাশ্রমে গিয়ে বসি। তারপর কথা হবে। প্লেন নিয়ে ফিরে গেছে নাসিম, আপনি না চাইলেও এখন আমাদেরকে ঠাঁই দিতে হবে, তাই না?'

তসলিমা সব মেয়েকে এক জায়গায় জড়ো করে সেবাশ্রমের দিকে রওনা হয়ে গেল। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ড. গনি বললেন, 'ঠিক আছে, চলো।'

'হায় আল্লাহ্!' আঁতকে উঠলেন ড. গনি। 'এ তুমি কি বলছ, রানা!'

ওরা চারজন ড. গনির অফিস কামরায় রয়েছে। ড. গনি মেয়েগুলোকে যার যার জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, আশ্বাস দিয়ে বলেছেন উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই।

প্যাক আর অস্ত্রগুলো কামরার এক কোণে পড়ে রয়েছে।

'ঠিকই বলছি, ড. গনি। আমরা আনিস সিদ্দিকীকে বের করে নিয়ে যাব।'

'কিন্তু এ তো স্রেফ পাগলামি, রানা। ভদ্রলোককে মাবোরুতে আটকে রাখা হয়েছে। ওখানে তোমরা কোনভাবেই ঢুকতে পারবে না।'

'হ্যাঁ, কাজটা প্রায় অসম্ভব। তবে আমরা চেষ্টা করব।'

'ব্যাপারটা আমি বুঝছি না, রানা। বোগামুরা তাঁকে গ্রেফতার করলেও, নিশ্চয়ই ছেড়ে দিতে বাধ্য হবেন। অত্যন্ত নামকরা একজন বিজ্ঞানী তিনি, ব্রিটিশ সরকার...।'

'ব্রিটিশ সরকার ফেল মেরেছে,' বলল রানা, কঠিন শোনাল ওর গলা, চেহারা

থমথম করছে। 'বোগামুরা জানিয়ে দিয়েছেন আনিস সিদ্দিকীর ব্যাপারে কোন সুপারিশ শুনতে পর্যন্ত রাজি নন তিনি।'

'ব্যাপারটা এরকম,' বলল ফরহাদ, 'বোগামুরা যে-সব শর্ত দিয়েছেন ব্রিটিশ সরকার তা মানতে রাজি নন, ফলে আনিস সিদ্দিকীকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করানো হবে।'

জামিল বলল, 'লুগাম্বায় কি ঘটছে আপনি তো জানেন, স্যার। বোগামুরাকেও আপনি চেনেন। আর কিছু না হোক, একবার যখন মুখ থেকে কথাটা বের করেছেন, শুধু মজা পাবার জন্যে হলেও আনিস সিদ্দিকীকে গুলি করে মারবেন তিনি। কাজটা তিনি দু'একদিনের মধ্যেই করবেন বলে আমাদের ধারণা। তারমানে খুব তাড়াতাড়ি ভদ্রলোককে বের করে আনতে হবে...।'

'কিন্তু তোমরা কেন? কে দিল কাজটা?'

'একটা এজেন্সির মাধ্যমে কাজটা পেয়েছি আমরা,' বলল রানা। 'একজন ব্রোকারের মাধ্যমে। কাজটা যার কাছ থেকেই পেয়ে থাক সে, লোকটার পরিচয় জানতে পারেনি। তবে আমি আমার এজেন্সিকে দায়িত্ব দিয়ে এসেছি, ওরা ঠিকই লোকটার পরিচয় বের করে ফেলবে।'

'আমি আসি অ্যাডভ্যান্স পার্টি হিসেবে,' ব্যাখ্যা করল ফরহাদ, হাসছে সে। 'বুঝতেই পারছেন, খুব বেশি কালো বলেই আমাকে পাঠানো হয়েছে।'

একে একে চারজনের দিকেই তাকালেন ড. গনি। 'তোমরা পাগল,' বললেন তিনি, মাথা নাড়ছেন।

'স্যারের কথায় যুক্তি আছে,' বিড়বিড় করল জামিল, আড়চোখে রানার দিকে একবার তাকাল। 'পাগল ছাড়া অসম্ভবকে কেউ সম্ভব করতে চায়?'

'রাখো তোমার ঠাট্টা!' ধমক দিলেন ড. গনি। কয়েক সেকেন্ড গুম মেরে থাকলেন তিনি। চোখ তুলে ঘরের কোণে পড়ে থাকা অস্ত্রগুলো দেখলেন একবার। 'বোকামিটা ঠিক কখন তোমরা করতে চাইছ?' রানাকে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'এই ধরুন এখন থেকে উনিশ ঘণ্টার মধ্যে,' বলল রানা। 'আনিস সিদ্দিকীকে জেল থেকে বের করে এখানে আনব আমরা। নাসিম ফিরে এসে নিয়ে যাবে আমাদের।'

'রানা, কি বলব বুঝতে পারছি না,' কাঁচাপাকা চুলে আঙুল চালাচ্ছেন ড. গনি। 'স্টাফ আর মেয়েগুলোর নিরাপত্তার কথা সবার আগে ভাবতে হবে আমাকে। আমার ওপর পুলিসের কড়া নজর আছে। বিশ্বাস করো, শুধু একটা অজুহাত পাবার অপেক্ষায় আছে ওরা, পেলেই আমাকে জেলে ভরবে। আর আমি না থাকলে এই সেবাশ্রমও থাকবে না। আর মেয়েগুলোকে...সেকথা ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। রানা, নানা কারণে তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, তোমার ঋণ আমি হয়তো কোনদিনই শোধ করতে পারব না, কিন্তু তবু তোমাকে সাহায্য করতে গিয়ে মেয়েগুলোকে আমি বিপদে ফেলতে পারি না।'

রানা কথা বলল নরম সুরে, 'এখানে না এসে আমাদের কোন উপায় ছিল না। লুগাম্বায় ঢোকার সব রাস্তা বন্ধ। প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে সময়ও খুব কম ছিল হাতে। এয়ারলিফট ছিল একমাত্র প্র্যাকটিক্যাল সলিউশন, বিশেষ করে আপনি যখন এখানে আছেন। ড. গনি, আপনার সাহায্য ছাড়া কাজটা আমরা করতে পারব না।'

'তুমি আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছ, রানা,' বলল ড. গনি। 'বুঝলাম তোমার সাহায্য দরকার, কিন্তু আমার সেবাশ্রমের কি হবে? তোমরা চলে যাবার পর মেয়েগুলোকে রক্ষা করবে কে?'

'আপনি আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন বা সাহায্য করেছেন, তার কোন প্রমাণ থাকবে না,' বলল রানা। 'পুলিস এলে বলবেন আপনি কিছুই জানেন না।'

'এয়ারস্ট্রিপে প্লেন নেমেছে, এ-খবর শোনা মাত্র পুলিস ধরে নেবে ব্যাপারটার সঙ্গে আমিও জড়িত। তোমরা এখানে এসে আমাকে মারাত্মক বিপদে ফেলে দিয়েছ, রানা।'

'সত্যি দুঃখিত,' বলে চেয়ার ছাড়ল রানা, সঙ্গীদের দিকে তাকাল। 'ড. গনি ঠিকই বলছেন। ভুল হয়েছে আমাদের। চলো, এখুনি আমরা বেরিয়ে যাই।' সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছাড়ল ওরা তিনজন।

ডেস্কের পিছনে উঠে দাঁড়ালেন ড. গনিও। 'বেরিয়ে যাবে··· কোথায়?'

'আশপাশে জঙ্গলের কোন অভাব নেই, রাত কাটাতে কোন অসুবিধে হবে না···।'

'বসো,' নির্দেশের সুরে বললেন ড. গনি। 'ব্যাপারটা আমাকে আরেকটু ভেবে দেখতে দাও। বলো, ঠিক কি ধরনের সাহায্য দরকার তোমাদের?'

বাকি তিনজন বসলেও রানা বসল না। 'রওনা না হওয়া পর্যন্ত একটা আশ্রয় দরকার আমাদের।'

'ছোট একটা ওয়ার্ড আছে, খালি,' বললেন ড. গনি। 'ইচ্ছে করলে ওটা তোমরা ব্যবহার করতে পারো। তবে বাইরে ঘুর ঘুর করতে পারবে না। আমার মেয়েদের যা বলার বলে দিচ্ছি আমি···।'

'ধন্যবাদ,' রানা নয়, ফরহাদ বলল।

তার দিকে একবার তাকিয়ে ড. গনির দিকে ফিরল রানা, কিন্তু মুখ খোলার সুযোগ পেল না।

দরজায় নক হয়নি, দড়াম করে খুলে গেল সেটা। চোখ-মুখ লাল হয়ে আছে সিস্টার আসমার, সশব্দে হাঁপাচ্ছে সে। বোরখা নয়, পরে আছে সালোয়ার-কামিজ, তবে ওড়না ছাড়া। এলোমেলো চুল, চোখ দুটো বিস্ফারিত। পলকের জন্যে জাফরের দিকে তাকাল সে, তারপর ড. গনির দিকে। ধরা গলায় বলল, 'কাকা, মিলিটারি আসছে!'

***

ব্যর্থ মিশন-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬

এক

সিস্টার আসমার মুখে 'মিলিটারি আসছে' শুনেই বিদ্যুৎ খেলে গেল জামিলের শরীরে, ঘরের কোণে পড়ে থাকা মেশিন পিস্তলগুলোর দিকে ছুটল সে। জাদুর মত জাফরের হাতে বেরিয়ে এল একটা ব্রাউনিং।

চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়লেন ড. ওসমান গনি। 'আল্লার দোহাই লাগে, রানা, এখানে কোনও ভায়োলেন্স নয়!'

'সঙ্গে নাও সব,' নির্দেশ দিল রানা। 'মুভ! মুভ! ফরহাদ, রেঞ্জরোভার কোথায় রেখেছ?'

'স্টোর শেডে, কেউ দেখতে পাবে না...।'

এখনও দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে আসমা, পলকহীন চোখে ভয়ের ছায়া। মেঝে থেকে প্যাক ও অস্ত্রগুলো ছোঁ দিয়ে তুলে নিচ্ছে জাফর, তার দিকে আবার তাকাল সে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার, চোখাচোখি হতে অভয় দিয়ে হাসল জাফর। কি ছিল তার হাসিতে, হঠাৎ আসমার মন থেকে সব ভয় কোথায় যেন পালিয়ে গেল।

তাকে ঠেলে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন ড. গনি। 'ওদের বলো আমি আসছি। যাও! রানা, তোমরা আমার পিছু নাও।'

অফিস থেকে বেরিয়ে এসে করিডর ধরে ছুটছে ওরা। বিল্ডিঙের ভেতর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ওদেরকে ড. গনি। দড়াম করে একটা দরজা খুললেন, ভেতরে আধো অন্ধকারে ছ'টা বেড দেখা গেল, মশারি টাঙানো রয়েছে। কামরার ভেতর ডিজইনফেকট্যান্ট-এর গন্ধ।

'বিছানায় শুয়ে পড়ো সবাই, মশারির নিচটা তোষকের কিনারায় গুঁজে দাও। ওদেরকে আমি দরজা থেকেই ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করব।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন ড. গনি, দরজাটা বন্ধ করতে ভুললেন না। করিডরে তাঁর দ্রুত পদশব্দ শুনতে পেল ওরা।

বিছানার তলায় প্যাকগুলো লুকিয়ে রেখে চাদরের নিচে গা ঢাকা দিল ওরা, নেটের মশারি পর্দার মত কাজ করছে।

কর্পোরালের নাম মেকানাকি। তার সঙ্গী মোটাসোটা, বেঁটে, মুখে কয়েকদিনের না-কামানো দাড়ি, নামটা ঠিক ধরতে পারলেন না ড. গনি। দু'জনেই আঙুল দিয়ে অ্যাসল্ট রাইফেলের ট্রিগার নাড়াচাড়া করছে। কর্পোরাল ব্যাখ্যা করল, দু'জন আরোহী সহ নিখোঁজ একটা ল্যান্ড রোভার খুঁজছে তারা—একটা বর্ডার পেট্রল, বেস-এর সঙ্গে রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

'আপনার ধারণা এখানে তাদেরকে পাবেন?' জিজ্ঞেস করলেন ড. গনি, পালা করে রাইফেল দুটোর দিকে তাকাচ্ছেন, চেহারায় স্পষ্ট বিরক্তি। মনে মনে খানিকটা

স্বস্তিবোধ করছেন তিনি—যাক, ওরা তাহলে প্লেনের শব্দ শুনে আসেনি।

'পাই বা না পাই, খুঁজে দেখতে হবে আমাদের,' বলল মেকানাকি, চেহারায় গোয়ার্তুমির ভাব। 'আপনি নিশ্চয়ই বাধা দেয়ার কথা ভাবছেন না, ড. ওসমান গনি?'

বৃদ্ধ ডাক্তার বললেন, 'আপনি যখন আমার পরিচয় জানেন তখন ধরে নিচ্ছি এ-ও জানেন যে লুগাম্বা সরকারের অনুমতি নিয়েই এই সেবাশ্রম চালাচ্ছি আমি। আমাদের রেকর্ড স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। আপনারা যাদেরকে খুঁজছেন তাদের সম্পর্কে আমার বা আমার স্টাফদের কোন ধারণা নেই। আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, এখানে তারা আসেনি।'

'আমি জানতে চাই, আপনি সার্চ করতে বাধা দেবেন কিনা।' কর্কশ সুরে জানতে চাইল মেকানাকি।

ড. গনির পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সিস্টার আসমা, কর্পোরালের চেহারা দেখে আবার তার মনে ভয় ধরে গেল, শিরশির করে উঠল ঘাড়ের পিছনটা।

কাঁধ ঝাঁকালেন ড. গনি। 'সরকারী কাজে বাধা দেয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমার কথা যখন বিশ্বাস হচ্ছে না, ঠিক আছে, যেখানে খুশি সার্চ করুন আপনারা,' বললেন তিনি।

'তাহলে পথ ছাড়ুন।'

আসমাকে পাশ কাটিয়ে অফিসে ঢুকে পড়ল তারা। লোক দু'জন কতদিন গোসল করেনি কে জানে, উৎকট গন্ধে বমি পেয়ে গেল মেয়েটার, নাক-মুখ কুঁচকে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরল সে। তার উদ্দেশে চোখ গরম করলেন ড. গনি, বুঝিয়ে দিলেন কোনভাবেই ওদেরকে ঘাঁটানো যাবে না।

বাকি সব মেয়েরা যে যার কামরা থেকে বেরিয়ে এসে করিডরে জড়ো হয়েছে। সৈনিকদের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে তারা। সঙ্গীকে নিয়ে তাদের কামরায় একবার করে টুঁ মারল মেকানাকি। শেষ কামরাটা থেকে বেরিয়ে এসে প্যাসেজের শেষ মাথার দরজার দিকে তাকাল কর্পোরাল। কালাশনিকভ বুকের কাছে আড়াআড়ি ভঙ্গিতে ধরে এগোল সে।

'ঘরটার ভেতর ঢুকব না আমি।' দরজার হাতল ধরে বললেন ড. গনি। গম্ভীর দেখাচ্ছে তাঁকে। 'আমার পরামর্শ, আপনাদেরও ঢোকা উচিত হবে না।'

তাঁর কথায় কান দিল না মেকানাকি। ড. গনির বাহু ধরে হাতল থেকে হাতটা সরিয়ে দিল।

'আমি অনুরোধ করছি।' ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ড. গনির চেহারা। 'এই ঘরের ভেতর ঢুকলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারে...।'

কথা বলল না কর্পোরাল, অ্যাসল্ট রাইফেলটা একহাতে নিয়ে তাক করল ড. গনির বুকে, অপর হাতে হাতল ঘুরিয়ে খুলে ফেলল দরজা। সঙ্গীকে ইঙ্গিত দিয়ে কামরার ভেতর ঢুকে পড়ল সে।

দ্বিতীয় বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে রানা, দরজাটা খুলে যেতে দেখল। করিডরের আলোয় তিনটে মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, একজনের পিছু নিয়ে বাকি দু'জনও ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। ড. গনিকে চিনতে অসুবিধে হলো না। বাকি দু'জন আর্মি ফেটিগ পরে আছে, হাতে রাইফেল। চাদরের তলায়, কোলের ওপর রয়েছে রেমিংটন, ট্রিগারটাকে পেঁচিয়ে আছে একটা আঙুল। রানা জানে, ওর বাকি সঙ্গীরাও টেনে ধরা

স্প্রিঙের মত উত্তেজিত হয়ে আছে।

সৈনিকদের মধ্যে লম্বা লোকটা রাইফেলের ব্যারেল ঘোরাল ঘরের চারদিকে, দু'সারি বেডের ওপর চোখ বুলাচ্ছে, মশারির ভেতর দেখার চেষ্টা করছে রোগীদের। তারপর প্রথম বেডের দিকে এগোল কর্পোরাল। ওখানে শুয়ে আছে ফরহাদ। চোখ বন্ধ, দেখে মনে হবে ঘুমাচ্ছে।

কয়েক ফুট দূরে রানা অনুভব করল পাঁজর বেয়ে ঘামের ধারা নেমে যাচ্ছে। নিঃশ্বাস আটকে অপেক্ষা করছে ও।

প্রথম বিছানার একদিকের মশারি ইঞ্চি কয়েক তুলে ফেলল কর্পোরাল, হাতের রাইফেল ফরহাদের ওপর তাক করা।

কুণ্ডলী ছাড়াতে শুরু করল রানা, রেমিংটন হয়ে উঠল হাতের বাড়তি একটা অংশ, চাদর সরিয়ে গুলি করার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

হঠাৎ এগিয়ে এসে কর্পোরালের কানে দ্রুত ফিসফিস করলেন ড. গনি। আঁতকে উঠে মশারি ছেড়ে দিল মেকানাকি, তারপর এমনভাবে দরজার দিকে ছুটল, যেন ভূতে তাড়া করেছে। করিডরে বেরিয়ে গেল সে, কিছু না বুঝেই তাকে অনুসরণ করল তার সঙ্গী। বেরুলেন ড. গনিও, সাবধানে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

ঢিল পড়ল রানার পেশীতে, শটগান ধরা মুঠো আলগা হলো ধীরে ধীরে। কামরার আরেক প্রান্ত থেকে নিচু গলায় একটা গাল দিল জাফর, চোখ বুজে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল বড় করে।

'খোদার কসম বলছি, রানা!' নিজের মশারি তুলে মাথা বের করল জামিল। 'মনে হচ্ছিল ব্যাটাদের না মেরে উপায় নেই।'

বিছানায় উঠে বসে মেঝেতে পা নামাল রানা। 'তার পরিণতি হত ভয়ঙ্কর।' রেমিংটনটা হাঁটুর ওপর ধরে আছে ও। 'ড. গনি কি বললেন বুঝলাম না। লোকটা অমন ছিটকে বেরিয়ে গেল কেন?'

প্রথম বেড থেকে চাপা গলায় হাসছে ফরহাদ। শটগানের ব্যারেল দিয়ে তার বিছানায় একটা খোঁচা মারল রানা। 'কি হে, হাসছ কেন?'

ব্রাউনিং হাতে বিছানা থেকে বেরিয়ে এল ফরহাদ। এখনও হাসছে সে, তবে নিঃশব্দে।

'এই ব্যাটা, তোর হলো কি?' ধমক দিল জাফর।

হাসতে হাসতেই ফরহাদ বলল, 'মাসুদ ভাই, লোকটাকে ডা. গনি কি বললেন, জানেন? বললেন, আমরা সবাই কুষ্ঠরোগী।'

নিস্তব্ধতা ভাঙল জামিলের দীর্ঘশ্বাস ফেলার আওয়াজে। ড. গনির উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসায় আপনমনে মাথা নাড়ল রানা।

খুলে গেল দরজা, বন করে ঘুরে লাফ দেয়ার ভঙ্গি করল ফরহাদ, দু'হাতে ধরে আছে ব্রাউনিং। রানা ও রেমিংটন একসঙ্গে নেচে উঠল। ছিটকে দু'পাশে সরে গেল জামিল ও জাফর, একযোগে পিস্তল তুলল।

হাত ঝাপটা দিয়ে মুখের সামনে থেকে মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করলেন ড. গনি। 'শুনে তোমরা খুশি হবে যে ওরা চলে গেছে।' ইঙ্গিতে অস্ত্রগুলো দেখালেন। 'ওগুলোর কোন দরকার নেই। নিরাপদ কোথাও রেখে শুয়ে পড়ো সবাই। আজ রাতে আর কেউ

বিরক্ত করবে বলে মনে হয় না।'

'আপনার উপস্থিত বুদ্ধির তুলনা হয় না, স্যার,' বলল জাফর।

'এত থাকতে আপনি আমাদেরকে কুষ্ঠ রোগী বানালেন কি মনে করে, স্যার?' জিজ্ঞেস করল জামিল।

'এইডসের রোগী বললে খুশি হতে?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন ড. গনি। 'ইউনিটটা এক কোণে, আর সব ওয়ার্ড থেকে যথেষ্ট দূরে। এর আগে এইডসের রোগী একজন ছিলও।'

ওরা কেউ কিছু বলার আগেই কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনি।

বিতাড়িত প্রেসিডেন্ট হাজি বাবা সালাহউদ্দিন ফালার ভাড়াটে খুনী তারিক মবুতু আর কোন দুর্ঘটনা বা বিপদ ছাড়াই লুগাম্বার রাজধানী কেনডুরায় পৌঁছুল। আর্মি ফেটিগ পরা এক লোক মিলিটারি ভেহিকেল চালাচ্ছে, দেখে কারও মনে কোন সন্দেহ জাগার কথা নয়। তাছাড়া সব সময় মেইন হাইওয়ে এড়িয়ে গেছে সে, ফলে কোন টহল দলের সামনে পড়তে হয়নি।

রাজধানীতে ঢোকার পর তার প্রথম চিন্তা হলো ল্যান্ড রোভারটাকে কিভাবে লুকানো যায়। সারি সারি অনুজ্জ্বল দোকান-পাট সবই প্রায় খালি, যেন মেরামতের অযোগ্য ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত একেকটা। সরু একটা গলির ভেতর ঢুকে খানিক দূর এগোতেই তালা মারা সারি সারি কয়েকটা গ্যারেজ দেখতে পেল সে। ভাঙা বোতলের ওপর দিয়ে ল্যান্ড রোভার নিয়ে এগোচ্ছে, চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে টিনের কৌটা, ঠোঙা, কার্ডবোর্ডের বাক্স ইত্যাদি। দু'পাশে আবর্জনার পাহাড়। প্রায় অন্ধকারের ভেতর খোলা একটা গ্যারেজের মুখ দেখতে পেল সে, রাক্ষসের মত হাঁ করে আছে। ভেতরটা এত লম্বা, মনে হলো গুহা। ভাঙাচোরা দরজা একপাশে কাত হয়ে রয়েছে।

আশপাশে কেউ নেই দেখে থামল না মবুতু, ল্যান্ড রোভার নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ভেতরে প্রচুর জায়গা, গাড়িটা ঘুরিয়ে নিল সে। স্টার্ট বন্ধ করে বসে থাকল কিছুক্ষণ। কোথাও কোন শব্দ নেই, গলির ভেতর এখনও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ব্যাগটা নিয়ে নেমে পড়ল সে, গ্যারেজের বাইরে বেরিয়ে এসে কবাট দিয়ে যতটা সম্ভব আড়াল করল মুখ, তারপর ছায়ার ভেতর দিয়ে গলিটা পেরিয়ে আরেক গলিতে ঢুকল।

দরজা খোলার আগেই ভয়ে কাঁপতে শুরু করল মেয়েটা। কলিংবেলের আওয়াজ শুনেই ধরে নিয়েছে সাসুর লোকজন তাকে ধরতে এসেছে। দরজা সামান্য খোলার পর মবুতুকে দেখে ভয়টা তার আরও বেড়ে গেল। কেনডুরায় আর্মি ড্রেস মানে সাক্ষাৎ মৃত্যু।

'আমি মবুতু,' বলল সে।

নামটা শুনেই হাঁ হয়ে গেল মেয়েটা, দরজা পুরোপুরি খুলে দ্রুত সরে দাঁড়াল একপাশে। অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর ঢুকে পড়ল মবুতু। কবাট লাগিয়ে তালা দিল মেয়েটা। তার দিকে তাকিয়ে থাকল মবুতু।

মেয়েটা লম্বা, সরু কোমর, লুগাম্বার বেশিরভাগ মেয়ের মত মোটা নয়। যে সুতী কাফটানটা পরেছে তাতে তার শরীর ঢাকা পড়েছে কমই, পাতলা কাপড় তার উন্নত স্তন ও সুগঠিত পায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে। চোখ দুটো বড়, ভরাট ঠোঁট। পুরুষদের মত

করে ছাঁটা ছোট চুল মাথায়, ঘাড়টা খুব সুন্দর। কালো হলেও লাবণ্য আছে চেহারায়, মসৃণ ত্বকে কোন দাগ নেই।

পারফরমিং আর্টস কলেজ থেকে নৃত্যশিল্পী হিসেবে পাস করেছে নার্গিস নোয়ালি, একটা সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গে আমেরিকায় গিয়েছিল নাচতে। ওখানে থাকার সময়ই খবর পায় জুলিয়াস বোগামুরা বৈধ সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেছেন, রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের প্রথম দিকেই তার কর্নেল বাবা ও সমাজসেবিকা মাকে খুন করেছে বোগামুরার সৈনিকরা। সাংস্কৃতিক দলের অনেক সদস্যই ভয়ে আর দেশে ফেরেনি, নার্গিসকেও তারা ফিরতে মানা করেছিল, কিন্তু কারও কথা শোনেনি সে।

মনের কথা গোপন রেখে দেশে ফিরে আসে নার্গিস। এয়ারপোর্ট থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তবে জেলখানায় নয়, সরাসরি কমান্ড পোস্টে নিয়ে আসা হয় তাকে, প্রেসিডেন্টের বাসস্থানে।

কমান্ড পোস্টে নিয়ে আসার পর মেজর কাগলি তাকে দু'ঘণ্টা জেরা করে। পরে প্রেসিডেন্টের সামনে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। মেজর কাগলি বা বোগামুরা, কেউই তার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করেনি। প্রেসিডেন্ট প্রস্তাব দেন, ইচ্ছে করলে রাষ্ট্রীয় নৃত্যশিল্পীদের দলনেত্রীর পদটা সে পেতে পারে। সবিনয়ে তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয় সে। পরে লুগাম্বান ট্যুরিস্ট বোর্ড-এর তৈরি একটা ছায়াছবিতে অভিনয় করারও সুযোগ দেয়া হয় তাকে।

বোগামুরার যৌন পীড়ন সম্পর্কে রোমহর্ষক সব গুজব শোনা যায়। বলা হয় তিনি নাকি যৌনতাকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করেন। শুধু অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে অনেক নামকরা পরিবারের মেয়েরা স্বেচ্ছায় প্রেসিডেন্টের হাতে নিজেদের তুলে দিয়েছে, এটা একটা ওপেন সিক্রেট। এমন কি খ্রিস্টান মেয়েরাও পিছিয়ে নেই, সমাজে ওঠার জন্যে তাদের অনেকেও বোগামুরার মনোরঞ্জন করে থাকে। শোনা যায় লুগাম্বান সমাজের সর্বস্তরে কিলবিল করছে বোগামুরার ঔরসজাত সন্তান।

শুরুতে হাত না বাড়ালেও, নার্গিসের ওপর প্রথম থেকেই চোখ ছিল বোগামুরার। আর নার্গিসও চাইছিল বোগামুরার কাছাকাছি পৌঁছুতে, তা না হলে সে প্রতিশোধ নেবে কিভাবে।

প্রথম যেদিন হাত বাড়ালেন তিনি, সেদিনের কথা পরিষ্কার মনে করতে পারে নার্গিস, আর মনে পড়লেই ঘৃণায় রিরি করতে থাকে তার শরীর। প্রেসিডেন্টের বাসভবনে সেদিন একদল ইসরায়েলি ডেলিগেটের সম্মানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল। পুরুষ নৃত্যশিল্পীরা পরেছিল পুঁতির মালা দিয়ে তৈরি পোশাক, আর মেয়েরা পরেছিল শুধু জি স্ট্রিং—তেল মাখানো শরীর চকচক করছিল সবার, কয়েকশো দর্শক ওদের গোগ্রাসে গিলছিল বললে অত্যুক্তি হয় না।

অনুষ্ঠান চলার সময়ই নার্গিস লক্ষ করে তার ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছেন না বোগামুরা, লোভে চকচকে হয়ে উঠেছে তাঁর দৃষ্টি। মনে মনে খুশিই হয়েছিল সে, আশা, অনুষ্ঠানের পর প্রশংসা করার জন্যে প্রেসিডেন্ট তাকে কাছে ডাকবে। সে জানত, কাছাকাছি যাবার সুযোগ পেলেও এত তাড়াতাড়ি প্রতিশোধ নেয়া তার দ্বারা সম্ভব নয়। সে শুনেছে, নিভৃতে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যে-ই দেখা করুক, প্রথমে তাকে সার্চ করা হয়। তবে ঘনিষ্ঠতার কারণে বারবার দেখা-সাক্ষাৎ হতে থাকলে তখন আর সব

সময় সার্চ করা হয় না।

কিন্তু সেদিন খুব ভয় পেয়ে যায় নার্গিস, বুঝতে পারে সে আসলে বোকার স্বর্গে বাস করছে। একজন প্রেসিডেন্ট, দেশী-বিদেশী কয়েকশো সম্মানী দর্শকের সামনে এ-ধরনের আচরণ কিভাবে করতে পারেন, আজও তার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না নার্গিস। সে নাচছে, হঠাৎ দেখে তার দিকে তাকিয়ে অশ্লীল সব ইঙ্গিত করছেন বোগামুরা, আর নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে গড়িয়ে পড়ছেন।

নাচ শেষ হতে নার্গিস দেখল বোগামুরা তার দিকে তাকিয়ে একজন এইড-এর সঙ্গে কথা বলছেন। মঞ্চ থেকে ড্রেসিং রুমে চলে এল নার্গিস, এই সময় তার ডাক পড়ল।

ভয় পেয়েছে নার্গিস, একবার ভাবল যাবে না। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ডেকে পাঠিয়েছেন, না গেলে তার পরিণতি কি হবে ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তার দলের নেতা থমথমে চেহারা নিয়ে এগিয়ে এলেন, ব্যাখ্যা করে বললেন নার্গিসের নাচ খুব পছন্দ হয়েছে প্রেসিডেন্টের, তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাকে অভিনন্দন জানাতে চান।

এ-কথা শুনে অন্যান্য নৃত্যশিল্পীদের মুখ শুকিয়ে গেল, কারণ তারা বেশিরভাগই ভুক্তভোগী, এই ডাক-এর তাৎপর্য সম্পর্কে জানে। কয়েকটা মেয়ে তো কেঁদেই ফেলল। নার্গিসের গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে দিলেন ওদের নেতা, তার পিছু পিছু ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে এল সে, শিল্পীরা সবাই কাঠের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

কাছ থেকে বোগামুরাকে আগেও দেখেছে নার্গিস, ঠিক যেন একটা নধর শুয়োর। প্রকাণ্ড ধড়, বিশাল মাথা, অথচ চোখ দুটো একদম ছোট। অ্যান্টি রুমে ঢুকতেই হাসলেন তিনি, মুখের চর্বি আর মাংস কয়েক প্রস্থ ভাঁজ হয়ে গেল। মুখের রঙগুলো উল্কিচিহ্নের মত লাগল দেখতে। হড়বড় করে কিছু একটা বলে তাড়াতাড়ি বিদায় নিলেন ওদের নেতা, নার্গিসকে তার ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে।

বোগামুরা নির্লজ্জের মত তাকিয়ে আছেন দেখে গায়ের চাদরটা আরও ভাল করে জড়িয়ে নিল নার্গিস, প্রেসিডেন্ট কি বলেন শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে। বন্ধ দরজার বাইরে থেকে ভেসে আসছে অতিথিদের হাসাহাসি ও গ্লাসের টুংটাং আওয়াজ।

বোগামুরা বললেন, 'নাচটা দারুণ লাগল। আমি খুব খুশি হয়েছি।'

নার্গিস চুপ করে থাকল, ভয়ে দুরু দুরু করছে বুক। হঠাৎ আজ প্রথম সে উপলব্ধি করল, একা একটা মেয়ে হয়ে প্রতিশোধ নেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

'তুমি খুব সুন্দর,' আবার বললেন বোগামুরা, নিজের নিতম্বে হাত চাপড়ালেন। 'অন্য সব মেয়েদের মত এখানে তোমার চর্বি নেই। তাই তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, এত বেশি সুন্দর তুমি যে আমার ভেতর পশুটার ঘুম ভেঙে গেছে। তোমাকে পাবার জন্যে ছটফট করছে সে। আমি তাকে আটকে রাখতে পারছি না।'

নার্গিসের দিকে এগিয়ে এলেন বোগামুরা, তাঁর বুকের মেডালগুলো ঝুনঝুনির মত শব্দ করে উঠল। মুখোমুখি দাঁড়াতে, নার্গিসের চোখ বরাবর বোগামুরার কাঁধ দেখা গেল। প্রেসিডেন্টের গন্ধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল নার্গিস। সচেতন হয়ে উঠল চাদরের নিচে নিজের প্রায় নগ্ন শরীর সম্পর্কে।

'তুমি আমাকে ভয় পাচ্ছ,' হঠাৎ বললেন বোগামুরা।

নার্গিস কথা বলছে না দেখে আবার তিনি বললেন, 'কেউ আমাকে ভয় পেলে আমি খুশি হই।' তিনি তার বাহু স্পর্শ করলেন। নার্গিস যেন বৈদ্যুতিক ধাক্কা খেলো, শিউরে মত উঠল সে। 'আমি বুঝতে পারছি ছোঁয়াটুকু পেয়ে তোমার শরীরে আগুন জ্বলে উঠল।' তাঁর কপালের পাশে একটা শিরা বার কয়েক লাফাল। 'চাদরটা ফেলে দাও।'

নার্গিস নড়ল না।

বোগামুরা বললেন, 'তোমাকে আমি দেখতে চাই। চাদরটা সরাও।' হঠাৎ তাঁর গলা চড়ল, 'কি বলছি!'

কাঁপা হাতে চাদরটা ছেড়ে দিল নার্গিস। কাঁধ থেকে সেটা খসে পড়ল মেঝেতে। তেল মাখা শরীরটা কালো মার্বেলের মত চকচক করছে।

মনে হলো নার্গিসের প্রায় নগ্ন শরীরটা ক্ষুধার্ত দৃষ্টি দিয়ে লেহন করছেন বোগামুরা। তারপর তিনি তার স্তনের দিকে হাত বাড়ালেন। ঝট করে এক পা পিছিয়ে গেল নার্গিস।

'খবরদার!' চাপা স্বরে গর্জে উঠলেন বোগামুরা। 'নড়বে না।' সামনে বাড়লেন তিনি।

এরপর যা ঘটল, স্মরণ করতেও ভয় পায় নার্গিস। স্যাডিস্ট বোগামুরাকে পিশাচ বললেও কিছু বলা হয় না। নার্গিস তাঁর অশ্লীল নির্যাতন প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে দেখে হুংকার ছাড়তে শুরু করলেন তিনি, 'বেশ্যামাগী, আমাকে বাধা দেয়ার সাহস হয় তোর? নেচে নেচে কিভাবে হাজারটা পুরুষকে উত্তেজিত করিস, দেখিনি আমি?' ধাক্কা দিয়ে তিনি তাকে ডেস্কের ওপর ফেলে দিলেন।

এক ঘণ্টা নির্যাতন ভোগ করার পর রেহাই পেল নার্গিস। সেদিন সে নতুন করে প্রতিজ্ঞা করল, বোগামুরাকে খুন করবে। নিজে না পারে, অন্য কাউকে দিয়ে করাবে। সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে সে।

কাপড়চোপড় পরার পর বোগামুরা বললেন, 'তোমাকে আবার আমি ব্যবহার করতে পারি। এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে তোমাকে, তবে সন্দেহ নেই, তুমি আমাকে উত্তেজিত করতে পারো। যখনই প্রয়োজন মনে করব, ডেকে পাঠাব।' দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

এরপর আরও বহুবার ডাক পড়েছে, বাধ্য হয়ে যেতেও হয়েছে নার্গিসকে। কিন্তু প্রতিবারই সার্চ করা হয় তাকে, ফলে সঙ্গে কোন অস্ত্র নিতে সাহস হয় না তার। তাছাড়া, ইতিমধ্যে সে বিয়ে করেছে, একটা মেয়েও হয়েছে—স্বামী ও মেয়ের কথা ভেবে ঝুঁকি নিতে পারে না।

কিছুদিন থেকে একটা রুটিন ধরে ডাকা হয় তাকে। লুগাম্বায় সুন্দরী মেয়ে তো কম নেই, যাকে মনে ধরে তাকেই ডেকে পাঠান বোগামুরা। তারপরও মাসে দুই কি তিনবার নার্গিসকে তাঁর চাই।

বোগামুরা নার্গিসের ওপর দুর্বল, এ-খবর বিতাড়িত প্রেসিডেন্ট বাবা সালাহউদ্দিনের কানেও পৌঁছায়। এক সময় তাঁর এজেন্টরা যোগাযোগ করল, প্রস্তাব দিল সহযোগিতার। সানন্দে রাজি হলো নার্গিস, এতদিনে তার মনের আশা পূরণ হবার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

অবশেষে তার ফ্ল্যাটে পৌঁচেছে মবুতু।

'আপনার কি খিদে পেয়েছে?' জিজ্ঞেস করল নার্গিস। 'কিছু খাবেন?'

'হ্যাঁ, যা আছে তাই দাও,' বলল মবুতু। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোমার স্বামী কোথায়? বাচ্চাটা?'

'বোগামুরার নির্দেশে আমার স্বামীকে অন্য জেলায় বদলি করা হয়েছে। উনি বাচ্চাটাকেও আমার কাছে রাখতে নিষেধ করেছেন, বাধ্য হয়ে নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিয়েছি।' মবুতুকে বসিয়ে রেখে কিচেনে চলে গেল নার্গিস।

ব্যাগটা নিয়ে কাউচে বসল মবুতু। রাইফেলটা তিন ভাগে ভাগ করা। চেকোশ্লোভাকিয়ার তৈরি সেভেন-এমএম শাকা ওটা, সঙ্গে থারটি-পাওয়ার হর্সহেয়ার স্কোপ, ফাপা বাটে ছ'টা ডাম-ডাম বুলেট রাখা যায়। তিনশো গজ দূর থেকেও একটা মানুষকে পাকা তরমুজের মত ছত্রাখান করে দেয়া যায়।

তার দ্বিতীয় অস্ত্র সাইলেন্সার সহ একটা কোল্ট অটোমেটিক, কাছাকাছি দূরত্ব থেকে মারার জন্যে।

জুলু খুনীর শেষ অস্ত্র একটা গারট। সরু তার, লুকানো আছে একটা লেদার রিস্ট ব্রেসলেটে। অস্ত্রটা চোখের পলকে বের করতে পারে মবুতু।

দোরগোড়া থেকে তাকে দেখছে নার্গিস। চোখ তুলে তাকাল মবুতু।

কফি দরকার কিনা জিজ্ঞেস করল নার্গিস। কিচেনে ডিম, মাখন ও কফি থাকা লুগাম্বায় বিলাসিতা; বোগামুরার নির্দেশে রেশন কার্ড ইস্যু করায় এগুলো মাঝে মধ্যে পায় সে। লুগাম্বার বেশির ভাগ বাথরুমে সাবান নেই, তার বাথরুমে আছে। এশিয়ানদের তাড়িয়ে দেয়ার পর কফির উৎপাদন প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে।

'দুধ ছাড়া, খুব কড়া।'

মাখন দিয়ে ডিম ভেজেছে নার্গিস, গোগ্রাসে খেলো মবুতু। নিজের কাপে কয়েক ফোঁটা কনডেন্সড মিল্ক ঢালল সে, কাপের কিনারা দিয়ে তাকিয়ে থাকল লোকটার দিকে।

খাওয়া শেষ করে আবার চোখ তুলল মবুতু। নার্গিসের দৃষ্টি লক্ষ করছে সে। বলল, 'ধন্যবাদ।'

'আপনি মহৎ একটা কাজ করতে যাচ্ছেন, প্রার্থনা করি সফল হোন। যখন শুনলাম বোগামুরাকে খুন করতে আসছেন আপনি, আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলাম।'

নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মবুতু। মেয়েটা যে সুন্দরী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'তুমি আমাকে পরম উদ্ধারকর্তা বলে ধরে নিচ্ছ। কিন্তু আমি তা নই। এটা আমার পেশা।'

'তা সে যাই হোক, আমি আপনার জন্যে নামাজ পড়ব।'

'প্রার্থনার চেয়ে বেশি দরকার তোমার সাহায্য।'

'বলুন কি করতে হবে। যা বলবেন তাই করব আমি। আমি দেখতে চাই কসাইটা মারা গেছে।' নার্গিসের সারা শরীর ঘৃণায় কাঁপছে।

মবুতু ভাবল, তাহলে বোধহয় এই মেয়েটার কথাই শুনেছে সে, বোগামুরার শয্যাসঙ্গিনী।

যেন মবুতুর মনের কথা ধরতে পেরেই দাঁড়িয়ে পড়ল নার্গিস, ঘুরে দাঁড়াল, খুলে ফেলল কাফট্যান।

শোল্ডার ব্লেডের মাঝখান থেকে নিতম্বের মেদবহুল ভাঁজ পর্যন্ত কাটাকুটির দাগের

মত গিজগিজ করছে অসংখ্য ক্ষত, বেশিরভাগই পুরানো ও শুকনো, তবে কিছু কিছু তাজা ও দগদগে। আবার ঘুরল নার্গিস। 'দেখলেন তো?'

'এর জন্যে বোগামুরা দায়ী?' নরম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মবুতু।

'উনি একটা জানোয়ার,' হিসহিস করে বলল নার্গিস। 'ব্যথা দিয়ে আনন্দ পান। নিজেই বলেন, কোন মেয়ে চিৎকার না করলে তাঁর ভাল লাগে না, মনে হয় মেয়েটা তাঁকে ঠকাচ্ছে। প্রেম-ভালবাসা বা দয়া-ধর্ম কি জিনিস, তিনি জানেন না। উপায় থাকলে আমি নিজেই তাঁকে খুন করতাম।' আবার কাপড় পরল সে। 'আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার সময় সার্চ করা হয়। লুকিয়ে অস্ত্র নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়...।'

'কিভাবে নিয়ে যাওয়া হয়?'

'একজন ড্রাইভার আমাকে নিতে আসে। সরাসরি কমান্ড পোস্টে নিয়ে যায়।'

'প্রতিবার একই লোক?'

'না। একই লোক কয়েকবার নিয়ে গেছে, তবে কোন ছক ধরে নিয়মিত নয়।'

'কমান্ড পোস্টে প্রতিবার কি একই কামরা ব্যবহার করো?'

মাথা ঝাঁকাল নার্গিস, তার কৌতূহল হচ্ছে। 'হ্যাঁ। বোগামুরা অন্যান্য মেয়েদের হয়তো অন্য কোথাও নিয়ে যান, তবে তাদের কথা আমার জানা নেই।'

'আচ্ছা।' ভুরু কুঁচকে চিন্তা করছে মবুতু। 'আবার কবে যাবে তুমি?'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল নার্গিসের। 'সময়টা দেখতে দেখতে চলে আসে। ড্রাইভার আমাকে নিতে আসবে আজ বিকেলে।'

এমএজেড ট্র্যান্সপোর্টার-এর একটা কনভয় ঢুকছে রাজধানী কেনডুরায়, প্রতিটি ট্র্যান্সপোর্টার-এ একটা করে টি-ফিফটিফোর ব্যাটল ট্যাংক। সোভিয়েত রাশিয়ার একটা জাহাজ থেকে মোম্বাসা বন্দরে খালাস করা হয়েছে ওগুলো। সোভিয়েত সরকার এগুলো লুগাম্বার কাছে বিক্রি করেছে একজন এজেন্টের মাধ্যমে, তার নাম আইজ্যাক ময়নিহান, সে একজন ইসরায়েলি। সোভিয়েত সরকার টেকনিশিয়ান দিয়েও সাহায্য করছে—একজন সার্জেন্ট, নাম ভ্লাদিমির প্রোবিন; তার সহকারীর নাম লুদভিক মাস্তায়েভ। সহকারীকে নিয়ে সামনের ট্র্যান্সপোর্টারে রয়েছে প্রোবিন। কনভয়ের সঙ্গে আসেনি ময়নিহান, মোম্বাসা থেকেই বিদায় নিয়েছে সে।

গায়ে ধাক্কা দিয়ে সহকারীর ঘুম ভাঙাল সার্জেন্ট। 'মাস্তায়েভ, এত আওয়াজ আর ঝাঁকির মধ্যে তুমি ঘুমাও কিভাবে বলো তো! ওঠো, আমরা পৌঁছে গেছি।'

সিধে হয়ে বসে উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে বাইরে তাকাল মাস্তায়েভ। ওদের সামনে শহরের আলোগুলোকে জোনাকি পোকার মত মিটমিট করতে দেখা যাচ্ছে। উইং মিররে তাকাতে কনভয়ের বাকি ট্র্যান্সপোর্টারের চোখ ধাঁধানো হেডলাইট দেখতে পেল। হাইওয়ের ওপর মালবাহী ট্রেনের মত লম্বা লাগছে কনভয়টাকে। 'দেখা যাচ্ছে সময় মতই পৌঁচেছি, তাই না?' হাতঘড়ির ওপর চোখ রেখে বলল সে।

'কেনিয়ানরা নাইরোবিতে দেরি করিয়ে না দিলে আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছুতাম। ওখানে আমাদের চার ঘণ্টা নষ্ট হয়েছে।'

'এক মিনিট!' হঠাৎ উত্তেজিত গলায় বলল মাস্তায়েভ। রাস্তার সামনের দিকে একটা হাত তুলল সে। 'কি ঘটছে বলুন তো?'

হাইওয়ের এক মাইল সামনে কে যেন একটা আলো নাড়ছে। অস্পষ্টভাবে ভোঁতা একটা আকৃতি দেখা গেল, সম্ভবত মিলিটারি ট্রাক। ইসরায়েলি ড্রাইভারও অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে ওদিকে। দেখে মনে হলো রোডব্লক।

'লুগাম্বায় আসার পর তো কোন ঝামেলা হবার কথা নয়,' বলল প্রোবিন। 'ক্যু হয়নি তো? ড্রাইভার, স্পীড কমাও। ব্যাপারটা আগে বুঝতে হবে।'

আরও খানিক সামনে যাবার পর দেখা গেল সাত-আটজন সৈনিক হাইওয়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, ভঙ্গি দেখে মনে হলো কনভয়কে সামনে বাড়তে দেবে না। প্রোবিন আপনমনে গালাগালি দিচ্ছে। মাস্তায়েভ উত্তেজিত।

এমএজেড ট্র্যান্সপোর্টার যত এগিয়ে আসছে ততই ঘন ঘন হাতের সিগন্যাল ল্যাম্পটা নাড়ছে একজন কর্পোরাল। অবশেষে তার কাছ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে প্রথম ট্র্যান্সপোর্টার দাঁড়িয়ে পড়ল, ব্রেক লক হবার সময় বাতাস বেরিয়ে আসার শব্দ হলো হিসহিস করে। ক্যাব-এর দরজা খুলল প্রোবিন। তার নিচে, টারমাকে, আর্মি ইউনিফর্ম পরা সাত-আটজন কালো লোক প্রকাণ্ড ট্র্যান্সপোর্টার আর তেরপলিন দিয়ে ঢাকা কার্গোর দিকে তাকিয়ে আছে।

'তোমাদের মধ্যে চার্জে আছে কে?' লোকগুলোর দিকে চোখ গরম করে তাকাল প্রোবিন।

একটা ট্রুপ ক্যারিয়ারের পিছন থেকে বেরিয়ে এল মধ্য বয়স্ক, শক্ত-সমর্থ এক লোক, দাঁড়াল ল্যাম্পের আলোর সামনে। 'আমার অনুমান ভুল না হলে আপনি কমরেড প্রোবিন। আশা করি পথে আপনাদের কোন অসুবিধে হয়নি।' চওড়া হাসি ফুটল তার মুখে, একটা হাত উঁচু করল—করমর্দন করতে চাইছে।

হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল প্রোবিন। সে প্রশ্ন করেছে ইংরেজিতে, অথচ লোকটা জবাব দিল রুশ ভাষায়।

'আমার নাম সের্গেই বেকভ,' অ্যামব্যাসাডর বললেন। 'লুগাম্বায় সোভিয়েত রাশিয়ার আবাসিক প্রতিনিধি। ওয়েলকাম টু লুগাম্বা।'

কর্পোরাল লুকু কাত হয়ে রয়েছে, উড়ে গেছে মাথার অর্ধেক। আর নাফতা পড়ে আছে চিৎ হয়ে, প্রায় উলঙ্গ।

নাফতার খুলি নড়ছে।

পিঁপড়ে। পিলপিল করে ঢুকে পড়ছে ঘাড় বেয়ে চুলের ভেতর। আরও কি যেন একটা নড়ছে লাশের পায়ে। হুল খাড়া করে আছে, একটা কাঁকড়া বিছে, উরু বেয়ে উঠে এসে নিতম্বের খাঁজে হারিয়ে গেল।

বোতাম টিপে টর্চ নেভাল কর্পোরাল মেকানাকি, চিন্তিতভাবে তাকিয়ে থাকল অন্ধকারে। এখনও বন্য প্রাণীরা আসেনি, তবে লাশের গন্ধ পেয়ে যে-কোন মুহূর্তে বুনো কুকুর বা শিয়ালের দল চলে আসবে।

দেখলে গুলির ক্ষত চিনতে পারে মেকানাকি। সাসু অ্যাসাসিনেশন স্কোয়াড কাজ সেরে চলে যাবার পর বহুবার তাকে স্পটে যেতে হয়েছে। তার উদ্বেগের কারণ হলো, শহর থেকে এত দূরে এ-ধরনের ঘটনা ঘটার কথা নয়।

লুকুর ওপর ঝুঁকে লাশটা চিৎ করল তার সঙ্গী। রক্ত ইতিমধ্যে জমাট বেঁধে গেছে।

খুলির বিশাল ক্ষতে ধুলো, কাঁকর, পাতা ও ডাল সেঁটে রয়েছে। হাড়গুলো সাদা।

ইতিমধ্যে আশপাশটা একবার খুঁজে দেখা হয়েছে। ল্যান্ড রোভারটা পাওয়া যায়নি। টর্চের আলোয় চাকার দাগ স্পষ্ট ধরা যায়। পশ্চিম অর্থাৎ রাজধানী কেনডুরার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওটাকে।

ব্যাপারটা মিলছে না। লুগাম্বার কোন লোক যদি সামরিক বাহিনীর কোন পেট্রলের ওপর হামলা করে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সীমান্ত পেরিয়ে দেশ ত্যাগ করবে, সেক্ষেত্রে ল্যান্ড রোভারটা যাবার কথা উল্টো দিকে। তাছাড়া, খুনের ধরন দেখেই বোঝা যায় পেশাদার কারও কাজ। নাফতার মাথার পিছনের গর্তটা অন্তত সে-কথাই বলে। লাশটাই বা বিবস্ত্র করা হলো কেন?

সঙ্গীকে ডেকে নিল মেকানাকি, দু'জন মিলে আরও বড় একটা এলাকা সার্চ করল এবার।

শুকনো একটা নালার ভেতর মাজদা জীপটা পেল ওরা। ভাঙাচোরা গাড়িটায় কোন আইডেনটিফিকেশন নেই। রেজিস্ট্রেশন প্লেট সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

পরিচয়বিহীন একটা গাড়ি, অচল ও পরিত্যক্ত। একটা বর্ডার পেট্রলের দুই সদস্য খুন হয়ে গেল, তাদের বাহন ল্যান্ড রোভার গায়েব।

ব্যাপারটা ঠিক কি ঘটেছে বুঝতে না পারলেও ইতিকর্তব্য স্থির করতে সময় নিল না মেকানাকি।

ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ করল সে।

প্রকাণ্ড ঈগলটাকে মাথার ওপর উড়তে দেখছে রানা, মাথায় লাল ঝুঁটি আছে, দেখে মনে হয় মুকুট পরানো হয়েছে। স্থানীয় লোকেরা 'আকাশের চিতা' বলে ওটাকে।

বেলা এগারোটা, আগুনের মত তেতে উঠেছে রোদ। এয়ারস্ট্রিপের ওপর পাহাড়ের মাথায় রোদ যেন কাঁপছে। একশো গজ পিছনে সেবাশ্রমের সাদা ভবন তাপদগ্ধ পরিবেশে মরুভূমির মরীচিকার মত ঘন ঘন জায়গা বদল করছে বলে মনে হলো। জাল দিয়ে ঘেরা ছোট একটা জায়গায় কয়েকটা মুরগী দেখা যাচ্ছে, ছাগলগুলোর পাশে জমিন থেকে খাবার খুঁটে খাচ্ছে। তরকারির খোসা ও খানিকটা উচ্ছিষ্ট নিয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল সিস্টার আসমা, তাকে দেখেই ক্ষুধার্ত শিশুর মত চেঁচামেচি জুড়ে দিল ছাগলগুলো।

'রানা, তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারি?' এগিয়ে এলেন ড. গনি।

হেসে ফেলল রানা। 'জানি আপনি আসবেন। ভাবছিলাম এত দেরি করছেন কেন। বসুন, বসুন।'

রানার পাশে গাছের ছায়ায় বসে পড়লেন ড. গনি।

ঘাড় ফিরিয়ে পঁচিশ গজ দূরে তাকাল রানা, একা একটা গাছের তলায় বসে সিস্টার আসমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে জাফর। 'জামিল আর ফরহাদকে দেখছি না,' বলল ও। 'ওরা দু'জন কি করছে বলুন তো?'

'জামিলকে দেখে এলাম তোমাদের অস্ত্রগুলো চেক করছে,' বললেন ড. গনি। 'আর ফরহাদ মসজিদে।'

'এই সময় মসজিদে? নামাজ পড়ছে নাকি?' রানা অবাক।

'না, এমনি বসে আছে।' নড়েচড়ে আরাম করে বসলেন ড. গনি। 'যে-কথা বলতে এসেছি। শোনো, মাত্র কালই মোবারুতে আমি গিয়েছিলাম···।'

ছাগলগুলোকে খাওয়াতে বসে সিস্টার আসমা অনুভব করল কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে। ঘুরল সে। সেই সুদর্শন যুবক, ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসি লেগে থাকে।

চোখাচোখি হতে একটা হাত নাড়ল জাফর, গাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে গেট খুলে ঢুকে পড়ল ছোট্ট খোঁয়াড়ে। গেট বন্ধ করে ঘুরতেই ছাগলগুলো ছুটে এল তার দিকে, ধরে নিয়েছে খাবার পাওয়া যাবে। ওগুলোর নরম ঘাড়ে হাত বুলাল জাফর, আদর করল।

'দেখা যাচ্ছে আপনাকে ওদের খুব পছন্দ হয়েছে,' হেসে ফেলে বলল আসমা।

'আমরা যখন খুব ছোট ছিলাম, আমি আর আমার বোন,' বলল জাফর, 'দু'জন মিলে কয়েকটা ছাগল আর মুরগী পালতাম। একটা নেশার মত হয়ে গিয়েছিল, ওদেরকে ছেড়ে ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করত না।'

শেষ দিকে জাফরের গলা নিস্তেজ হয়ে এল দেখে বিস্মিত হয়ে তাকাল আসমা, দেখল তার চোখে বিষাদের ছায়া পড়ল হঠাৎ। 'কি ব্যাপার?' তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল সে।

'কিছু না, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল।' ম্লান হাসল জাফর, কাছ থেকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে মেয়েটাকে। কিশোরীই বলতে হবে, যথেষ্ট লম্বা হলেও যৌবন এখনও পুরোপুরি ভর করেনি শরীরে। একমাত্র বোন জয়নাবের কথা মনে পড়ে গেছে তার।

মিশরে জন্ম ওদের, বাবা ছিলেন পুলিস অফিসার। হার্ট অ্যাটাকে বাবা মারা যাবার পর এতিম হয়ে যায় ওরা, মা মারা গিয়েছিলেন দু'বছর আগেই। জয়নাব ছিল বড়, তখন তার বয়েস আঠারো, সবে মাত্র উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছে। জয়নাবের চেয়ে দু'বছরের ছোট জাফর, সে-বছরই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। পুলিস কমিশনার স্বয়ং সুপারিশ করায় পুলিস হেডকোয়ার্টারের রেকর্ড ডিপার্টমেন্টে কেরানীর একটা চাকরি পেল জয়নাব। পরে সে ট্রেনিং নিয়ে পুলিসের আর্মড ফোর্সের মহিলা শাখায় যোগ দেয়।

বি. এ. পাস করে জাফরও পুলিস বাহিনীতে যোগ দিল। তিন বছর পর জাতিসংঘের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনে মিশরের প্রতিনিধিত্ব করে ওরা দুই ভাই-বোন। সেই সূত্রেই রানার সঙ্গে পরিচয়। সে সময় পশ্চিম জার্মানীতে অ্যান্ড্রেয়াস বাদের ও উলরিখ মেইনহফ ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে, ওদেরকে দমন করতে না পেরে জার্মান সরকার জাতিসংঘের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের সাহায্য কামনা করে। ছোট একটা দলের সঙ্গে ফ্রাঙ্কফুর্টে পৌঁছায় জয়নাব, জাফর রানার সঙ্গে থেকে যায় নিউ ইয়র্কে।

সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও জয়নাবের গাড়িতে সন্ত্রাসীরা টাইম বোমা ফিট করে রাখে। গাড়িতে ওঠার পর স্টার্ট দিতে যাবে জয়নাব, এই সময় তার সন্দেহ হয়। স্টার্ট না দিয়ে দরজা খুলে নেমে পড়ে সে, হামলাটা ঠিক তখনই হয়। রাস্তার তিন দিক থেকে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ শুরু করে বাদের-মেহনহফ বাহিনীর লোকজন।

বোনের এই মৃত্যু প্রতিশোধপরায়ণ করে তোলে জাফরকে। কিন্তু জয়নাব মারা যাওয়ায় মিশর সরকার অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন থেকে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাহার করে নেয়, জাফরকে কায়রোয় ফিরে যেতে বলা হয়। জাফর সিদ্ধান্ত নেয় সে ফিরবে না। চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে রানার কাছে আশ্রয় নিল জাফর। সং কয়েকটা ট্রেনিং কোর্স-এর ব্যবস্থা করল রানা, তারপর তাকে পাঠিয়ে দিল লেবাননে। ওখানেই জামিল ও ফরহাদের সঙ্গে তার পরিচয়।

জয়নাবের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ পেল জাফর আরও দেড় বছর পর। রানার সঙ্গে সে তখন ফ্রাঙ্কফুর্টেই। পঁচিশজন স্কুল ছাত্র সহ একটা বাস হাইজ্যাক করে বাদের-মেইনহফ, জিম্মিদের ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে দশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাবি করে। অ্যান্টি-টেরোরিস্ট এক্সপার্ট হিসেবে রানার সাহায্য চায় জার্মান সরকার। টেরোরিস্টদের সঙ্গে টেলিফোনে মুক্তিপণ নিয়ে আলোচনা করল রানা। জার্মান সরকার টাকা দিতে রাজি হলো। দুটো বড় আকৃতির লেদার সুটকেসে ভরা হলো ডলার, অনুরোধ করায় কাজটার দায়িত্ব জাফরকেই দিল রানা।

নির্দিষ্ট সময় একটা নির্জন হাইওয়েতে টাকা নিয়ে হাজির হলো রানা ও জাফর। টাকা নেয়ার জন্যে একটা মাইক্রোবাসে চড়ে এল টেরোরিস্টরা। সংখ্যায় তারা আটজন ছিল, সবাই সশস্ত্র। তাদের দাবি অনুসারে হেলিকপ্টারের ব্যবস্থাও করেছে জার্মান সরকার। তিন মাইল দূরে ফাঁকা একটা মাঠে অপেক্ষা করছে সেটা। মাইক্রোবাসের পিছু পিছু এল বাসটা, পঁচিশজন ছাত্রকে নিয়ে। কোন রকম চালাকি করা হয়নি, টাকা ভর্তি ব্যাগগুলো মাইক্রোবাসে তুলে দিল জাফর। মাইক্রোবাস ছুটল মাঠের দিকে। জাফরকে নিয়ে বাসে চড়ল রানা।

এক মাইল পর্যন্ত এগোতে পারল বাস। জোড়া সুটকেসের ফলস বটম বিষাক্ত গ্যাস ভরা ছিল, হস্তান্তরের সময় হাতলের সঙ্গে লুকানো খুদে একটা বোতামে চাপ দিয়েছিল জাফর, ফলে সুচের মত সরু কয়েকটা ফুটো দিয়ে মাইক্রোবাসের ভেতর গ্যাস বেরুতে শুরু করে। মাইক্রোবাসের জানালা ছিল বন্ধ, টেরোরিস্টদের সঙ্গে গ্যাস-মাস্ক ছিল না, দু'মিনিটের মধ্যে ড্রাইভার সহ সবাই জ্ঞান হারায়। হাইওয়ের পাশের একটা খাল থেকে উদ্ধার করা হয় গাড়িটা, টেরোরিস্টদের একজনও বাঁচেনি। অজ্ঞান অবস্থায় পানিতে ডুবে মারা যায় তারা।

এ-সব কথা সিস্টার আসমার জানার কথা নয়, সে শুধু লক্ষ করল হঠাৎ যেন অন্য কোন জগতে ফিরে গেছে সুদর্শন তরুণটি। বিরক্ত করা উচিত হবে না ভেবে খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে গেল সে।

আসমা চলে যাচ্ছে, হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে তার দিকে তাকাল জাফর। পকেট হাতড়ে একটা চুরুট বের করে ধরাল সে। বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে বসল, অপেক্ষা করছে আবার কখন আসবে মেয়েটা।

ফাঁকা ওয়ার্ডে ওদের সবাইকে নিয়ে বসল রানা। 'তোমরা তৈরি সবাই?' জানতে চাইল ও। 'কারও যদি কোন সমস্যা থাকে, এখনই বলে ফেলো। পরে আর সময় পাওয়া যাবে না।'

'আমি তৈরি, রানা,' বলল জামিল, তার হাতে সিএইচ প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের

একটা টুকরো রয়েছে।

'জাফর?'

মাথা নাড়ল জাফর। 'কোন সমস্যা নেই, মাসুদ ভাই।' ব্রাউনিং-এর ম্যাগাজিনে শেল ভরছে সে।

ফরহাদের দিকে তাকাল রানা, সামান্য হেসে মাথা নাড়ল সে।

'ড. গনির সঙ্গে কথা হয়েছে আমার,' বলল রানা। 'উনি আমাকে মাবোরুর সর্বশেষ পরিস্থিতি জানালেন। কাল সকালের দিকে ওখানে তিনি গিয়েছিলেন, জায়গাটার লেআউট সম্পর্কে ধারণা নিয়ে এসেছেন।'

'ড. গনি মাবোরুতে গিয়েছিলেন?' জামিল বিস্মিত। 'আনিস সিদ্দিকীকে দেখেছেন উনি?'

'হ্যাঁ, দেখেছেন, তবে মাত্র কয়েক সেকেন্ড।'

'উনি মাবোরুতে গিয়েছিলেন কেন?'

'ডসের লোকজন এখানকার মসজিদের ইমাম সাহেবকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যায় জেরা করার জন্যে,' বলল রানা। 'খবর পেয়ে নিজেই ছুটে যান ড. গনি, ইমাম সাহেবকে ছেড়ে দেয়ার দাবি জানান। মাবোরুতে ছ'ঘণ্টা থাকতে হয়েছিল তাঁকে, অবশেষে ইমাম সাহেবকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় ওরা। অফিসে অপেক্ষা করার সময় গার্ডদের হাতে কিছু গুঁজে দিয়ে ভেতরে ঢোকার সুযোগ করে নেন তিনি, তখনই আনিস সিদ্দিকীকে দেখেন।'

'ও খোদা!' বলল ফরহাদ। 'গার্ডদের হাতে উনি কি গুঁজে দিলেন?'

'লুগাম্বায় এখন এমন অবস্থা, যে-কোন লোককে যে-কোন জিনিস ঘুষ দিতে পারো তুমি,' বলল জামিল। 'তবে আমার ধারণা, ড. গনি ওদেরকে ঘুষ দেয়ার জন্যে হাসপাতাল থেকে কিছু ড্রাগস নিয়ে গিয়েছিলেন। এই ধরো মরফিন ট্যাবলেটের একটা বোতল আর বিশ-পঁচিশটা অ্যাসপিরিন।'

'আনিস সিদ্দিকীকে কেমন দেখলেন উনি?' জানতে চাইল জাফর। 'তিনি কি হাঁটাচলা করতে পারছেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'সেটা আমরা জানতে পারব ওখানে যাবার পর। ড. গনি তাঁকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় দেখেছেন। ভয়ে হোক বা ক্লান্তিতে, একেবারে নেতিয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক।'

'একে বুড়ো মানুষ, তার ওপর বিনা অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে, মুষড়ে পড়ারই কথা,' মন্তব্য করল ফরহাদ।

'আমরা দেরি করলে মারা যেতে পারেন ভদ্রলোক,' বলল রানা। 'এখানে আমাদের আরও একটা রাত থাকাও নিরাপদ নয়। আমরা রওনা হব আজ সন্ধের পরপরই।'

দুই

সারা রাত ঘুমাননি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইকেল ল্যাক্স, সরকারী বাসভবনের ড্রইংরুমে পায়চারি করছেন অস্থিরভাবে। জানালার সামনে থেমে পর্দা সরিয়ে দিলেন, ভোরের অস্পষ্ট আলোয় বাগানের গাছপালার ভেতর দিয়ে দূরে তাকালেন তিনি। সারা শরীর

ঝিমঝিম করছে, যদিও ক্লান্তবোধ করছেন না। নেশা হবার মত না হলেও, মাঝে মধ্যে দু'এক ঢোক করে হুইস্কি খেয়েছেন, তাছাড়া উত্তেজিত অবস্থায় থাকলে মানুষ সহজে ক্লান্ত হয় না।

মাথা খারাপ হবার যোগাড় হয়েছে তাঁর। অনেক বুদ্ধি ও কাঠ-খড় পুড়িয়ে সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছেন তিনি, অবশেষে সাফল্য নির্ভর করছে একটা ফোন কলের ওপর। কিন্তু রাত ভোর হয়ে গেল, ফোনটা আসছে না। ভাবলেন আরেকবার কেনিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন কিনা। কিন্তু না, তাঁকে যা বলার বলেছেন তিনি, নতুন আর কিছু বলার নেই। কূটনৈতিক শিষ্টাচারের একটা নির্দিষ্ট বিধিমালা আছে, সেটা লঙ্ঘন করলে হিতে বিপরীতও ঘটে যেতে পারে। উপায় নেই, তাঁকে আরও অপেক্ষা করতে হবে।

সকাল সাতটায় প্রত্যাশিত ফোন কলটা এল। কথা বলার পর রিসিভার রেখে দিয়ে আবার তুললেন তিনি, ডায়াল করলেন তাঁর সেক্রেটারির নম্বরে। 'প্রাইম মিনিস্টারকে চাই আমার। কোথায় আছেন বা কি করছেন, এ-সব আমি শুনতে চাই না। তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দাও—জলদি, এখুনি!'

পায়চারির গতি বেড়ে গেল মাইকেল ল্যাক্সের, তবে এবার শুধু উত্তেজনায় নয়, আনন্দেও। তাঁর এক পরম শত্রুকে খতম করার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। সফল হতে যাচ্ছে তাঁর পরিকল্পনা। দীর্ঘ অনেকগুলো বছর এ-ধরনের একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। দুনিয়াতে মাত্র একজন লোক আছে যে বেঁচে থাকলে তাঁর অপরাধ ফাঁস হয়ে যাবার ভয় আছে, সেই লোককে কৌশলে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। তাঁর মনে হলো, পুনর্জীবন ফিরে পাচ্ছেন তিনি।

দু'মিনিট পর রিঙ হলো আবার। ছোঁ দিয়ে রিসিভার তুললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সেক্রেটারি বলল, 'প্রাইম মিনিস্টার লাইনে রয়েছেন, স্যার।'

প্রধানমন্ত্রী সদ্য ঘুম থেকে উঠেছেন, অসম্ভব ভারি লাগল তাঁর গলা, 'যা বলার তাড়াতাড়ি বলো, মাইকেল। আমি এখনও প্রাত্যহিক কর্ম সারিনি...।'

'বিকট একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে,' বাধা দিয়ে বললেন ল্যাক্স। 'আমি অসুস্থবোধ করছি। ব্যাপারটা মি. সিদ্দিকীকে নিয়ে।'

অপরপ্রান্ত থেকে প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না। বোধহয় চিন্তা করছেন আনিস সিদ্দিকীকে নিয়ে নতুন আর কি সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। তারপর তাঁর বুক কেঁপে উঠল। তবে কি ভদ্রলোককে মেরে ফেলা হয়েছে? 'কি সমস্যা?' ফিসফিস করে জানতে চাইলেন তিনি।

'এইমাত্র নাইরোবি থেকে একটা ফোন কল পেলাম আমি। বলা হচ্ছে, আমাদের পক্ষ নিয়ে জোরাল ভূমিকা রেখেছেন প্রেসিডেন্ট নাই। তিনি আনিস সিদ্দিকীকে ছেড়ে দিতে রাজি করিয়েছেন বোগামুরাকে।'

অপরপ্রান্তে কোন সাড়া-শব্দ নেই।

ল্যাক্স ভাবলেন যোগাযোগ কেটে দেয়া হয়েছে। শুধু স্ক্র্যাম্বলারে লাল আলো জ্বলছে দেখে বোঝা যাচ্ছে লাইন বিচ্ছিন্ন হয়নি।

'ওহ্ গড!' অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলেন প্রধানমন্ত্রী। 'হোয়াট দা হেল ইজ গোইং অন?'

'ঘটনা হলো, ওএইউ সদস্যদের তরফ থেকে বোগামুরাকে একটা লিখিত চরমপত্র দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট নাই। তার সারমর্ম হলো, আগামী বছরের জন্যে ওএইউ-এর চেয়ারম্যান হতে চাইলে মি. সিদ্দিকীকে অবশ্যই বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হবে। চরমপত্রে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এতে যদি বোগামুরা রাজি না হন তাহলে ট্র্যানজিট সুবিধে প্রত্যাহার করে নেবে কেনিয়া, ফলে লুগাম্বার আমদানি করা কোন পণ্য কেনিয়ার ওপর দিয়ে আসতে পারবে না। ট্যাংকের প্রথম চালানটা মোম্বাসায় খালাস করার পর লুগাম্বার উদ্দেশে রওনা হয়েছিল ঠিকই, তবে মাঝপথে আটকে দেয়া হয়। পরে অবশ্য এবার শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে 'ছেড়ে দেয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। এবারই শেষ, পরের চালানগুলো মোম্বাসায় খালাস করতেই দেয়া হবে না।'

'বোগামুরা এই শর্তে রাজি হয়েছেন?' জানতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী।

'চেয়ারম্যানশিপ তাঁর একান্ত দরকার। কনফারেন্সের পেছনে বিস্তর টাকা খরচ করেছেন তিনি। কেনডুরায় বিশাল একটা সেন্টার পর্যন্ত বানিয়েছেন। ওএইউ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবে, এ তিনি চাইতেই পারেন না। আমি বলব, ওরা মোক্ষম একটা অস্ত্র ছেড়েছেন, নতি স্বীকার না করে বোগামুরার উপায় নেই।'

'আর তার ফলে মারাত্মক একটা বিপদে পড়ে গেছি আমরা,' কঠিন শোনাল প্রধানমন্ত্রীর গলা। 'তুমি আমাকে বলেছ, লুগাম্বায় ঢোকার পর রেসকিউ টীমের সঙ্গে তোমার বা আর কারও কোন যোগাযোগ থাকবে না। সত্যিই কি তাই? ওদেরকে ফিরে আসতে বলার কোন উপায়ই নেই?'

'ঈশ্বরই জানেন,' হতাশ ও বিষণ্ন সুরে বললেন ল্যাক্স। 'ইতিমধ্যেই হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'ফাকিং হেল!'

'এত ঘাবড়াবার কিছু নেই, আমি দেখছি কি করা যায়,' আশ্বাস দিয়ে বললেন ল্যাক্স।

'খবরটা কোন ভাবেই ফাঁস হওয়া চলবে না, মাইকেল। খবরটার অংশবিশেষও নয়। আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ তো?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'যখন যা খবর পাও সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাকে,' বললেন প্রধানমন্ত্রী।

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আবার ডায়াল করলেন ল্যাক্স।

সেই নির্জন বাড়িটায় আবার হাজির হলো রবার্ট পিল, মার্সেনারি এজেন্ট। ছদ্মবেশ নিয়ে আগে থেকেই তার জন্যে ওখানে অপেক্ষা করছেন মাইকেল ল্যাক্স। পিল তাঁকে উইলিয়াম ক্লিপটন হিসেবে চেনে।

সব শোনার পর পিলের মাথায় রক্ত চড়ে গেল, বিস্ফোরিত হলো সে। 'কি বলছেন! কিভাবে ওদেরকে আমি ফিরিয়ে আনব! এরই মধ্যে লুগাম্বায় ঢুকে পড়েছে ওরা! সম্ভবত এই মুহূর্তে ছিনতাই করছে আনিস সিদ্দিকীকে! মনে করুন চাঁদের উল্টোপিঠে রয়েছে ওরা...।'

কিছু একটা ব্যবস্থা করা হবে, এ-ধরনের একটা ফাঁপা আশ্বাস দিয়ে পিলকে বিদায়

করলেন ল্যাক্স, সে চলে যাবার বিশ মিনিট পর দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে চলে এলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার আগে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি জেমস কালভিনের সঙ্গে বসলেন প্রথমে।

ইতিমধ্যে খবরটা জানা হয়ে গেছে কালভিনের। ল্যাক্স তাকে বললেন, 'কি করা উচিত তুমি একটা বুদ্ধি দাও দেখি।'

'সমাধান তো পরিষ্কার, স্যার,' চেহারা থমথম করছে, ভারি গলায় বলল কালভিন।

চোখে প্রশ্ন, তাকিয়ে থাকলেন ল্যাক্স, যেন কালভিনের কথা বুঝতে পারছেন না।

'মি. বোগামুরাকে আমরা সাবধান করে দেব,' বলল কালভিন।

'ওহ্, মাই গড!' আঁতকে উঠলেন ল্যাক্স—ভালই অভিনয় করছ, মনে মনে নিজের প্রশংসা করলেন তিনি।

'এই একটা কাজই করার আছে আমাদের, স্যার,' বলল কালভিন। 'মি. বোগামুরাকে আমরা বলব, লুগাম্বায় একটা টীম ঢুকেছে, মি. সিদ্দিকীকে ছিনিয়ে আনতে চায় তারা।'

'তারমানে টীমের সব ক'জন লাশ হয়ে যাবে,' বললেন ল্যাক্স।

কালভিন বলল, 'প্রথম থেকেই তো ব্যাপারটা পরিষ্কার ছিল, নয় কি, এটা একটা সুইসাইড মিশন?'

বিচলিত দেখাচ্ছে পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে। 'তা ছিল, কিন্তু…।'

'ভেবে দেখেছেন, স্যার, মি. বোগামুরাকে সতর্ক না করলে তার পরিণতি কি হতে পারে? কিছু লোককে রক্তে গোসল করানো হবে। প্রেসিডেন্ট নাই দরজা খুলেছেন। তাঁর মুখের ওপর সেটা বন্ধ করে দেয়া উচিত হবে না।'

ল্যাক্স বললেন, 'কে জানে, হয়তো এরই মধ্যে দেরি হয়ে গেছে। হয়তো ইতিমধ্যে আনিস সিদ্দিকীকে ছিনিয়ে নিয়েছে ওরা।'

কালভিন মাথা নাড়ল। 'আমার সন্দেহ আছে। লুগাম্বা ইংল্যান্ডের চেয়ে তিন ঘণ্টা এগিয়ে আছে, তারমানে ওখানে এখন দিন। অন্ধকার না হলে কাজটায় ওরা হাত দেবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া, কিছু ঘটলে অ্যাকটিং হাই কমিশনার ডেভিড হোপ যোগাযোগ করতেন।'

'তারমানে…' শুরু করলেন ল্যাক্স।

'আমাদের হাতে নষ্ট করার মত একটা সেকেন্ডও নেই।'

'আমি তাহলে প্রাইম মিনিস্টারকে সরাসরি লুগাম্বায় ফোন করতে বলি,' ম্লান গলায় বললেন ল্যাক্স, চোখ মিটমিট করলেন বারকয়েক। 'কি জানো, জেমস, ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি এ-ধরনের কিছু ঘটতে পারে। আশ্চর্য, বোগামুরাকে আমরা সাবধান করে দিয়ে বলছি আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে! অবিশ্বাস্য, স্রেফ অবিশ্বাস্য! রাজনীতি মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়, দেখো!'

'বরং ভাগ্যের প্রশংসা করতে হয় যে সময়মত খবরটা পেয়েছি আমরা,' কালভিন বলল। 'অন্তত সাবধান করা হলে মি. বোগামুরা সন্দেহ করতে পারবেন না যে রেসকিউ টীমের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক আছে বা ছিল। ভাল কথা, স্যার, রেসকিউ টীমে যারা আছে তাদের মধ্যে কেউ ব্রিটিশ নাগরিক নেই তো?'

'ঠিক জানি না,' বললেন ল্যাক্স। এই সময় নিজেকে তিনি মনে করিয়ে দিলেন,

রবার্ট পিলকে বাঁচিয়ে রাখাটা বোকামি হবে। 'বোধহয় নেই। পিল আমাকে কথা দিয়েছিল, টীমের সদস্যরা সবাই কালো হবে।' তিনি যে শর্ত দিয়েছিলেন টিমে মাসুদ রানাকে অবশ্যই থাকতে হবে, এ-কথা সযত্নে চেপে গেলেন।

ওদিকে লুগাম্বায়, আনিস সিদ্দিকীর ভাগ্য নতুন একটা মোড় নিয়েছে। তিনি এখন আর জিম্মি নন।

টোপ।

প্রথমবার নক হতেই দরজা খুলে দিল নার্গিস নোয়ালি। দোরগোড়ায় দেখা গেল বোগামুরার মেসেঞ্জারকে, চোখে নির্লজ্জ কৌতুক। শরীর কামড়ে ধরা নীল সিল্কের একটা ড্রেস পরেছে নার্গিস। কর্পোরালের দৃষ্টি তার নাভিমূল থেকে বুক পর্যন্ত বার কয়েক ছুটোছুটি করল। ড্রেসটা এমন, নারীদেহের সমস্ত উত্থান-পতন, ভাঁজ আর বাঁকগুলো স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে। সামনে বাড়ার ভঙ্গি করে এক পা তুলল নার্গিস, একপাশে সরে পথ ছাড়ল কর্পোরাল। মেয়েটা কামরা ছেড়ে বেরুতেই ঘুরে তার পিছু নিল সে।

কর্পোরাল ঘুরতে শুরু করেছে, এই সময় দরজার ভেতর দিকের দেয়াল থেকে দরজার সামনে চলে এল মবুতু। হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে কর্পোরালের গলায় তারটা পরিয়ে দিল সে। তারের দু'প্রান্তে কাঠের ছোট দুটো হাতল রয়েছে, কষে দু'দিকে টান দিতেই গলার চামড়া, মাংস কেটে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল তার।

তারের প্রথম স্পর্শ সুড়সুড়ি দিল গলায়, তারপর মনে হলো গলায় আগুন ধরে গেছে। ঝট করে কর্পোরালের হাত দুটো ঘাড়ে উঠে এল, গলায় ডেবে যাওয়া তারের ভেতর আঙুল ঢোকাবার চেষ্টা করছে। কোন রকমে একটা আঙুল ঢোকাতে পারল সে।

চাপ বাড়াচ্ছে মবুতু, ভাঁজ করা একটা হাঁটু কর্পোরালের শিরদাঁড়ায় ঠেকিয়ে ভারসাম্য ঠিক রাখছে। লোকটার পিঠ ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল। গাঢ় লাল রঙের একটা বুদবুদ বিস্ফোরিত হলো ঘাড়ে, তারের ভেতর আটকে যাওয়া আঙুলটা কেটে গেছে। চিৎকার করতে চাইছে কর্পোরাল, কণ্ঠনালী ভেদ করে তারটা ভেতরে সেঁধিয়ে যাওয়ায় ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুল শুধু। ঝাঁকি খেতে শুরু করল তার শরীর, গলা ও ঘাড় থেকে কল কল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে এখন। হঠাৎ প্রচণ্ড এক ঝাঁকি দিয়ে ঘাড়টা ভেঙে ফেলল মবুতু, ল্যান্ডিঙের মেঝেতে রক্ত ঝরে পড়ার আগেই লাশটা টেনে ঘরের ভেতর ঢোকাল। তারে ঢিল দিল সে, তারপর খুলে নিয়ে কব্জিতে জড়াল।

গোটা দৃশ্যটা অপলক দৃষ্টিতে দেখল নার্গিস, এক চুল নড়েনি। লাশটা ঘর থেকে বাথরুমে নিয়ে গেল মবুতু, বেরিয়ে এসে বলল, 'ওভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন? যা নেয়ার নিয়ে নাও, জলদি!' বিছানার ওপর থেকে নিজের হোল্ডঅলটা তুলে নিল সে। 'সব একটা ব্যাগে ভরো। এখানে তুমি আর ফিরে আসছ না।'

'ফিরে আসছি না?' হাঁ হয়ে গেল নার্গিস।

'বুদ্ধি খাটাও। বোগামুরা মারা যাবার পর সীমান্তের দিকে ছুটব আমি। তুমি কি করবে? ফিরে আসবে এখানে?'

'আপনি বলছেন আমাকে আপনার সঙ্গে যেতে হবে?'

'নিজের বাথরুমে লাশ থাকলে কি করে মানুষ কেনডুরায়?' পাল্টা প্রশ্ন করল মবুতু।

'তারমানে…তারমানে…আপনি বলছেন আমি আপনার সঙ্গে থাকতে পারি?'

'ভুল বুঝো না। সীমান্ত পেরুবার পর আবার তুমি একা হয়ে যাবে। আমি শুধু তোমাকে পালিয়ে যাবার একটা সুযোগ দিচ্ছি।'

দু'মিনিটের মধ্যে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস একটা ব্যাগে ভরে নিল নার্গিস। 'আমি তৈরি।'

নতুন এক গাদা খেলনা উপহার পেয়ে আহ্লাদে আটখানা শিশুর মত হয়ে উঠলেন জুলিয়াস বোগামুরা। অ্যামব্যাসাডর সের্গেই বেকভের সঙ্গে রাশিয়ান ট্যাঙ্কগুলো দেখতে এসেছেন তিনি, ক্রু আর টেকনিশিয়ানদের সবাইকে আলিঙ্গন করলেন। আর কার কি অবস্থা বলা মুশকিল, তবে বেকভ লক্ষ্য করলেন বোগামুরার আলিঙ্গনে চিড়ে-চ্যাপ্টা ভ্লাদিমির প্রোবিন দম ফুরিয়ে যাওয়ায় রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

'বন্ধুগণ, আমার প্রিয় বন্ধুগণ!' আবেগে থরথর করে কাঁপছেন বোগামুরা। 'এই ট্যাঙ্কগুলো আমার অনেক দিনের স্বপ্ন পূরণ করবে। আমার শত্রুরা ঠকঠক করে কাঁপবে এবার! রুশ সরকার আমাকে চিরকৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করলেন, এ ঋণ আমি আমার সাধ্যমত পরিশোধ করব। আপনিই বলুন, ডিয়ার অ্যামব্যাসাডর, প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্র আর আমাকে চোখ রাঙাতে পারবে? আপনাদের সাহায্য পেলে ওরা কোন হুমকি হয়ে দেখা দেয়ার আগেই এই ট্যাঙ্কের সাহায্যে ওদেরকে আমি উচিত শাস্তি দিতে পারি… ।'

'যা কিছু করার মাথা ঠাণ্ডা করে করতে হবে, এক্সেলেন্সী,' তাড়াতাড়ি বললেন বেকভ। 'হঠাৎ কিছু না করে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করাটা জরুরী। কনফারেন্স যখন শুরু হতে যাচ্ছে, সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে নিলে ভাল হয়।'

'আপনার পরামর্শ সব সময় আমার উপকার বয়ে আনে। তাছাড়া, অপেক্ষা করার বিলাসিতা আমার এখন পোষাবেও।' চেহারায় হিংস্র আক্রোশ ফুটে উঠেছিল, সেটা মুছে গিয়ে অমায়িক হাসি দেখা দিল আবার। 'আপনারা আরও ট্যাঙ্ক ও গোলা-বারুদ না দেয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরব আমি। তবে,' তর্জনী খাড়া করে হুমকি দিলেন তিনি, 'যুদ্ধ আমাকে করতেই হবে। ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন এমন একজন বীরের নাম বলুন, যিনি যুদ্ধ করেননি? মুসোলিনী যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধ করেছেন হিটলার। তার আগে নেপোলিয়ান, আলেকজান্ডার, চেঙ্গিস খান, কুবলাই খান…সত্যি কথা বলতে কি, কোনও রাষ্ট্রনায়ককে ইতিহাসে স্থান পেতে হলে যুদ্ধ করা ছাড়া তাঁর উপায় নেই… ।'

প্রোবিন ছাড়া টেকনিশিয়ানদের মধ্যে আর যারা ইংরেজি জানে সবাই তারা হতভম্ব, মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। বেকভ ইঙ্গিত করায় মুখ খুলল প্রোবিন। 'কমরেড, আমার লোকজনের খিদে পেয়েছে, তাদের খানিক বিশ্রামও দরকার। তারপর আমরা প্রেসিডেন্টকে ফায়ার পাওয়ার দেখাবার ব্যবস্থা করব।'

'চমৎকার আইডিয়া,' সম্মতি জানালেন অ্যামব্যাসাডর। প্রস্তাবটা বোগামুরাকে শোনালেন তিনি। তাঁকে বিস্মিত করে দিয়ে বোগামুরা জানালেন, ফায়ার পাওয়ার আজ না দেখলেও চলবে। আরও অনেক জরুরী কাজ আছে তাঁর।

কাজটা কি, সে-কথা কাউকে বলা যায় না। একটা মেয়ের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে প্রেসিডেন্টের।

*

রাস্তা থেকে পুজো ঘুরিয়ে কমান্ড পোস্টের গেটের দিকে এগোল মবুতু। নার্গিস নোয়ালি বসে আছে পিছনের সীটে। ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জার সীটের নিচে লুকানো রয়েছে মবুতুর হোল্ডঅল, অস্ত্রগুলো সব ওটার ভেতর।

রাস্তার ধারে একদল সৈনিক গুড়ি মেরে বসে আছে। কাছাকাছি পার্ক করা রয়েছে একটা ট্রুপ ক্যারিয়ার ও একটা জীপ। সৈনিকদের সবার হাতে অটোমেটিক অস্ত্র। জানালার কাঁচ নামাল মবুতু, একজন সেন্ট্রিকে এগিয়ে আসতে দেখছে।

'কি কাজে আসা হয়েছে?' মবুতুর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল ট্রুপার, চট করে পিছনের সীটে বসা নার্গিসকে দেখে নিল একবার। মেয়েটার বুকের অর্ধেকটাই উন্মুক্ত।

'একজন ভিজিটর, হিজ এক্সেলেন্সির সঙ্গে দেখা করতে চান,' বলল মবুতু। ট্রুপারের উদ্দেশে একটা চোখ টিপল সে।

'আগের ড্রাইভাররা কোথায়? তোমাকে তো আগে কখনও দেখিনি।'

'এটা আমার প্রথমবার। ভাগ্যবান, কি বলো?' হাসছে মবুতু।

'দেখি তোমার কাগজ-পত্র দাও।' হাত ঝাপটে বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করল সেন্ট্রি।

'হ্যাঁ, অবশ্যই…।'

মবুতুর পিছনে স্থির হয়ে গেল নার্গিস। সর্বনাশ, মবুতুর কাছে কোন কাগজ-পত্র নেই। কি করবে সে এখন?

সামনের সীটের ওপর দিয়ে খানিকটা ঝুঁকল নার্গিস, ফলে তার দুই স্তনের মাঝখানে খাদ অনেক গভীর পর্যন্ত দেখা গেল। হাত বাড়িয়ে সেন্ট্রির বাহু স্পর্শ করল সে। 'আপনি তো আমাকে চেনেন, তাই না, কর্পোরাল? আমাকেও নিশ্চয়ই কাগজ দেখাতে বলবেন না?'

হাতটা ফিরিয়ে নেয়ার আগে কর্পোরালের বাহুতে আঙুল বুলাল সে, ঠোঁট টিপে হাসল, তারপর আবার বলল, 'এতদিন ধরে আসা-যাওয়া করছি, কই, একদিন তো কিছু খাওয়ালেন না।'

মবুতুর একটা হাত জ্যাকেটের ভেতর, ভাবটা যেন কাগজ-পত্র বের করতে যাচ্ছে। 'তুমি আমাদেরকে দেরি করিয়ে দিচ্ছ,' বলল সে। 'এমনিতেই পৌঁছুতে দেরি করে ফেলছি আমরা। হিজ এক্সেলেন্সীকে অপেক্ষা করিয়ে রাখলে রেগে যাবেন। যদি বলি কাগজ-পত্র দেখার অজুহাতে এখানে তুমি আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে রেখেছ…।'

বাড়ানো হাতটা টেনে নিল কর্পোরাল। 'সাবধান হবার দরকার আছে। কাল রাতে আমাদের একটা বর্ডার পেট্রল অ্যামবুশে পড়েছে, চুরি গেছে একটা জীপ। নির্দেশ দেয়া হয়েছে…।'

'কিন্তু এটা কোন জীপ নয়,' যুক্তি দেখাল মবুতু। 'প্রেসিডেন্টের বান্ধবীকে দেরি করিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, নিশ্চয় তুমি এ-কথা বলছ না? ইনি কে, তুমি জানো তো?'

নার্গিস হেসে উঠে বলল, 'এই ড্রাইভার, তুমি বড় বেশি কথা বলো। আমি প্রেসিডেন্টের বন্ধু, তা ঠিক; কিন্তু আমি সেনাবাহিনীর সবারই বন্ধু। বিশেষ করে কেউ যদি আমাকে খাওয়ায়। কর্পোরাল, ছুটির দিন আসুন না আমার ফ্ল্যাটে—নাহয় আমিই

আপনাকে খাওয়ালাম…।'

পিছিয়ে গেল ট্রুপার, হাত নেড়ে গেটে দাঁড়ানো লোকটাকে ইশারা দিল। লোহার ব্যারিয়ার একপাশে সরে যেতে পুজো নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল মবুতু। তার পিছনে ঠকঠক করে কাঁপছে মেয়েটা। আয়নায় তাকিয়ে মবুতু বলল, 'তোমার অভিনয় দারুণ হয়েছে।'

গাড়ি-পথটা ধুলো জমা ধূসর লনের ওপর দিয়ে এগিয়েছে, ঘোড়ার খুর আকৃতির একটা বাঁক ঘুরে পৌঁচেছে বাড়িটার সামনে। পথের বাইরে দুটো গাড়ি দেখা গেল—গাঢ় নীল একটা ভলভো আর সাসু লেখা একটা ডাটসান। বাড়ির প্রবেশ মুখেও অনেক গার্ড দেখা যাচ্ছে। সবার পরনে ব্যাটল ফেটিগ, সঙ্গে প্রচুর অস্ত্র। বোগামুরা খুব সাবধানী মানুষ।

পুজো পার্ক করে পিছন দিকে তাকাল মবুতু। মেইন গেট থেকে ছেড়ে দেয়ায় গার্ডদের কেউ ওদেরকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। 'বেরোও,' নির্দেশ দিল সে।

পিছনের দরজা খুলল নার্গিস। হোল্ডঅল খুলে অস্ত্র বের করল মবুতু—একটা কোল্ট। টিউনিকের ভেতর সেটা গুঁজে নিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। নর্তকী ও আততায়ী, দু'জন একসঙ্গে এগোল বাড়িটার দিকে।

সেন্ট্রিদের ওপর নজর রাখছে মবুতু। মেইন গেটে যাদেরকে দেখে এসেছে, এরা তাদের মত নয়। এদের চেহারায় হাসি বা দয়া-মায়া বলে কিছু নেই। এরা সবাই অভিজ্ঞ যোদ্ধা, মাকেসি গোত্রের লোক, গোত্রের বৈশিষ্ট্য হিসেবে নাকের দু'পাশে তিন ফালি করে রং লাগিয়েছে। নার্গিস আর মবুতুকে এগিয়ে আসতে দেখছে তারা অপলক চোখে। মবুতুও একইভাবে তাকাল, পেটের গর্তে আটকানো কোল্টটা যেন আগুন হয়ে উঠেছে ঢোলা টিউনিকের ভেতর। সে জানে, যে-কোন মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ করা হবে তাকে।

তবে না, প্রবেশপথে কেউ ওদেরকে বাধা দিল না। লবির ভেতর ঢুকে চারদিকে তাকাল মবুতু। অনেক উঁচুতে সাদা সিলিঙে ফ্যান ঘুরছে। আরও অনেক গার্ড দেখা গেল। বোগামুরা কোন রকম ঝুঁকি নিচ্ছেন না। কাজ সেরে বেরিয়ে যাওয়া সহজ হবে না।

সিঁড়ির গোড়ায় একটা ডেস্ক, পিছনে বসে আছে ইউনিফর্ম পরা একজন ক্যাপটেন। ক্যাপটেনের পিছনে একজন ডস অফিসার শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়িয়ে, কাঁধে মেশিন পিস্তল, চোখে সানগ্লাস। ডেস্কের দিকে এগোচ্ছে নার্গিস, ক্যাপটেন ও ডস অফিসার নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে দেখছে তাকে।

'হিজ এক্সেলেন্সী আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন,' বলল নার্গিস।

'দাঁড়াও।' মোটাসোটা ক্যাপটেন মবুতুর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল। 'নতুন ড্রাইভার?'

মাথা ঝাঁকাল নার্গিস। টেলিফোনের রিসিভার তুলল ক্যাপটেন। 'মেয়েটা পৌঁচেছে। মি. প্রেসিডেন্টকে জানাও।' খানিক পর আবার কথা বলল সে, 'হ্যাঁ, অবশ্যই, এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।' মবুতুর দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল। 'ওকে নিয়ে ওপরে উঠে যাও।'

নার্গিসের কনুই ধরে সিঁড়ির দিকে এগোল মবুতু। ছুঁতেই বুঝতে পারল উত্তেজনায়

শক্ত হয়ে আছে মেয়েটা।

'দাঁড়াও!' হঠাৎ নির্দেশ দিল ক্যাপটেন। স্থির হয়ে গেল ওরা, নার্গিসকে ছেড়ে হাতটা নামিয়ে আনল পেটের কাছে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। ডস অফিসার আগের জায়গা ছেড়ে নড়েনি, চেহারায় কোন ভাব নেই। তবে ক্যাপটেন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে। 'মেয়েটাকে সার্চ করা হয়নি। এদিকে নিয়ে এসো।'

নার্গিসকে সার্চ করছে ক্যাপটেন, কথা না বলে দেখছে মবুতু। সার্চ না বলে অশ্লীল নির্যাতন বলাই ভাল। নারীদেহের একটা মর্যাদা আছে, এমনকি পতিতা নারীরও সম্ভ্রম নষ্ট করা অপরাধ, কিন্তু ক্যাপটেন লোকটা নিজেকে ইতর প্রমাণ করল। নার্গিসের স্তন, নিতম্বের ভাঁজ, ঊরুসন্ধি, কোথাও হাত দিতে বাকি রাখল না। সমস্ত নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করে গেল মেয়েটা। মবুতুও এক চুল নড়ল না।

সকল অর্থে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল ক্যাপটেন। 'হিজ এক্সেলেন্সীকে অপেক্ষা করিয়ে রেখো না!'

'জানোয়ার!' মবুতু আবার তাকে সিঁড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, চাপা গলায় হিসহিস করে বলল নার্গিস।

'আজই শেষ,' বলল মবুতু। 'আর কেউ তোমাকে অপমান করতে পারবে না।'

দোতলায় উঠে এল ওরা। বোগামুরার অ্যাপার্টমেন্ট, অফিস ও প্রাইভেট চেম্বার এখানেই। মবুতু উপলব্ধি করল, শিকারের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সে।

একটা দরজার সামনে থামল নার্গিস। 'এই দরজার ভেতর অ্যান্টি রূম, ওখান থেকে প্রেসিডেন্টের লিভিং কোয়ার্টারে যাওয়া যায়। আপনি আমাকে পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে যাবেন, অপেক্ষা করবেন ওখানে, তারপর বোগামুরার কাজ শেষ হলে আবার আমাকে এসকর্ট করে বের করে নিয়ে যাবেন।' নার্গিস কথা বলছে সম্পূর্ণ শান্ত সুরে, মবুতুর একটা বাহু ধরে আছে শক্ত করে। 'আমি তাঁর কামরায় ঢোকার পর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করবেন। ততক্ষণে বিছানায় ওঠার জন্যে তৈরি হবেন তিনি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মবুতু বলল, 'ঠিক আছে, ভেতরে ঢোকো।' হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলল সে।

মার্সিডিজটাকে তীরবেগে ছুটে আসতে দেখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল গেটের গার্ডরা। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল সেটা, সামনের প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে গলা ফাটাল আরোহী, 'গেট খোলা!'

আরোহীকে চিনতে পেরে বুকের রক্ত ছলকে উঠল গার্ডদের, স্যালুট করার পর দৌড়ে এসে খুলে দিল গেট। গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল, ঝাঁকি খেয়ে ছুটল আবার।

প্রেসিডেন্ট ভবনের সামনে মার্সিডিজ থেকে নামল ডস প্রধান মেজর জোসেফ কাগলি, এক ছুটে সিঁড়ি বেয়ে ঢুকে পড়ল লবিতে। 'মি. প্রেসিডেন্ট, কোথায় তিনি?'

মোটাসোটা ক্যাপটেন আড়ষ্ট ভঙ্গিতে চেয়ার ছাড়ল, হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে। 'মি. প্রেসিডেন্ট তাঁর কোয়ার্টারে, স্যার। তিনি…।'

'সাবধান করো তাঁকে! খবর দাও, এখুনি আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'তিনি এই মুহূর্তে, ব্যস্ত, স্যার।' এরইমধ্যে কাঁপতে শুরু করেছে ক্যাপটেন।

মেজর কাগলিকে যমের মত ভয় পায় সে, কিন্তু প্রেসিডেন্টের আনন্দ-ফুর্তিতে বাদ সাধতে আরও বেশি ভয় লাগছে তার।

'শুয়োরের বাচ্চা!' চেঁচিয়ে উঠল মেজর কাগলি। 'আয় আমার সঙ্গে!'

'মেজর, হিজ এক্সেলেন্সীর সঙ্গে একটা মেয়ে আছে!'

থমকে দাঁড়াল মেজর কাগলি। ক্যাপটেনের দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে। 'এইমাত্র খবর এসেছে, ব্রিটিশ নাগরিক মি. সিদ্দিকীকে ছিনিয়ে নেয়ার একটা চেষ্টা করা হবে, সম্ভবত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। খবরটা প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছুতে দেরি হলে তুই তার দায়িত্ব নিবি?'

ঘন ঘন মাথা নাড়ল ক্যাপটেন।

'শুয়োরের বাচ্চা!' ক্যাপটেনের মুখে এক দলা থুথু ফেলল মেজর কাগলি। 'তাহলে আমাকে বাধা দিচ্ছিস কেন? লোকগুলো হয়তো এরইমধ্যে ঢুকে পড়েছে শহরে।' সিঁড়ি বেয়ে ছুটল সে।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল মবুতু। পাঁচ মিনিট, বলে গেছে নার্গিস। তারমানে সময় হয়ে গেছে।

কিন্তু সে একা নয়। অন্দরমহলে যাবার দরজার দু'পাশে দু'জন গার্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে। গম্ভীর, টকটকে লাল চেহারা—ইহুদি মার্সেনারি, প্রাইভেট বডিগার্ড। পরনে সবুজ সাফারি জ্যাকেট ও স্ল্যাকস। প্রত্যেকের হাতে একটা করে ইসরায়েলি মেশিন পিস্তল—উজি।

জানালার সামনে হেঁটে এল মবুতু, নিচের চওড়া মাঠটার দিকে তাকাল। লোকগুলোর দৃষ্টি অনুভব করছে পিঠে। সে ভাবছে, কি রকম দক্ষ ওরা?

খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জানালার দিকে পিছন ফিরল মবুতু, হাতে বেরিয়ে এসেছে সাইলেন্সার ফিট করা কোল্ট। দু'হাতে ধরে দ্রুত লক্ষ্যস্থির করল সে, কাছাকাছি গার্ডের মাথায় গুলি করল। দু'চোখের মাঝখানে লাগল বুলেটটা, গুঁড়িয়ে দিল খুলি, হলুদ মগজ আর রক্তমাখা হাড়ের টুকরো নোংরা করে দিল পিছনের ওয়াল পেপার।

দ্বিতীয় গার্ড ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে উজি তুলল, ট্রিগারও টেনে দিল সে। সময় মত এক পাশে সরে যাওয়ায় মবুতুর পিছনে বিস্ফোরিত হলো জানালাটা। মবুতুর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বুলেট হাতুড়ির বাড়ির মত লোকটার বুকে আঘাত করল। লাশটা মেঝেতে ঢলে পড়ার আগেই লাফ দিয়ে এগোল মবুতু, দরজা খুলে ঢুকে পড়ল বোগামুরার অ্যাপার্টমেন্টে।

বিছানার উপর উপুড় হয়ে রয়েছেন বোগামুরা, কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে তাঁর নিচে নার্গিসও ওই একই ভঙ্গিতে স্থির হয়ে আছে। মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি, বিছানা থেকে নেমে রঙচঙে আলখেল্লার দিকে হাত বাড়ালেন। কোমরে ফিতে জড়াচ্ছেন, দড়াম করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মবুতু।

দু'হাতে ধরা কোল্টটা ঘোরাল সে, বিছানায় নগ্ন পড়ে থাকা মেয়েটার দিক থেকে ঘুরে বোগামুরার ওপর স্থির হলো লক্ষ্য। ইতিমধ্যে আড়াল পাবার জন্যে ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছেন বোগামুরা। নাটকীয় ভঙ্গিতে ভেতরে ঢোকার পর এখনও পুরোপুরি তাল সামলাতে পারেনি মবুতু, ফলে গুলি করার সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো সে। বুলেটটা লাগল

বোগামুরার বাহুতে। পেশী ছিঁড়ে গেল, তবে আঘাতটা মারাত্মক নয়। মেঝেতে বসে পড়ে চিৎকার করে উঠলেন বোগামুরা।

নিজেকে স্থির করল মবুতু, আবার লক্ষ্যস্থির করল। সাইলেন্সার ঠেকাল সে বোগামুরার বুকে, ট্রিগার টেনে দিল। ঘরের ভেতর উজি বিস্ফোরিত হলো এক সেকেন্ড আগে, মবুতুর একটা উরু ঝাঁঝরা হয়ে গেল। প্রচণ্ড ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল সে, উপলব্ধি করল তার দ্বিতীয় বুলেট বোগামুরাকে লাগেনি।

দোরগোড়া থেকে লাফ দিয়ে সামনে চলে এল মেজর কাগলি, হাতের মেশিন পিস্তল ঠেকাল মবুতুর মাথায়।

'না!' হুঙ্কার ছাড়লেন বোগামুরা। 'মেরো না ওকে!' বাহুর ক্ষতটা চেপে ধরে সিধে হলেন তিনি, কালো ও মোটা আঙুলের ফাঁক গলে রক্ত গড়াচ্ছে।

কাত হয়ে শুয়ে থাকল মবুতু, এক হাতে উরু চেপে ধরে আছে, অপর হাত দিয়ে নাগাল পাবার চেষ্টা করছে কোল্টের—মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে সেটা।

ঝুঁকে সেটা তুলে নিল মেজর কাগলি, বন করে ঘুরে ক্যাপটেনের দিকে তাকাল। 'এটা নিয়ে ওকে তুমি ভেতরে ঢুকতে দিয়েছ?'

'ও…মেয়েটার সঙ্গে এল, এক্সেলেন্সী। মেয়েটাকে অবশ্যই সার্চ করেছি আমরা। এক্সেলেন্সী, যীশুর কিরে বলছি…।'

চাবুকের মত শপাং করে উঠল বোগামুরার গলা, 'সাইলেন্স! তোমার ব্যবস্থা পরে করা হবে।' দু'পা এগিয়ে মবুতুর কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি। 'ভেবেছিলে মুক্তিদাতাকে তুমি খুন করতে পারবে? আমি একটা সিংহ। আমার ধ্বংস নেই। আমি বোগামুরা! বন্ধু আমার, তুমি একটা মরা মানুষ।' মেজর কাগলির হাত থেকে মেশিন পিস্তলটা নিয়ে মবুতুর ডান চোখে মাজল ঠেকালেন তিনি। 'বিশ্বাস করো, সব কথা আমাকে তোমার বলতে হবে।' তারপর সিধে হলেন তিনি, এগোলেন বিছানার দিকে।

টান দিয়ে নার্গিসের শরীর থেকে চাদরটা কেড়ে নিলেন বোগামুরা, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে সজোরে আঘাত করলেন গালে। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকল নার্গিস, ফোঁপাচ্ছে। সাইলেন্সারের মসৃণ সিলিন্ডার তার উরুসন্ধিতে ঠেকালেন বোগামুরা, কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে চিৎকার করার জন্যে হাঁ করল নার্গিস। কোন আওয়াজ বেরুল না, তার আগেই ট্রিগার টেনে দিলেন বোগামুরা।

ব্যথায় ও প্রচুর রক্তক্ষরণে জ্ঞান হারাল মবুতু।

তিন

সের্গেই বেকভ যুক্তি দিয়ে বোঝালেন, 'ব্রিটিশরা আপনাকে খুন করতে চাইলে, আনিস সিদ্দিকীকে কিডন্যাপ করা হতে পারে বলে ওরা আপনাকে সাবধান করে দিত না। এক্সেলেন্সী, আপনার প্রাণের ওপর এই হামলা আরও কাছাকাছি থেকে করেছে কেউ। ভেবে দেখুন আপনি মারা গেলে কার সবচেয়ে বেশি লাভ।'

কমান্ড পোস্টে, প্রেসিডেন্টের অফিসে রয়েছেন ওঁরা। অ্যামব্যাসাডর বেকভ দাঁড়িয়ে আছেন জানালার দিকে পিছন ফিরে, বোগামুরা বসে আছেন তাঁর ডেস্কে। প্রেসিডেন্টের বাম হাত স্লিং-এ ঝুলছে, বাহুতে ব্যান্ডেজ। রাগে কুঁচকে আছে ভুরু, এ

তাঁর সবচেয়ে বিপজ্জনক মেজাজের লক্ষণ।

দু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে বেরিয়ে এল শব্দগুলো, 'ফালা! সালাহউদ্দিন ফালা! ওটা একটা কুত্তার মল, আমাকে মেরে ক্ষমতা দখল করতে চায়।'

বেকভ জানতে চাইলেন আহত লোকটাকে জেরা করা হয়েছে কিনা।

'শুরু করার আগেই জ্ঞান হারিয়েছে। তবে বেশ্যাটার সঙ্গে নিচে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'আপনি তাকে নিজে জেরা করবেন?'

'অবশ্যই। ওর জন্যে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার হবে সেটা।'

'আমিও উপস্থিত থাকতে চাই, এক্সেলেন্সী। এটা যদি পরিকল্পিত ক্যুর অংশ হয়, সিকিউরিটি সংক্রান্ত ব্যাপারে আরও কিছু পরামর্শ দিতে পারব আমি।'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকালেন বোগামুরা। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন।

প্রচণ্ড ব্যথা সচেতন করে তুলল মবুতুকে। কোথায় রয়েছে সে-সম্পর্কে কোন ধারণা করতে পারল না, শুধু পায়ের ব্যথাটা অনুভব করতে পারছে। মাথার ওপর নগ্ন একটা বালব জ্বলছে, দেখে মনে হলো একটা সেলের ভেতর ফেলে রাখা হয়েছে তাকে। মাথা ঘুরিয়ে তাকাতে একদিকের দেয়ালে হাতুড়ি, স্ক্রু-ড্রাইভার, করাত ইত্যাদি ঝুলতে দেখল সে। একটা সিঁড়ি দেখা গেল, অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে ধাপগুলো। একটা টেবিলে শুয়ে রয়েছে সে, হাত ও পা লোহার আঙটা দিয়ে টেবিলের সঙ্গে আটকানো।

ছায়ার ভেতর থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মবুতু। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন বোগামুরা, পিছনে সের্গেই বেকভ ও মেজর কাগলি।

কাছে এসে মবুতুকে কয়েক সেকেন্ড দেখলেন বোগামুরা, পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলালেন। তার হাতে মোটা একটা মালাক্কা ছড়ি। 'কে পাঠিয়েছে তোমাকে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

মবুতু কথা বলল না।

হাতের ছড়িটা তুলে আহত পায়ে আঘাত করলেন বোগামুরা। প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল মবুতুর আর্তচিৎকার। তারপর গোঙাতে শুরু করল সে, ভুরু থেকে ঘাম গড়াচ্ছে।

'কে পাঠিয়েছে, তার নাম বলো!' আবার ছড়িটা তুললেন বোগামুরা।

মাথাটা এ-পাশ ও-পাশ নাড়ল মবুতু।

আবার আঘাত করলেন বোগামুরা, টেবিলে পড়ে থাকা মবুতু আর্তনাদ করে উঠল। ক্ষত থেকে রক্ত বেরুচ্ছে, ভিজে যাচ্ছে পরনের ফেটিগ।

'লোকটার সাহস আছে,' মন্তব্য করলেন অ্যামব্যাসাডর বেকভ।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার ছড়ি তুললেন বোগামুরা, এই সময় মেজর কাগলি বলল, 'মেয়েটাকে দেখালে হয় না? তাহলে হয়তো বুঝতে পারবে কথা না বলে উপায় নেই।'

হাতটা নামিয়ে নিয়ে মাথা ঝাঁকালেন বোগামুরা। 'হাত-পায়ের আঙটা খুলে দাও।'

ডসের কয়েকজন লোক এগিয়ে এসে আঙটা খুলে নিল, তারপর মবুতুকে টেবিলের ওপর থেকে নামাল। টেনে-হিঁচড়ে একটা খিলানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বেকভ

ভাবছেন, কি আছে ওদিকে?

দ্বিতীয় কামরাটা একই রকম দেখতে, তবে টেবিল ছাড়াও এখানে একটা কোমর সমান উঁচু সাদা কেবিনেট রয়েছে, দৈর্ঘ্যে প্রায় আট ফুট। টেবিলটা ঘরের মাঝখানে, সিলিঙে ঝুলছে নগ্ন একটা বালব। লাল চাদরে মোড়া কি যেন একটা পড়ে রয়েছে টেবিলে। নাক কোঁচকালেন বেকভ। অদ্ভুত একটা দুর্গন্ধ পাচ্ছেন তিনি, পচা ও অসুস্থকর, তবে চিনতে পারলেন না।

দু'জন ডস সদস্যর মাঝখানে ঝুলে রয়েছে মবুতু, দেখে মনে হচ্ছে মাতাল।

টেবিলের কাছে থামলেন বোগামুরা, চাদরের একটা প্রান্ত তুলে ধরলেন। এক পা এগিয়ে গলা লম্বা করলেন বেকভ, পরমুহূর্তে দম আটকালেন। চাদরটা মোটেই লাল নয়। সাদা ওটা, রক্তে ভেজা। টেবিলের তলাতেও রক্ত দেখা যাচ্ছে, অস্পষ্ট আলোয় কালচে দেখাচ্ছে। টেবিল থেকে চাদরটা তুলে ফেললেন বোগামুরা, বেকভের মনে হলো তিনি বমি করে ফেলবেন।

প্রথম দর্শনে মনে হলো একটা গরুকে জবাই করে, চামড়া ছাড়িয়ে, কাত করে ফেলে রাখা হয়েছে। থেঁতলানো ধড়টা যেন সম্মোহিত করে ফেলেছে, অসুস্থবোধ করলেও চোখ ফেরাতে পারছেন না বেকভ। মেয়েটার দুই হাত কাঁধ থেকে কেটে নেয়া হয়েছে, পা দুটো কাটা হয়েছে ঊরু থেকে। তার ডান হাত ও পা রাখা হয়েছে বাম দিকে, বাম হাত ও পা রাখা হয়েছে ডান দিকে। বেকভের মাথা ঘুরছে, লক্ষ করলেন লাশটার মাথা নেই।

ডস সদস্যের মাঝখানে আরও খানিক ঝুলে পড়ল মবুতু, বমি করল সশব্দে। হাতের ছড়িটা রেখে কেবিনেটের দিকে এগোলেন বোগামুরা। কেবিনেটের মাথায় একটা হাতল রয়েছে, ধরলেন সেটা। সেই মুহূর্তে বেকভ বুঝতে পারলেন ওটা একটা চেস্ট ফ্রিজার।

ঢাকনি তোলা হলো, দেয়ালের গায় হেলান দিয়ে রয়েছে। ভেতরে হাত ভরলেন বোগামুরা। তারপর সিধে হলেন। তাঁর হাতে পলিথিনের একটা ব্যাগ, মুখ বাঁধা। ব্যাগের ভেতর গোল ও গাঢ় কিছু একটা আছে। পলিথিনের গায়ে বরফের কুচি লেগে থাকায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। তবে জিনিসটা কি হতে পারে বুঝতে পারছেন বেকভ। মেয়েটার মাথা।

ব্যাগ ধরা হাতটা যথাসম্ভব লম্বা করে দিয়ে হেসে উঠলেন বোগামুরা। বেকভের মনে হলো এরকম পৈশাচিক হাসি জীবনে কখনও শোনেননি তিনি। বন্দীর দিকে তাকালেন। ব্যাগটার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রয়েছে সে। বোগামুরা হাসি মুখে ফ্রিজারে ছুঁড়ে দিলেন মাথাটা।

বেকভ ভাবছে, ফ্রিজারে না জানি আরও কি আছে!

ছড়িটা হাতে নিয়ে মবুতুর সামনে দাঁড়ালেন বোগামুরা। ছড়ির ডগা আলতোভাবে বন্দীর চিবুকে ছোঁয়ালেন। নরম সুরে বললেন, 'আমি আর মেজর কাগলি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে তুমি। জবাব দেবে দ্রুত, আর সত্যি কথা বলবে।' গার্ডদের দিকে ফিরে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

প্রথম ঘরে নিয়ে এসে আবার টেবিলের ওপর শোয়ানো হলো মবুতুকে, হাত ও পায়ে আঙটা পরানো হলো।

‘কে তোমাকে ভাড়া করেছে?’ শুরু হলো জেরা।

সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল মবুতু। দম আটকালেন বেকভ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওঅর্ক বেঞ্চের দিকে এগোলেন বোগামুরা। টেবিলের কাছে ফিরে এলেন একটা ছেনি ও হাতুড়ি নিয়ে। ‘কে তোমাকে পাঠিয়েছে?’ আবার প্রশ্ন করলেন তিনি।

চুপ করে থাকল মবুতু। চোখ দুটো প্রায় বুজে আসছে।

ঘন ভুরু জোড়া উঁচু করলেন বোগামুরা, ইঙ্গিত পেয়ে ছেনির ফলা মবুতুর বাম হাতের কড়ে আঙুলের গোড়ায় ঠেকাল মেজর কাগলি। পরমুহূর্তে ছেনির মাথায় হাতুড়ির বাড়ি মারল সে।

মবুতুর গলা থেকে বিস্ফোরিত হয়ে যে আওয়াজটা বেরিয়ে এল সেটা মানুষের বলে চেনা গেল না। টেবিলের ওপর ছিটকে পড়েছে বিচ্ছিন্ন আঙুল, ক্ষত থেকে দরদর করে বেরিয়ে আসছে রক্ত, ভিজে যাচ্ছে টেবিল। পাশের আঙুলে ছেনি ঠেকিয়ে হাতুড়ি তুলল মেজর কাগলি।

‘কে পাঠিয়েছে? নাম বলো,’ প্রশ্ন করলেন বোগামুরা।

ঘড়ঘড় আওয়াজের সঙ্গে অস্পষ্টভাবে শোনা গেল নামটা, ‘হাজি বাবা…।’

‘হাহ্-হা!’ পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন বোগামুরা। ‘ওই শালা গরুর লেজ দেখছি আমার পিছু ছাড়ছে না। বড় জানতে ইচ্ছে করছে কত দাম ধরেছে সে আমার? কত টাকা পাবার কথা তোমার?’

‘এক…এক লা-লাখ ড-ড-ড…’

‘মাত্র এক লাখ ডলার?’ রেগে গেলেন বোগামুরা। ‘শালা কৃপণের হাড্ডি! দলে তোমরা ক’জন?’

জবাব শোনার জন্যে গলাটা লম্বা করলেন বেকভ।

বন্দী প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছে বলে মনে হলো না। ব্যথায় কুঁচকে আছে মুখ। চোখে ঘোর।

‘আরেক বার জিজ্ঞেস করছি। আমরা জানি বৈধ লুগাম্বান সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, তুমি সেই ষড়যন্ত্রেরই অংশ বিশেষ। আমরা আরও জানি, আনিস সিদ্দিকী নামে একজন ব্রিটিশ নাগরিককে কিডন্যাপ করার প্ল্যান করা হয়েছে। উত্তর দাও, তোমাদের ক’জনকে পাঠানো হয়েছে?’

মবুতুর ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। হাঁপাচ্ছে সে। বার কয়েক চেষ্টা করার পর বলতে পারল, ‘আমি…আমি একা।’

ঝট করে মাথা ঝাঁকালেন বোগামুরা, দ্বিতীয় আঙুলটা ছিটকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই ভৌতিক আর্তচিৎকার শোনা গেল। ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে শরীরটা।

‘স্বীকার করো, লুগাম্বা আক্রমণ করা হবে! সালাহউদ্দিন ফালাকে সাহায্য করছে কে? তাঞ্জানিয়া? কেনিয়া? মিশর? আমেরিকান সিআইএ, নাকি ব্রিটেন? কিংবা লিবিয়া নয় তো?’

‘এক্সেলেন্সী, অনুমতি দিলে আমি ওঁকে জেরা করতে পারি,’ প্রস্তাব দিলেন বেকভ।

কথা না বলে কাঁধ ঝাঁকালেন বোগামুরা, ছেনির ফলাটা আরেক আঙুলের গোড়ায়

ঠেকাল মেজর কাগলি।

বেকভ শান্ত সুরে বললেন, 'আপনার নাম বলুন, প্লীজ। আমরা জানতে চাই. আপনি সীমান্ত পেরুলেন কিভাবে। কেনডুরাতেই বা ঢুকলেন কিভাবে।'

'কাল রাতে আমার…গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে…আমি একটা গাড়ি চুরি…।'

'পেট্রল ল্যান্ড রোভার!' হিসহিস করে উঠল মেজর কাগলি, হাতুড়ি তুলল।

'ওয়েট!' অনুরোধ করলেন অ্যামব্যাসাডর। হঠাৎ উৎকট একটা দুর্গন্ধ আঘাত করল তাঁর নাকে। বন্দীর নিতম্বের নিচে ভেজা দাগ দেখে বুঝতে পারলেন ব্লাডার খালি হচ্ছে। অবশ্য বোগামুরার সেদিকে খেয়াল নেই। বেকভ বললেন, 'আপনি বলছেন ব্রিটিশ নাগরিক মি. সিদ্দিকীকে মুক্ত করার প্ল্যান সম্পর্কে কিছুই আপনার জানা নেই? হিজ এক্সেলেন্সীকে খুন করার চেষ্টা নিশ্চয়ই লুগাম্বা আক্রমণ করার পূর্ব-লক্ষণ, অন্তত মি. সিদ্দিকীকে কিডন্যাপ করার জন্যে ডাইভারশন তো বটেই, কি বলেন?

'এ-সব কিছুই…জানি না আমি।'

'হিজ এক্সেলেন্সী আপনার কথা বিশ্বাস করছেন না।'

'সত্যি…সত্যি কথা…বলছি।'

'মনে রাখবেন, ওঁরা শুধু আপনার আঙুল কাটবেন না,' বেকভের গলায় আবেদনের সুর। 'সত্যি কথা বলুন, সালাহউদ্দিন ফালা কি লুগাম্বা আক্রমণের প্ল্যান করেছেন? সেই প্ল্যানের অংশ হিসেবেই কি পাঠানো হয়েছে আপনাকে?'

'আমিই সেরা, তাই আমাকে পাঠানো হয়েছে। আমি…আমি মবুতু!' দ্রুত নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে গলার আওয়াজ, তবে গর্বের সুরটুকু স্পষ্ট বাজল কানে।

মাথা ঝাঁকালেন বেকভ। 'আপনার কথা আমি শুনেছি। শুনেছি আপনি অত্যন্ত দক্ষ।'

অবিশ্বাস্য ব্যাপার, ক্ষীণ হাসি ফুটল মবুতুর ঠোঁটের কোণে। 'দক্ষতা আর দেখাতে পারলাম কই!' খক খক করে কেশে উঠল সে, ব্যথায় গোটা শরীর কুঁকড়ে গেল।

'আপনি খুব সাহসী মানুষ, মবুতু। সত্যি কথা বললে এখনও আপনাকে আমি বাঁচাতে পারি।'

'যা জানি না তা আপনাকে আমি বলব কিভাবে!'

বোগামুরার দিকে তাকালেন বেকভ। 'উনি বোধহয় সত্যি জানেন না।'

'শালা মিথ্যে কথা বলছে!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রতিবাদ করল মেজর কাগলি।

'লোকটা বোকা নয়, এক্সেলেন্সী,' বললেন বেকভ। 'নিজেকে রক্ষা করার এই সুযোগ তার ছাড়ার কথা নয়।'

মেজর কাগলি বলল, 'আঙুল নয়, আমি শালার অন্য কিছু কেটে নিই?'

বেকভ নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। 'আপনি একটা জানোয়ার! এই লোকের একটা আঙুলে যে সাহস আছে আপনার পক্সের দাগ ভর্তি সারা শরীরে তার হাজার ভাগের এক ভাগও নেই।'

'যথেষ্ট!' হুঙ্কার ছাড়লেন বোগামুরা। 'যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছি আমরা।' মেজর কাগলির দিকে তাকালেন তিনি। 'বন্দীর ব্যবস্থা করো!' ফেরার জন্যে ঘুরলেন তিনি. তারপর এক মুহূর্তের জন্যে থমকালেন। 'মাথাটা আমার জন্যে রেখে দিয়ো।'

সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে গেছেন ওঁরা, পিছন থেকে ভোঁতা একটা আওয়াজ ভেসে

এল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন বোগামুরা। কাত হয়ে রয়েছে মবুতুর মাথা, কালো একটা মুখোশের মত চকচক করছে। টেবিলের দিকে এগিয়ে এলেন তিনি। 'কিছু বলবে?'

রক্ত ও বমিতে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে ঠোঁট, মবুতু বলল, 'হাজি বাবার সঙ্গে এক লোককে দেখেছি আমি।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলে যাও।'

'ইউরোপিয়ান নয়, অ্যারাবিয়ান বা ল্যাটিন আমেরিকান হতে পারে। তাকে আমার সামরিক অফিসার বলে মনে হয়েছে। মার্সেনারিও হতে পারে।'

'নাম?'

'জানি না। আমি তাকে চলে যাবার সময় দেখি।'

'জাতীয়তা?'

'জানি না।' চোখ বুজল মবুতু, সম্ভবত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

আপনমনে কাঁধ ঝাঁকালেন বোগামুরা। অন্য প্রসঙ্গে চিন্তা করছেন তিনি। আনিস সিদ্দিকীকে কিডন্যাপ করার প্ল্যান করা হয়েছে।

'কি খবর, মাইকেল?' টেলিফোনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী।

'সরকারী সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রেসিডেন্ট বোগামুরাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানিয়েছি যে আমাদের সিকিউরিটি সার্ভিস মি. সিদ্দিকীকে কিডন্যাপ করার একটা ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। হিজ এক্সেলেন্সীকে খবরটা জানানো আমরা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করেছি। আমরা চাই মি. সিদ্দিকীকে বৈধ উপায়ে মুক্ত করার জন্যে যে সহযোগিতা শুরু হয়েছে তা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।'

'বাহ্, দারুণ ডিপ্লোম্যাটিক। কি জবাব পেলাম আমরা?'

'এখনও কিছু পাইনি,' বললেন ল্যাক্স। 'লুগাম্বা চুপ মেরে আছে।'

প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'উত্তর পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তুমি জানাবে, মাইকেল। ইতিমধ্যে আরএএফ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি আমি। নরটহোল্ট-এ একটা ভিসি-টেন অপেক্ষা করছে তোমাকে লুগাম্বায় নিয়ে যাবার জন্যে। সাইপ্রাসে রিফুয়েলের জন্যে থামবে...।'

'জাস্ট আ ব্লাডি মিনিট!' প্রতিবাদের সুরে বললেন ল্যাক্স। 'এর আগে সিদ্ধান্ত হয়েছিল আমাকে পাঠানো হবে না।'

'আমি সিদ্ধান্ত বদলেছি, মাইকেল,' বললেন প্রধানমন্ত্রী। 'কাজ যা করার প্রেসিডেন্ট নাই তো করেই রেখেছেন, তুমি শুধু কেনডুরায় গিয়ে রিসিভ করবে মি. সিদ্দিকীকে। কাগজে ছবি উঠবে বোগামুরার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছ তুমি, ক্যামেরার দিকে ফিরে হাসছ,—আগামী নির্বাচনে কিছু বেশি ভোট পাবার এই সুযোগ আমরা কি ছাড়তে পারি? তুমিই বলো?'

এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন ল্যাক্স, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ, যাব আমি।'

রবার্ট পিল একজন কৌতূহলী মানুষ, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর ও মার্সেনারি এজেন্ট হিসেবে সেজন্যেই সফল সে। আনিস সিদ্দিকীকে কেনডুরা থেকে ছাড়িয়ে আনার

কাজটা কে তাকে দিল তা জানার কোন দরকার ছিল না, নিজের ফি পেয়েই খুশি থাকার কথা তার। কিন্তু মার্সেনারিদের টীমে মাসুদ রানাকে থাকতেই হবে, উইলিয়াম ক্লিপটন এ-কথা বলায় তার মনে কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। মনটা খুঁতখুঁত করছিল. কাজেই ক্লিপটনকে খুঁটিয়ে লক্ষ করে সে, এবং তিনি যে ছদ্মবেশ নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছেন, এটা ধরে ফেলল। ক্লিপটন দ্বিতীয় বার তার সঙ্গে দেখা করার আগেই নিজের লোকদের সতর্ক করে দিয়েছিল সে, ফলে নির্জন বাড়িটা থেকে দ্বিতীয়বার সে বেরিয়ে আসার বিশ মিনিট পর ক্লিপটন যখন বেরুলেন, তার লোকেরা অনুসরণ করল। বাড়িটায় ক্লিপটন একা ছিলেন, কিন্তু বেরিয়ে এলেন ক্লিপটন নন, মাইকেল ল্যাক্স, ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বাড়িটা থেকে বেরিয়ে সরাসরি দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে গেলেন তিনি।

রিপোর্ট পেয়ে পিল বুঝলেন, উইলিয়াম ক্লিপটনই মাইকেল ল্যাক্স।

শেষবার দেখা করে ক্লিপটন তাকে জিজ্ঞেস করেছেন, মার্সেনারিদের লুগাম্বা থেকে ফিরিয়ে আনার কোন উপায় আছে কিনা। এটা একটা ফালতু প্রশ্ন, কারণ পিল তাঁকে আগেই বলে দিয়েছিল যে লুগাম্বায় একবার ঢোকার পর ওদের সঙ্গে তার কোন রকম যোগাযোগ থাকবে না।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্সেনারিদের ফিরিয়ে আনা যায় কিনা জানতে চাইছেন, এ-কথা শুনে ভয় পেয়ে যায় পিল। সন্দেহ নেই, কোথাও নিশ্চয়ই বড় ধরনের কোন গোলমাল দেখা দিয়েছে। মাসুদ রানার সঙ্গে তার যোগাযাগ নেই তা ঠিক, তবে, রানা এজেন্সির লন্ডন শাখার অফিসটা তার চেনা আছে। টেলিফোন করা নিরাপদ নয় ভেবে খবরটা জানাবার জন্যে নিজেই গেল সে। রানা এজেন্সির লোকজন তাকে খুব খাতির করে বসাল, সব কথা শোনার পর বলল, মাসুদ রানার সঙ্গে তাদেরও কোন যোগাযাগ নেই. তবে নাইরোবিতে তাদের লোক আছে, তাকে তারা সতর্ক করে দিচ্ছে।

পরদিন সকালে নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চড়ল রবার্ট পিল. অফিসে যাবে। স্টার্ট দেয়ার জন্যে ইগনিশনে চাবি ঘোরাল, অমনি বিস্ফোরিত হলো গাড়ি-বোমা। চোখের পলকে আশপাশের সমস্ত কাচের জানালা চুরমার হয়ে গেল. গাড়িটা হয়ে উঠল অগ্নিকুণ্ড। বিস্ফোরণের সময় আশপাশে কেউ না থাকায় মারা গেল একা শুধু পিল।

সেবাশ্রমের বাইরে জড়ো হয়েছে সবাই ওরা। সিস্টার আসমা দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়, জাফরের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ ফেরাতে পারছে না। ভাব দেখে মনে হলো জাফর ব্যাপারটা সম্পর্কে সচেতন নয়।

ড. গনির সঙ্গে করমর্দন করল রানা। 'কি করতে হবে আপনি তো জানেনই, তাই না?'

'চিন্তা কোরো না, রানা। এদিকটা আমি দেখব।'

'নাসিম আসবে মাঝরাতের দিকে। আগের মতই আলো জ্বেলে তাকে পথ দেখাতে হবে।'

'তোমরা তো সরাসরি এখানে ফিরবে, তাই না?' উদ্বিগ্ন দেখাল ড. গনিকে।

'সরাসরি নয়। বোগামুরার লোকজনকে এদিকে টেনে আনতে চাই না। ওদের চোখকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে কিছু কৌশল করতে হবে।'

এতক্ষণে সিস্টার আসমার দৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল জাফর। অন্য দিকে তাকাল আসমা, একটু দ্রুত হয়ে গেল। ব্যাপারটা লক্ষ করলেন ড. গনি। জাফরকে খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি, একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল তাঁর মনে, যদিও প্রকাশ করার সুযোগ পাওয়া গেল না। রানার নির্দেশে রেঞ্জরোভারে উঠতে শুরু করেছে সবাই।

ড্রাইভিং সীটে বসল জাফর। বিল্ডিঙের সামনে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিল সে, তারপর রওনা হলো। হেলেদুলে এগোল গাড়ি, ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে পাহাড়ের ওপর।

পাহাড়ের চূড়ায় উঠে অপর দিকে নামতে শুরু করল ওদের রেঞ্জরোভার, হারিয়ে গেল অন্ধকারে। আরোহীরা কেউ একবার পিছন ফিরে তাকাল না।

বৃদ্ধ ড. গনি আর মেয়েটা তারপরও অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

চার

স্লীপিং ব্যাগের ভেতর পা লম্বা করল নাসিম, ভাবছে হঠাৎ তার ঘুম ভাঙল কেন।

হ্যাঙ্গারের ভেতর, ওঅর্কশপ সংলগ্ন অফিসে, কটে শুয়ে রয়েছে সে। তার চীফট্যান, বিকেলে ফুয়েল ভরার পর থেকে, দাঁড়িয়ে আছে বাইরের অ্যাপ্রনে, ট্যাক্সিওয়ের দিকে মুখ করে। হাতটা চোখের সামনে এনে রোলেক্সের ডায়ালে তাকাল সে। ঠিক যে-সময় সে জাগতে চেয়েছিল তারচেয়ে আধ ঘণ্টা আগে ভেঙে গেছে ঘুমটা। নিশ্চয়ই বিনা কারণে নয়।

একটা শব্দ হলো। অন্ধকার হ্যাঙ্গারের ভেতর-এত অস্পষ্ট, হালকা পায়ের শব্দ বলে মনে হলেও নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। চেইন টেনে স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এল নাসিম, হাত বাড়িয়ে চেয়ারের পিঠ থেকে ওভারঅলটা টেনে নিয়ে পরল সে। হ্যাঙ্গারের ভেতর এই সময় ধাতব কি যেন একটা ছিটকে পড়ল। তারপরই শোনা গেল চাপা তিরস্কারের শব্দ, 'ধুস শালা!'

পায়ে একজোড়া পাম্প গলিয়ে দরজার দিকে এগোল নাসিম। চারদিকে তাকাল, ডেস্কের ওপর একটা রেঞ্চ দেখতে পেয়ে তুলে নিল হাতে। সেটা শক্ত করে ধরে অফিসের দরজা খুলে ফেলল।

হ্যাঙ্গারের মেইন ডোর সামান্য খোলা, ভেতরে এক ফালি চাঁদের আলো ঢুকছে। যতদূর দেখতে পাচ্ছে, বিল্ডিংটা খালি বলে মনে হলো তার। কেরোসিনের ড্রাম বা ওঅর্ক বেঞ্চের পিছনে লুকিয়ে নেই কেউ। তবে এখন না থাকলেও, কয়েক সেকেন্ড আগে কেউ একজন অবশ্যই ছিল।

তারপর হঠাৎ একটা ছায়াকে নড়তে দেখল নাসিম। দরজার ফাঁকে, অনেকটা দূরে, মানুষের একটা অস্পষ্ট আকৃতি। পলকের জন্যে দেখতে পেল সে, তারপরই জোছনার কিনারা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লোকটা চীফট্যানের উল্টোদিকে ছুটছে।

সর্বনাশ! রেঞ্চ হাতে ছুটল নাসিম দরজার দিকে। এই সময় বিস্ফোরিত হলো চীফট্যান।

দরজাটা বাধা না হলে বিস্ফোরণের ধাক্কায় পড়ে যেত নাসিম, শক ওয়েভ তার কোন ক্ষতি করতে পারল না। তা সত্ত্বেও দ্রুত হাত তুলে চোখ দুটো আড়াল করল সে,

চীফট্যানের ফুয়েল ট্যাঙ্ক বিস্ফোরিত হওয়ায় গোটা এলাকা অনেক দূর পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠল। এক পলকে সগর্জন আগুনের একটা বল হয়ে উঠল প্লেনটা, জ্বলন্ত আবর্জনা আর কেরোসিন বৃষ্টির মত ঝরে পড়ল বিল্ডিঙের গায়ে-মাথায়।

আগুনের আঁচ গ্রাহ্য না করে এক ছুটে হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে এল নাসিম, চীফট্যানকে পুড়ে শেষ হয়ে যেতে দেখছে। চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল তার।

অসহায় ভঙ্গিতে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল বলতে পারবে না, চেঁচামেচি আর সাইরেনের আওয়াজে সংবিৎ ফিরল তার। তারপর কাঁধে কার যেন একটা হাত পড়ল। ঝট করে ফিরল নাসিম।

নিক ডানহিল, তেল কোম্পানীর মেকানিকদের একজন। নৃত্যরত অগ্নিশিখার দিকে আতঙ্ক ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। 'নাসিম! বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে ছুটে এলাম। কিভাবে ঘটল?' তার উদ্বেগে কোন কৃত্রিমতা নেই। 'আর ইউ ওকে?'

'আমার কিছু হয়নি,' ফাঁপা সুরে বলল নাসিম।

'কি সর্বনাশ! একটুর জন্যে…!' ডানহিলের স্বস্তিবোধ করাটা স্বাভাবিক। তার কোম্পানীর একজোড়া লিয়ার জেট হ্যাঙ্গারের এক কোণে পার্ক করা রয়েছে, পাশাপাশি রয়েছে আরও ছ'টা অন্যান্য প্লেন। চীফট্যান কাছাকাছি থাকলে ওগুলোতেও আগুন ধরতে পারত।

নাসিম ভাবছে, ডেল নিকোলাসের লোকেরা কি ধরনের এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করেছে। যা-ই ব্যবহার করুক, কাজ হয়েছে দ্রুত ও নিখুঁত। কার আওয়াজ পেল সে? গালি দিল কে—বেরি, না কি রডনি? সম্ভবত বেরি, কারণ টেকনিক্যাল নো-হাউ জানা আছে তার। রডনি ভোঁতা একটা পেশী ছাড়া কিছু নয়। এ-ধরনের কাজ করার জন্যে ডেল নিকোলাস বেরিকেই পাঠাবে।

দমকল বাহিনীর লোকজন ফোম ব্যবহার করে নিভিয়ে ফেলল আগুন। হিপ ফ্লাস্কটা নাসিমের দিকে বাড়িয়ে দিল ডানহিল। 'এক ঢোক ব্র্যান্ডি খাও, ভাল লাগবে।'

মাথা নাড়ল নাসিম। মাথাটা তার পরিষ্কার রাখতে হবে।

ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিস অফিসারকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ডানহিল বলল, 'এবার শুরু হবে জেরা।'

পুলিসকে নাসিম বলল, কিভাবে কি ঘটেছে তার কোন ধারণা নেই। হ্যাঙ্গারে কেউ ঢুকেছিল, এ-কথা চেপে গেল সে। এ-ধরনের ক্ষতি কে করতে পারে, তার কোন শত্রু আছে কিনা, একের পর এক অনেক প্রশ্ন করল পুলিস। নাসিম জানাল, তার কোন শত্রু নেই, বুঝতে পারছে না কে তার ক্ষতি করতে চাইতে পারে।

পরে আবার আসবে বলে চলে গেল পুলিস। হাতঘড়ি দেখল নাসিম। তার তলপেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। তিন ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্য মাসামবাবুল-এর ল্যান্ডিং স্ট্রিপে তাকে আশা করবে রানা। চীফট্যান ছাড়া আনিস সিদ্দিকীকে লুগাম্বা থেকে বের করে আনা যাবে না। চীফট্যান ছাড়া রানাও ওর টীমকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে না। ওরা যখন ড. গনির সেবাশ্রমে পৌঁছুবে, ওদের পিছনে বোগামুরার সৈনিকরা থাকবে। এয়ারস্ট্রিপে তখন যদি চীফট্যান না থাকে, কোণঠাসা ইঁদুরের মত অসহায় বোধ করবে রানা। 'তোমাকে আমি দেখে নেব, নিকোলাস। তোমাকে আমি ছাড়ব না।'

'কি বলছ?'

'কিছু না,' বলল নাসিম। 'ডানহিল, চলে যেয়ো না, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

অফিসে ফিরে এল নাসিম, ফ্লাইট ব্যাগ আর চার্ট নিয়ে ছুটল।

তার অনুরোধ শুনে হাঁ হয়ে গেল ডানহিল। 'কি দরকার তোমার? আরেকবার বলো!'

'কমান্ডার।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হলো!'

'একরকম তাই-ই। তুমি দেবে কিনা বলো।'

'কিন্তু কেন দরকার? তাও এই অসময়ে?' ডানহিল এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না।

'মানুষের সেবা করার জন্যে, এর বেশি কিছু জানতে চেয়ো না,' বলল নাসিম।

'কেন, রেড ক্রস আছে কি করতে?'

'রেড ক্রস অনেক দূরে, কাছাকাছি বন্ধু বলতে আমি একা শুধু তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। ডানহিল, অমন হাঁ করে তাকিয়ে থেকো না তো! তুমি খুব ভাল করেই জানো, আমি জুনিয়র পাইলট নই। তুমি বন্ধু, অনুরোধ করার সেটাই কারণ। সত্যি প্লেনটা আমার দরকার, ডানহিল। দরকার এখুনি। বলতে পারো, এটা একটা জীবন-মরণ সমস্যা। তা না হলে চাইতাম না।'

দু'দিনের না-কামানো দাড়িতে হাত বুলাল ডানহিল। 'নাসিম, বন্ধুত্বের দাবি জানিয়ে তুমি আমাকে বিপদে ফেলে দিচ্ছ। কিন্তু আমার সমস্যাও তোমাকে ভেবে দেখতে হবে। প্লেনটা আমার নয়, কোম্পানীর। কেন দরকার, কোথায় নিয়ে যাবে, এ-সব আমাকে জানতে হবে। তুমি লাইব্রেরী থেকে একটা বই ধার চাইছ না। কমান্ডার অত্যন্ত দামী…।'

'বুঝেছি, বুঝেছি, আর বলতে হবে না।' চেহারায় অভিমান ফুটিয়ে তুলল নাসিম। 'সত্যিই তো, তোমার সঙ্গে আমার কি এমন সম্পর্ক যে চাইলেই এত দামের একটা জিনিস ব্যবহার করতে দেবে! দুঃখিত, আমার অন্যায় হয়েছে। ভুলে যাও, ডানহিল। থাক, আমি অন্য ব্যবস্থা করে নেব।'

'আহা, আমি কি একবারও বলেছি যে কমান্ডার তোমাকে দেব না?' ব্যস্ত হয়ে উঠল ডানহিল, ঠিক যেমন আশা করেছিল নাসিম। 'আমি শুধু বলতে চাইছিলাম যে প্লেনটার নিরাপত্তার কথাও আমাকে ভাবতে হবে।' এক সেকেন্ড চিন্তা করল সে, তারপর আবার বলল, 'শোনো, কমান্ডারে ফুয়েল ভরাই আছে।' দাঁত বের করে হাসল সে।

এগিয়ে এসে ডানহিলকে আলিঙ্গন করল নাসিম। 'তুমি সত্যিই আমার বন্ধু, ডানহিল। তোমার এই উপকার আমি ভুলব না।'

'কোথায় যাবে তা তো বলবে না। কিন্তু ফিরবে কতক্ষণে?'

'ভোর হবে না, তার আগেই তোমার জিনিস ফিরে পাবে তুমি,' বলল নাসিম। 'ইনশাল্লাহ!'

'একটা কথা, নাসিম,' বলল ডানহিল। 'খারাপ কিছু যদি ঘটে, দায়-দায়িত্ব একা সব তোমার। কমাণ্ডার তুমি নিয়ে যাবে আমি যখন ধারে-কাছে থাকব না…।' হঠাৎ

আবিষ্কার করল, একা একা কথা বলছে সে। ওর কথা শোনার অপেক্ষায় না থেকে টারমাক ধরে ছুটতে শুরু করেছে নাসিম।

মাবোরুর উঠানে জড়ো করা হচ্ছে লাশ, ডিজপোজাল ইউনিট এসে নিয়ে যাবে। সেলের জানালা থেকে দৃশ্যটা দেখছেন আনিস সিদ্দিকী।

ডেথ সেল থেকে এক এক করে লাশগুলো বের করে আনছে গার্ডরা। তোবড়ানো পুতুলের মত লাগছে দেখতে, ঘাড়ের ওপর নড়বড় করছে মাথা, মরা সাপের মত ঝুলছে হাত ও পা। দেয়াল ঘেঁষে সার্চ ও স্পটলাইট জ্বলছে, চোখ ধাঁধানো আলোয় দৃশ্যটা রোমহর্ষক, ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে স্তূপটা। জমাট বাঁধা থকথকে কাদার মত রক্ত পিঠ আর নিতম্ব থেকে গড়াচ্ছে। প্রথম কিছুক্ষণ গুণেছিলেন আনিস সিদ্দিকী, তারপর বাদ দিয়েছেন। জাল দিয়ে ঘেরা উঠানের একটা কোণ ভরে যেতে জানালার কাছ থেকে সরে এলেন তিনি, অসুস্থবোধ করছেন।

পাশের সেলে কি যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে গার্ডরা, বোঝা যাচ্ছে ভারি, নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। নোংরা কম্বলের ওপর পদ্মাসনে বসলেন তিনি, নিঃশব্দে কাঁদছেন।

সন্ধের দিকে এই সময় রোজই ঘটনাটা ঘটে। তারপর ট্রাক আসে, লাশগুলো ছুঁড়ে ফেলা হয় তাতে। বোঝার ভারে ট্রাকের চাকা ডেবে যায়, হেলেদুলে বেরিয়ে যায় মাবোরু থেকে, গন্তব্য কিগালা ফলস-এর ওপর অবজারভেশন পোস্ট, ওখান থেকে আলোড়িত কালো পানিতে ফেলে দেয়া হয় লাশগুলো। মাঝে মধ্যে ফিরে আসে ট্রাকটা, দ্বিতীয়বার লোড করার জন্যে, নির্ভর করে ইন্টারোগেশন টীম ও জল্লাদরা সেদিন অতি উৎসাহী ছিল কিনা তার ওপর। মরে গেছে মনে করে জ্যান্ত মানুষও তুলে দেয়া হয় ট্রাকে। পচা মাংসের দুর্গন্ধ কারাগারের প্রতি ইঞ্চি দূষিত করে রেখেছে।

দরজার বাইরে পায়ের আওয়াজ থামল। চাবির শব্দ হলো, খুলে গেল তালা, ভারি দরজা ফাঁক হলো। দু'জন গার্ডকে ভেতরে ঢুকতে দেখে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল আনিস সিদ্দিকীর। বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তিনি, মেজর কাগলিকে চিনতে পারছেন।

কাগলির ঠোঁটে হাসির রেখা। হাতের ছড়ি দিয়ে আনিস সিদ্দিকীর পেটে খোঁচা মারল সে। মেঝেতে ঘষা খেয়ে দেয়ালের দিকে সরে গেলেন তিনি। আহত পশুর মত দুর্বোধ, কাতর ধ্বনি বেরিয়ে এল গলার ভেতর থেকে।

কাগলির পিছনে খোলা দরজায় আরও দু'জন গার্ডকে দেখা গেল, কাকে যেন ধরাধরি করে বয়ে আনছে। ঝর ঝর করে রক্ত ঝরতে দেখলেন আনিস সিদ্দিকী।

তাঁকে খামচে ধরে দাঁড় করানো হলো। একজন গার্ডের টিউনিকে চোখ আটকে গেল তাঁর। হলুদ, মাখনের মত কি যেন লেগে রয়েছে ওখানে। সেই সঙ্গে তীব্র দুর্গন্ধে বমি করে ফেললেন তিনি। চিৎকার করতে চাইলেন, কিন্তু গলাটা ভেঙে গেল, 'তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

কাগলি বলল, শেষ যাত্রার জন্যে আপনাকে প্রস্তুতি নিতে হবে, মি. সিদ্দিকী।'

অসহায় আনিস সিদ্দিকী ধস্তাধস্তি শুরু করলেন। 'না! যাব না! প্লীজ, ছেড়ে দাও আমাকে, প্লীজ!' গার্ডদের লক্ষ্য করে লাথি ছুঁড়লেন তিনি, তবে দুর্বল শরীরে জোর নেই, কোন কাজে লাগল না।

টেনে-হিঁচড়ে প্যাসেজে বের করে আনা হলো তাঁকে। ইতিমধ্যে বেহুঁশ হয়ে গেছেন তিনি। পাথরের মেঝে রক্ত, মল আর মগজে পিচ্ছিল হয়ে আছে।

দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসা আকাশের নিচে নিষ্প্রভ ও অসাড় পড়ে আছে কেনডুরা। বস্তি ও বেশ্যা পাড়ায় টিমটিম করে দু'একটা হ্যারিকেন বা কুপি জ্বলছে, বেড়ার ফাঁক-ফোকরে ক্ষীণ আলো দেখা যায়। শহরের মাঝখানটা একটু বেশি আলোকিত। তবে শহরের বেশিরভাগ বিল্ডিং অন্ধকার।

কেনডুরা এভিনিউয়ের মত দু'একটা রাস্তার টিউব বাতি জ্বলছে। কেনডুরা এভিনিউ খুব চওড়া, শহরটাকে দু'ভাগ করেছে, এগিয়েছে বোগামুরার কমান্ড পোস্টের উঁচু পাঁচিলের সামনের দিকে। পাঁচিলটার পিছনে গুড়ি মেরে বসে আছে প্রেসিডেন্টের বডিগার্ডরা—চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কান খাড়া।

গলিগুলো শূন্য খালের মত, মোড়ে মোড়ে আবর্জনার পাহাড়। বন্ধ দোকান-পাট। সন্ধের আগেভাগেই বন্ধ হয়ে গেছে সব। রাজধানীর ওপর অশুভ একটা পর্দার মত ঝুলে আছে ধোঁয়াটে কুয়াশা। চারদিকে ভৌতিক অন্ধকার, গোরস্থানের নিস্তব্ধতা।

বাঁক ঘুরে ধীরগতিতে এগোল ট্রাকটা, রাস্তার মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে, হেডলাইটের আলোয় তেমন উজ্জ্বলতা নেই। আরোহী মাত্র দু'জন, ড্রাইভারের পাশে আরও একজন বসে আছে। দু'জনেই মাকেসি গোত্রের খ্রিস্টান, চেহারাই বলে দেয় নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। হাত-কাটা শার্ট পরে আছে তারা, উজ্জ্বল রঙের নকশাদার কাপড়। ডস-এর ডিজপোজাল স্কোয়াড মাবোরুতে যাচ্ছে লাশ আনতে।

রাস্তার ওপর মূর্তিটাকে দু'জনেই তারা দেখতে পেল। মিটমিট করা হেডলাইটের আলোয় দাঁড়িয়ে হাতছানি দিচ্ছে। তাদের মত একই ধরনের কাপড়চোপড় পরনে, নকশাদার শার্ট ও স্ল্যাকস—প্রেসিডেন্ট বোগামুরার সিকিউরিটি ফোর্স-এর সদস্য। আরেকবার হাতছানি দিয়ে পায়ের সামনে পড়ে থাকা গাঢ় বস্তাটার দিকে তাকাল সে। তারপর দেখা গেল, না, বস্তা নয়; খালি গায়ে একটা মানুষ—পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখে মনে হলো হয় হুঁশ নেই, নয়তো মারা গেছে। দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা মুখ তুলে আরেকবার হাত নাড়ল, তার অপর হাতে একটা মেশিন পিস্তল রয়েছে।

মাঝখান থেকে সরে এসে রাস্তার ধারে থামল ট্রাক। দরজা খুলে নিচে নামল ড্রাইভার আর তার সঙ্গী, শোল্ডার হোলস্টার থেকে হাতে চলে এসেছে অটোমেটিক পিস্তল। 'কি ঘটছে এখানে?' ড্রাইভারকে অনিশ্চিত দেখাল। তার গলার আওয়াজ কর্কশ ও অমার্জিত। ফুটপাথের কিনারায় পড়ে থাকা শরীরটার দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকাল সে।

দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা জবাব দিল, 'এ ব্যাটা একটা দোকান লুঠ করছিল। আমাকে দেখে দৌড় দেয়, এখানে এসে ধরে ফেলি আমি। ব্যাটা আমাকে খুন করতে চেয়েছিল, তাই উচিত শাস্তি দিয়েছি।' লাশটার গায়ে একটা লাথি মারল সে। 'মড়াটাকে আমি ডাস্টবিনে ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম, এই সময় তোমাদের ট্রাক দেখতে পেলাম। শুয়োরটাকে তুলে নাও তোমরা, বাকি লাশের সঙ্গে ফেলে দিয়ো পানিতে।'

অন্ধকারে থুথু ছিটাল ড্রাইভার। তার সঙ্গী বলল, 'একটা বেশি হলে অসুবিধে নেই।'

মেশিন পিস্তলটা হাত বদল করে হাঁটু গেড়ে বসল লোকটা, লাশের নিচে থেকে কি যেন টেনে আনছে। হাতটা বেরিয়ে এল একটা ম্যাশেটি নিয়ে। প্রায় দু'ফুট লম্বা সেটা, চ্যাপ্টা ফলা। 'এটা দিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিল। এসো, সাহায্য করো আমাকে, লাশটা তুলে দিই ট্রাকে।'

হোলস্টারে অস্ত্র গুঁজে রেখে সাহায্য করতে এগোল ওরা। লাশ ডিঙাল ড্রাইভার, দু'হাতে ধরে উল্টো করল শরীরটা। হঠাৎ বিস্ময়ে ঝুলে পড়ল তার মুখ। লুঠেরা হাসছে।

কেউটের ক্ষিপ্র ছোবলের মত নড়ে উঠল রানা। ড্রাইভারের কলার ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে তুলে ফেলল শূন্যে।

ডসের দ্বিতীয় সদস্যের প্রতিক্রিয়া হলো দ্রুত। হাত উঠে গেল শোল্ডার হোলস্টারে, আধ পা পিছু হটল।

ফরহাদের হাতে ঝলসে উঠল ম্যাশেটি। বাতাসে শিস কাটল ফলাটা, দু'ফাঁক করে দিল নিষ্ঠুর মুখ, চওড়া অবয়ব রক্তের নালা হয়ে উঠল—থেঁতলানো মাংস, হাড়ের গুঁড়ো সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে ম্যাশেটির ফলা বের করে নিল ফরহাদ।

মাথার ওপর তুলে ড্রাইভারকে পাঁচিলের গায়ে ছুঁড়ে দিল রানা। পাঁচিলে বাড়ি খেয়ে ফুটপাথে পড়ার পর সে আর নড়ল না, ফাটা খুলি থেকে রক্ত গড়াচ্ছে।

ছায়া থেকে ছুটে বেরিয়ে এল দুটো মূর্তি।

'মাসুদ ভাই, সব ঠিক আছে তো?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল জাফর।

মাথা ঝাঁকাল রানা, 'জামিল, রাস্তা থেকে সরাও ওদের। জানোই তো কি করতে হবে।' কথা বলছে, কাঁধে টোকা অনুভব করল, তারপর ঘাড়ে। মুখ তুলল ও, তৃতীয় ফোঁটাটা আঘাত করল কপালে। এক সেকেন্ড স্থির হয়ে থাকল ও, কি ঘটছে উপলব্ধি করছে, বুঝতে পারছে ব্যাপারটা ওদের কঠিন অভিযানে অমূল্য অবদান রাখতে পারে।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

লাশ লুকিয়ে রাখা হলো পরিত্যক্ত ও ভাঙাচোরা একটা বাড়ির ভেতর। ইতিমধ্যে ভিজে গেছে ওরা। কড়কড় করে মেঘ ডেকে উঠল, বিদ্যুৎচমকের সঙ্গে বেড়ে গেল বৃষ্টির বেগ। ফরহাদকে নিয়ে বেডফোর্ডে উঠল রানা। ফরহাদ ইতিমধ্যে আর্মি ফেটিগ পরে নিয়েছে। কাছাকাছি লুকিয়ে রাখা হয়েছে রেঞ্জরোভারটা, জাফরকে নিয়ে সেদিকে ছুটল জামিল। ক্যাব-এর মাথার ওপর একটানা গুলিবর্ষণের মত আওয়াজ করছে বৃষ্টি। উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে সামনে তাকাল রানা। বনেট থেকে ত্রিশ গজ দূরে কি আছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

বৃষ্টির পর্দা ভেদ করে মাবোরু কারাগারের মেইন গেটের দিকে এগিয়ে আসছে ট্রাকটা, ঘড়ঘড় আওয়াজ করছে এঞ্জিন। প্রবেশপথের মাথার ওপর লাইটগুলো জ্বলে উঠল, আলোর টানেলগুলো গ্রাস করল ওটাকে। আরও খানিক এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল বেডফোর্ড।

বাম দিকের গেটে, চোখ বরাবর উঁচুতে, খুলে গেল ট্র্যাপ ডোর, সন্দেহ ভরা কালো একটা মুখ দেখা গেল ফাঁকটায়। ট্রাকের ওয়াইপার ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে, তার ফাঁক

দিয়ে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকাল ফরহাদ, একটা হাত অলস ভঙ্গিতে স্থির হয়ে আছে স্টিয়ারিং হুইলে, অপর হাতটা হাঁটুতে পড়ে থাকা হেকলার অ্যান্ড কচ-এর স্টক ধরে আছে।

পাঁচিলের মাথা থেকে গার্ডরা সার্চ লাইটের দিক পরিবর্তন করল, ভোঁতা বনেটে সাদা আলোর বন্যা বয়ে গেল। সামান্য আড়ষ্ট হয়ে উঠল ফরহাদ, তবে জানে তুমুল বৃষ্টির মধ্যে কিছুই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না গার্ডরা।

হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল ট্র্যাপ। কয়েক সেকেন্ড কিছুই ঘটল না। তারপর ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ তুলে খুলে যেতে শুরু করল গেট। ধীরে ধীরে আটকে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল ফরহাদ। ক্লাচ ছেড়ে কাদার ওপর দিয়ে ট্রাক নিয়ে এগোল সে। ট্রাক এগোচ্ছে, সার্চ লাইটের আলোও সেটাকে অনুসরণ করছে।

একশো গজের কিছু কম দূরে, রাস্তার ধারের একটা ঝোপের ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে জামিল দেখল ট্রাকটাকে গিলে ফেলল হাঁ করা গেট। তার পরনে বাঘের ছাপমারা শার্ট ও স্ল্যাকস, ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর থাকায় দেখলেও কেউ মানুষ বলে চিনতে পারবে না। ঝোপের ভেতর দিয়ে সাবধানে এগোল সে, কারাগারের পাঁচিল লক্ষ্য করে হাঁটছে।

পাঁচ

গেট দিয়ে পাঁচিলের ভেতর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পচা মাংসের গন্ধ প্রচণ্ড ঘুসির মত আঘাত করল ফরহাদের নাকে। গেটের পর বিশাল উঠান, বাম দিকের পাঁচিলে গার্ড পোস্ট তৈরি করা হয়েছে, প্রবেশপথের ঠিক লাগোয়া। সামনে আরও একটা খিলান দেখা যাচ্ছে, একটু নিচু, তারপর মূল উঠান, সেটাকে দু'ভাগ করেছে মাঝখানের এক সারি সেল। আমস্টারডামে থাকতেই কারাগারের লেআউট সম্পর্কে ধারণা পেয়েছে ফরহাদ, সর্বশেষ তথ্য পাওয়া গেছে ড. গনির কাছ থেকে। ভেতরের খিলান দিয়ে মূল উঠানে ঢুকছে সে, জানে ডান দিকে জাল দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় লাশগুলো স্তূপ করা হয়, পাঁচিল ঘেঁষে। দ্বিতীয় খিলানের পাশেও একটা গার্ড পোস্ট রয়েছে, ভেতর থেকে ক্যাপ মাথায় একজন বেরিয়ে এল, কাঁধে কালাশনিকভ রাইফেল। কঠিন সুরে একটা নির্দেশ দিল সে, সেই সঙ্গে সার্চ লাইট ঘুরে গেল, একই সঙ্গে আউটার ওয়াল ও দ্বিতীয় খিলানের ভেতর উঠানটা আলোকিত হয়ে উঠল। পাঁচিলের ওপর স্পটলাইটও আছে, আছে ফ্লাডলাইট। সবগুলোর আলো পড়ল ট্রাকের ওপর।

এগিয়ে আসছে গার্ড। মেশিন পিস্তলের ট্রিগারে শক্ত হলো ফরহাদের আঙুল।

'তুমি একা?' চোখে সন্দেহ, ক্যাব-এর পাশে দাঁড়িয়ে কঠিন দৃষ্টিতে ফরহাদকে দেখছে গার্ড। 'তোমার সঙ্গী কই?'

দাঁত দেখিয়ে হাসল ফরহাদ। 'তার মেয়েমানুষ তাকে আটকে দিয়েছে।' অশ্লীল একটা ইঙ্গিত করল সে। 'এরকম বৃষ্টি ঝরা রাতে মেয়েমানুষ ছেড়ে কেউ বেরুতে চায়? নিজে বোঝো না? আর মেয়ে তো নয়, হস্তিনী—শালাকে একেবারে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলবে।'

হে-হে করে হেসে উঠে এক পা পিছিয়ে গেল গার্ড। 'শালা ভাগ্যবান!'

ক্লাচ ছেড়ে দিল ফরহাদ।

'থামো!'

পাথর হয়ে গেল ফরহাদ। কাঁধ থেকে রাইফেল নামাচ্ছে গার্ড। হাঁটু থেকে মেশিন পিস্তলটা এক ইঞ্চি তুলল ফরহাদ। ট্রাকের পিছন দিকে হেঁটে যাচ্ছে গার্ড, সাইড মিররে চোখ রেখে তাকে দেখছে সে। পাঁজরে ঘন ঘন গুঁতো মারছে হৃৎপিণ্ড। বেডফোর্ডের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল গার্ড। ফরহাদ জানে, পিছনের ক্যানভাস ফ্ল্যাপটা তুলবে ব্যাটা।

ফিরে এল লোকটা। ঢিল পড়ল ফরহাদের পেশীতে।

ধমক দিল গার্ড, 'দাঁড়িয়ে আছ কি মনে করে? যাও, ট্রাক ভরো। শুয়োরগুলো পচতে শুরু করেছে।' পিছিয়ে যেতে শুরু করল সে।

গ্যাস পেডালে চাপ দিয়ে ট্রাক ছেড়ে দিল ফরহাদ, উঠানের ভেতর দিয়ে এগোল। হেডলাইটের ম্লান আলোয় সামনে শুধু বৃষ্টি দেখা যাচ্ছে, ঝাপসা পর্দার মত। ধুলো ভরা উঠানটা এখন থকথক করছে কাদায়। ধীরে ধীরে বাঁক ঘুরল ফরহাদ। সামনে দুই পাঁচিল এক হয়েছে, কোণটার দিকে এগোল সে।

ট্রাক থামিয়ে এঞ্জিন বন্ধ করল ফরহাদ, ক্যাবের খোলা জানালা দিয়ে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে। দৃষ্টি আটকে গেল পাঁচিলের কোণে, মরদেহের স্তূপটার ওপর। দোমড়ানো-মোচড়ানো শরীরগুলো দেখে হু-হু করে উঠল তার বুকটা। মানুষ যে পশুরও অধম, কথাটা আরেকবার উপলব্ধি করল সে। মুখ-বন্ধ পাঁচ-সাতটা বস্তা পড়ে রয়েছে লাশগুলোর সঙ্গে।

উঠানের এক ধারে একটা বারান্দা দেখা যাচ্ছে। টিনের ছাদ, নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন গার্ড, বৃষ্টির ভেতর দিয়ে এদিকেই তাকিয়ে। তারা নড়ছে না দেখে ক্যাব ডোর খুলে লাফ দিল ফরহাদ, নিচে নামতে না নামতে ভিজে গোসল হয়ে গেল।

বেডফোর্ডের নিচে, চেসিসের তলায়, হারনেস-এর সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে রানা ও জাফর। হারনেস খুলে নিঃশব্দে কাদার মধ্যে নামল ওরা। ওদের পরনে ক্যামোফ্লেজ সুট, মুখে কালো সুতী স্কি মাস্ক।

দু'জনের কাছেই একটা করে মেশিন পিস্তল রয়েছে, শোল্ডার হোলস্টারে আছে ব্রাউনিং, কোমরে খাপের ভেতর গোঁজা কমান্ডো নাইফ। রেমিংটনটা স্ট্র্যাপ দিয়ে পিঠে আটকে নিয়েছে রানা। ওয়েস্ট প্যাকে রয়েছে স্পেয়ার ম্যাগাজিন। রানার কাছে অতিরিক্ত জিনিস বলতে গ্রেনেড আর শটগানের শেল রয়েছে।

কাদার ওপর দিয়ে হেঁটে ট্রাকের পিছনে চলে এল ফরহাদ, টেইলবোর্ড নিচু করল। 'দু'জন গার্ড,' শান্ত সুরে বলল সে। 'আপনাদের বাম দিকে, বারান্দার ওপর। আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না।'

'শুনলাম, ফরহাদ,' ট্রাকের তলা থেকে বলল রানা।

জাল ঘেরা জায়গাটার ভেতর ঢুকল ফরহাদ। অসংখ্য চোখে পানি, কিন্তু দৃষ্টিতে প্রাণ নেই, তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে দেখল, কোন কোন হাতের আঙুল বড়শির মত বাঁকা; কোন কোন খোলা মুখের ভেতর ফুলে ঢোল হয়ে আছে জিভ। দম আটকে দুর্গন্ধ ঠেকাবার চেষ্টা করল সে। পিছিয়ে বেরিয়ে এল আবার, ঘুরে চলে এল ট্রাকের কাছে। চিৎকার করে বলল, 'এই যে, শুনছ তোমরা! আমার সাহায্য দরকার। জলদি এসো! মেজর কাগলির অর্ডার!'

বিরক্ত হলেও, মেজর কাগলির নাম শুনে বারান্দা থেকে বৃষ্টির মধ্যে নেমে এল গার্ড দু'জন, আবহাওয়া আর ফরহাদের চোদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করছে। ট্রাকের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে বৃষ্টি থেকে বাঁচার ব্যর্থ চেষ্টা করল তারা, কপাল থেকে ভেজা চুল সরাচ্ছে।

কাজ শুরু করল রানা ও জাফর। গার্ড দু'জনের পা ধরে টান দিতেই পড়ে গেল। বাকি কাজ সারল ফরহাদ। একজন গার্ডের হাত থেকে খসে পড়া রাইফেলটা তুলে নিয়ে বাঁট দিয়ে আঘাত করল দু'জনের মাথায়।

ট্রাকের তলা থেকে বেরিয়ে এল রানা ও জাফর।

পাঁচিলের গার্ডরা লাশগুলোর ওপর সার্চলাইটের আলো স্থির ভাবে ধরে রেখেছে। বেডফোর্ডের ছায়া ও বৃষ্টির মধ্যে রানা বা জাফরকে তারা দেখতে পেল না।

'গার্ড দু'জনকে ট্রাকের পিছনে তুলে দাও, ফরহাদ, তারপর এক এক করে লাশগুলো নিয়ে এসো। একাই সারতে হবে তোমাকে, জাফরকে নিয়ে আমি সিদ্দিকী সাহেবকে আনতে যাচ্ছি।' এক সেকেন্ড চিন্তা করে আবার বলল, 'তাঁর সঙ্গে আমরাও ট্রাকের পিছনে লাশগুলোর সঙ্গে থাকব, ক্যানভাসের নিচে। গেট দিয়ে বের করে নিয়ে যাবার দায়িত্ব তোমার।'

একটা ঢোক গিলে মাথা ঝাঁকাল ফরহাদ।

মুহূর্তের জন্যে ফরহাদের কাঁধে হাত রাখল রানা। 'লাশগুলো ট্রাকে না তুলে উপায় নই, ফরহাদ। তা না হলে পাঁচিলের গার্ডরা সন্দেহ করবে।'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই। আপনারা আর দেরি করবেন না, যান,' বলে ঘুরে দাঁড়াল ফরহাদ।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা ও জাফর, তারপর বৃষ্টির মধ্যে ভূতের মত মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

ধীর পায়ে লাশগুলোর কাছে ফিরে এল ফরহাদ, আড়ষ্ট একটা হাত ধরে টান দিল।

সামান্য উঁচু বারান্দাটা শুকনো, তবে ছাদের কিনারা থেকে জলপ্রপাতের মত পানি ঝরছে। পাঁচিলের মাথা থেকে এখানে ওদেরকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। কাছাকাছি একটা দরজা দেখে ঠেলা দিল রানা। ভেতরে একটা প্যাসেজ দেখা গেল, মাথায় একটা মাত্র বালব জ্বলছে, বিল্ডিংটার এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত লম্বা। দেয়ালের দু'পাশে সেলের দরজা। কোন গার্ড নেই। প্যাসেজে পাহারায় ছিল মাত্র দু'জন গার্ড, বৃষ্টি দেখার জন্যে বারান্দায় বেরিয়ে নিজেদের কপাল পুড়িয়েছে। সেলের দরজা গুণল রানা, আনিস সিদ্দিকীর থাকার কথা তিন নম্বর সেলে। অন্তত ড. গনি তাই জানিয়েছেন। পরে অবশ্য বন্দীকে অন্য সেলে সরানো হতে পারে। সেক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেবে।

দুর্গন্ধে গা ঘিন ঘিন করছে। পাথরের মেঝে পিচ্ছিল হয়ে আছে, হড়কে যাচ্ছে জুতোর তলা। তিন নম্বর সেলের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা।

দরজায় একটা ট্র্যাপ আছে। ঢাকনি সরিয়ে খুদে কামরার ভেতর চোখ রাখল রানা। ওকে কাভার দিচ্ছে জাফর। অবিশ্বাস্যই বলতে হবে, কারও চোখে ধরা না পড়ে এ-পর্যন্ত পৌছুতে পেরেছে ওরা। এমন টান টান হয়ে আছে নার্ভ, মনে হলো ছিঁড়ে যাবে।

কামরার ভেতর চোখ বুলাতে দু'তিন সেকেন্ড সময় নিল রানা। লোহার রড লাগানো জানালা দিয়ে আলো ঢুকেছে ভেতরে, তাতে দেখা গেল সেলটা প্রায় নয় বর্গ

ফুট, একদিকের দেয়াল ঘেঁষে একটা ছেঁড়া কম্বল পড়ে রয়েছে। আরেক কোণে একটা বালতি।

কম্বলের ওপর শরীরটা চাদরে ঢাকা, দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে, হাঁটু দুটো ভাঁজ করা, যেন শীতে জড়োসড়ো হয়ে আছে। টিনের ছাদে তুমুল বৃষ্টির শব্দ হলেও আনিস সিদ্দিকী অঘোরে ঘুমাচ্ছেন বলে মনে হলো।

'উনি ভেতরে আছেন, জাফর। এসো, ঢুকি। লাক বেশিক্ষণ ফেভার করবে না।'

বড় একটা বোল্ট দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে দরজা। টেনে সরাবার চেষ্টা করতেই ধাতব শব্দ হলো, ছ্যাঁৎ করে উঠল ওদের বুক।

'আস্তে!' ফিসফিস করল রানা।

প্যাসেজে কেউ এল না, কোথাও কোন শব্দও হচ্ছে না। বোল্ট ধরে আবার টান দিল জাফর।

'যাও, বের করে আনো ওঁকে, আমি কাভার দিচ্ছি। সাবধানে, উনি সুস্থ নন।'

সেলের ভেতর ঢুকে পড়ল জাফর। 'মি. সিদ্দিকী!' শুয়ে থাকা শরীরটার ওপর ঝুঁকে ফিসফিস করল সে। সাড়া না পেয়ে তাঁর কাঁধ ছুঁলো। মাথা ও কাঁধ থেকে খসে পড়ল চাদরটা, তারপর শরীরটাও কাত হয়ে পড়ল। পরমুহূর্তে উপলব্ধি করল জাফর, মারাত্মক একটা ভুল করেছে তারা।

কোথায় আনিস সিদ্দিকী, কম্বলের ওপর পড়ে রয়েছে গলাকাটা একটা লাশ। আনিস সিদ্দিকীর রঙিন ফটো দেখেছে জাফর, তিনি ফর্সা ও বৃদ্ধ। গলাকাটা লাশটা তাঁর হতে পারে না, কারণ এ লাশ একজন যুবকের, গায়ের রঙ কুচকুচে কালো।

শুধু যে গলা কাটা হয়েছে তা নয়, মৃতের হাত ও পা কেটে এমনভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে দেখে যাতে মনে হয় হাঁটুর ওপর মাথা রেখে বসে আছে কোন লোক। বুকে একটা গভীর গহ্বর দেখা গেল, যেন ভেতর থেকে সব বের করে নেয়া হয়েছে।

লাশটা ঢলে পড়ার পর ভুল উপলব্ধি করার জন্যে মাত্র পাঁচ সেকেন্ড সময় পেল জাফর। মৃতদেহ নড়তেই বুকের নিচে কারিগরি ফলানো গ্রেনেডটা বিস্ফোরিত হলো।

সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল জাফর। বদ্ধ জায়গার ভেতর কণা কণা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল তার শরীর।

সেলের বাইরে, দরজার পাশে গুড়ি মেরে বসে থাকায় বেঁচে গেল রানা, যদিও প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো ও, কানের ভেতর শোঁ শোঁ আওয়াজ হচ্ছে। লাফ দিয়ে দরজার সামনে পড়ল, মোচড়রত ধোঁয়ার ভেতর অস্পষ্টভাবে ভাঙা হাড়গোড় ও ছিন্নভিন্ন মাংস দেখে যা বোঝার বুঝে নিল। গোটা ব্যাপারটাই আসলে একটা ফাঁদ, শুধু এই কথাটা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না ও। প্রতিক্রিয়া হলো স্বতস্ফূর্ত। মেশিন পিস্তল কক করে বন করে ঘুরল, আসন্ন হামলার মুখোমুখি হবে।

ওর ধারণা মিথ্যে নয়। প্যাসেজের শেষ মাথার দরজা দড়াম করে খুলে গেল, ছুটে আসছে তিনজন গার্ড। ঝোঁকের মাথায় খোলা প্যাসেজে বেরিয়ে এসেছে, তারপর উপলব্ধি করল একজন বেঁচে আছে। ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে।

হেকলার অ্যান্ড কচ থেকে এক পশলা বুলেট বৃষ্টি হলো। শরীরগুলো ঝাঁঝরা হচ্ছে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যেন নাচানাচি করছে তিনজন। এরইমধ্যে প্যাসেজ ধরে পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে রানা। একটা সেল থেকে আরও দু'জন গার্ড বেরিয়ে এল,

গুলি করল রানাকে লক্ষ্য করে। বসে পড়ল ও, মাথার অনেক ওপর দিয়ে ছুটে গেল বুলেট। পাল্টা গুলি করল, ঝাঁকি খেতে খেতে পিছিয়ে গেল গার্ড দু'জন।

দরজার কাছে পৌঁছুল রানা, হাতে গ্রেনেড বেরিয়ে এসেছে। প্যাসেজের মেঝেতে গড়িয়ে দিল সেটা, লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল বারান্দায়। প্যাসেজে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড, তারপরই তীক্ষ্ণ একটা আর্তচিৎকার শোনা গেল।

ঝমঝম বৃষ্টি হচ্ছে এখনও। উঠান এখন খোলা বধ্যভূমি। বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে উঠছে গালাগালি, ডাকাডাকি আর ছুটোছুটির আওয়াজ। দূরের পাঁচিল থেকে ফেলা সার্চলাইটের আলো ছুটোছুটি করছে উঠানে।

গুলি আর শোরগোলের আওয়াজ পেয়ে লাফ দিয়ে ক্যাব-এ উঠে পড়েছে ফরহাদ। গর্জে উঠল এঞ্জিন, ট্রাকের মেঝেতে ক্লাচ চেপে ধরল সে। হাতের মেশিন পিস্তলটা জানালা দিয়ে বের করে গুলি করল ওপর দিকে, বিস্ফোরিত হলো কাঁচ, নিভে গেল একটা সার্চলাইট। উঠানের কিনারায় ঝাপসা মূর্তি দেখা যাচ্ছে, বৃষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। রানাকেও দেখতে পাচ্ছে না সে।

'মাসুদ ভাই!' চিৎকার করল ফরহাদ।

অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল কালো একটা মূর্তি, ফরহাদ শুনতে পেল রানা চিৎকার করছে, 'গো! গো! গো!'

উঁচু কোন জায়গা থেকে গুলি করায় রানার পায়ের চারধারে উথলে উঠছে কাদা। হাতের অস্ত্র তুলে আরেক পশলা গুলি করল ও। পাঁচিলের মাথা থেকে আর্তচিৎকার ভেসে এল, কিনারা থেকে খসে পড়ল একটা শরীর। লক্ষ্যস্থির করেনি রানা, ভাগ্যগুণে লাগাতে পেরেছে।

একই সঙ্গে ক্লাচ ছেড়ে দিয়ে গ্যাস পেডালে চাপ দিল ফরহাদ। বেডফোর্ড পিছিয়ে যাবার ভঙ্গি করল। কাদায় পিছলে যাচ্ছে চাকা, এই সময় বিস্ফোরিত হলো উইন্ডস্ক্রীন, প্যাসেঞ্জার সীট ফুটো করে দিল একটা বুলেট।

কাদার নিচে শক্ত মাটি কামড়ে ধরল চাকা, ছুটে এসে ট্রাকের পিছনে ঝুলন্ত ক্যানভাসের একটা প্রান্ত ধরে ফেলল রানা। ক্যানভাসের অপর প্রান্তটা ক্যাবের পিছনে আটকানো, ফলে ট্রাক ছুটতে শুরু করলেও রানার হাত থেকে ওটা বেরিয়ে গেল না। ট্রাকের সঙ্গে তিন-চার কদম ছুটল ও, তারপর লাফ দিয়ে উঠে পড়ল, অপর হাতে এখনও ধরে আছে হেকলার অ্যান্ড কচ।

ট্রাকের পিছনে উঠে ঘাড় ফেরাতেই দেখল দু'জন গার্ড ছুটে আসছে। বুলেটগুলো দু'পাশের লাশে বিদ্ধ হচ্ছে। কোমরের কাছে নড়ে উঠল রানার একটা হাত, বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে মেখে গার্ড দু'জনের দিকে ছুটল কালো একটা বল।

দু'জনের মধ্যে একজন সামনে এগিয়ে এসেছিল, তার ঠিক সামনে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেডটা। ছাত হয়ে গেল সে, অপর লোকটা কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে লাফ দিয়ে একপাশে সরে যাওয়ায় শুধু আহত হলো।

ট্রাকের সামনে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল দু'জন লোক, কোমরের কাছ থেকে গুলি করছে। বন বন করে হুইল ঘোরাল ফরহাদ, অনুভব করল ক্যাবের ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে বুলেটগুলো। তারপরই মটমট করে রোমহর্ষক শব্দ শোনা গেল, বাধা পাওয়ায় ভোঁতা আওয়াজ ভেসে এল চাকা থেকে, কাছাকাছি লোকটার পিঠ গুঁড়িয়ে

দিয়ে সামনে এগোল বেডফোর্ড, অপর লোকটা ছিটকে দূরে সরে গেছে। ঝাঁকি খেতে খেতে খিলানের ভেতর দিয়ে সামনের উঠানে বেরিয়ে এল ট্রাক।

ঝোপের ভেতর হাঁটু গেড়ে বসে ভিজছে জামিল। গুলি, গ্রেনেড আর চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দের অপেক্ষায় ছিল সে, এগুলোই তার সঙ্কেত। প্যাক থেকে ছোট, বাক্সের মত দেখতে ট্র্যান্সমিটার বের করে সুইচে চাপ দিল।

ট্রাকটা জেলখানায় ঢোকার পর পাঁচিল ঘেঁষে এগোয় জামিল, বৃষ্টি আর অন্ধকারের ভেতর কেউ তাকে দেখতে পায়নি, পাঁচিলের গার্ডরা উঠানের ভেতর আলো ফেলতে ব্যস্ত ছিল। কাজ সেরে আগের জায়গায় অর্থাৎ ঝোপের ভেতর ফিরে আসতে খুব বেশি সময় নেয়নি সে। কাজ মানে মেইন গেটে কয়েকটা চার্জ রেখে এসেছে। বোতামে চাপ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো সেগুলো, দেশলাইয়ের কাঠির মত টুকরো টুকরো হয়ে গেল গেটটা, ঠিক যখন ভেতরের খিলান দিয়ে সামনের উঠানে ঢুকছে বেডফোর্ড।

ওটাই ওদের সবচেয়ে দুর্বল পয়েন্ট ছিল, ভেতরের উঠান থেকে বেরিয়ে আসা।

ভেতরে ঢোকা যায় দু'ভাবে। শক্তি প্রয়োগ করে, নয়তো গোপনে। পালিয়ে আসার ব্যাপারটাও তাই। ওরা জানত, কারও চোখে ধরা না পড়ে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। সেজন্যেই সাবধানের মার নেই ভেবে সম্ভাব্য সব ব্যবস্থাই করে রেখেছে রানা। জামিলকে বিস্ফোরক দিয়ে বাইরে রেখে যাবার কারণ হলো, বিস্ফোরিত গেট কারারক্ষীদের মনোযোগ কেড়ে নেবে, ফলে জাফরকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার একটা সুযোগ পাবে ও।

গার্ড হাউস থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসছে রক্ষীরা, হাতে অস্ত্র থাকলেও এখনও বাগিয়ে ধরার সময় পায়নি, চিৎকার করে পরস্পরকে সাবধান করছে, এই সময় হতভম্ব হয়ে লক্ষ করল ওদের দিকে ঘুরে গিয়ে ট্রেনের মত ছুটে আসছে ট্রাকটা।

তারপরই বিস্ফোরিত হলো গেট, শক ওয়েভের ধাক্কায় বৃষ্টি আর কাদার মধ্যে ছিটকে পড়ল রক্ষীরা। লোহার একটা সরু পাত একজন গার্ডের পেট দিয়ে ঢুকে চিবুকের নিচে গলা থেকে বেরিয়ে এল। আরেকজনের পিঠে একটা রড ঢুকল, বুক ফুটো করে বেরিয়ে আসা প্রান্তটা গেঁথে গেল কাদায়, দেশলাইয়ের ভাঙা কাঠির মত ঝাঁকি খাচ্ছে হাত আর পা।

রক্ষীরা সবাই ছিটকে পড়েনি, ট্রাকটাকে ছুটে আসতে দেখে আড়াল পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল তারা, গুলি করছে লক্ষ্যস্থির না করেই।

ডান কাঁধের ওপর দিকে বুলেট খেলো ফরহাদ, পেশীর খানিকটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল গুলি। ধাক্কা খেয়ে সীটের পিছনে সেঁটে গেল সে, হাত থেকে স্টিয়ারিং হুইল ছুটে যাওয়ায় চিৎকার করে উঠল, দাঁতে দাঁত চেপে আবার মুঠোর ভেতর ধরল সেটা। উইন্ডস্ক্রীন না থাকায় পানিতে ভেসে যাচ্ছে ক্যাব। নিশ্চিহ্ন গেটের দিকে ছুটছে বেডফোর্ড।

স্কি মাস্ক খুলে ফেলে দিল রানা, বেডফোর্ডের কিনারা ধরে ঝাঁকি সামলাবার চেষ্টা করছে। হাতে হেকলার অ্যান্ড কচটা নেই, তবে কাঁধে রেমিংটনটা আছে। একটা মড়ার হাত ছুঁয়ে দিল ওর মুখ, সেটা এক ঝাপটায় সরিয়ে দিয়ে পিছনের লাশগুলোর

দিকে তাকাল ও।

বিস্ফোরিত মেইন গেটের দিকে ছুটছে ট্রাক, আড়াল থেকে এলোপাতাড়ি গুলি করছে রক্ষীরা। রানার হাতে গর্জে উঠল রেমিংটন, পাঁচিলের ছাল উঠে যাচ্ছে। এক জায়গায় কয়েকজন রক্ষী জড়ো হয়েছে দেখে একটা গ্রেনেড ছুঁড়ল ও। ছিটকে গেল সবাই, তারপর আবার ছুটে এল। রানার মুখে ক্যানভাসের একটা প্রান্ত ঘন ঘন বাড়ি মারছে শকুনের ডানার মত। মাথা নামিয়ে নিল ও, অনুভব করল একটা বুলেটের বাতাস লাগল গলায়।

আবার ঝাঁকি খেলো ট্রাক, চাকার পিছন থেকে থেঁতলানো একটা লাশ বেরিয়ে আসতে দেখল রানা, রক্ত ও কাদায় মাখামাখি হয়ে আছে। আবার গর্জে উঠল রেমিংটন, এক সেকেন্ড পর নিভে গেল আর্ক লাইট। পরমুহূর্তে কারাগার থেকে বেরিয়ে এল বেডফোর্ড।

ট্রাকটাকে কামানের একটা গোলার মত ছুটে আসতে দেখল জামিল, লাফ দিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল সে। দেখতে পেয়ে গতি সামান্য কমাল ফরহাদ, রানার বাড়ানো হাতটা ধরে ফেলল জামিল।

'আমি তো ভাবলাম তোমরা বুঝি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছ।' হাঁপাচ্ছে জামিল, রানা তাকে টেনে ট্রাকের পিছনে তুলে নিয়েছে। 'আমি ধরেই নিয়েছিলাম তোমরা বেরিয়ে আসতে পারবে না।'

'গেটটা তুমি উড়িয়ে না দিলে বেরুনো সম্ভব হত না। তোমার টাইমিং ছিল একদম নিখুঁত। আর দু'তিন সেকেন্ড দেরি করলে গেটের সঙ্গে আমরাও উড়ে যেতাম।'

ট্রাকের পিছনে তাকাল জামিল। 'জাফর কই?'

'রেখে এসেছি, যে-টুকু অবশিষ্ট আছে,' রানার গলায় কঠিন সুর। 'ব্যাপারটা ফাঁদ ছিল, জামিল। ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সেজন্যেই এত সহজে ঢুকতে পারি আমরা। ওরা জানত আমরা আসছি। সেলের ভেতর একটা গ্রেনেড রেখেছিল ওরা। আনিস সিদ্দিকীকে আনতে গিয়ে জাফর ওটাকে ফাটিয়ে দিয়েছে। সেলের ভেতর আমি তার কোন চিহ্ন দেখিনি।'

'জাফর নেই!' গলা শুনে মনে হলো জামিল যেন নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে।

'সেলে একজন ছিল, তারও জাফরের মত একই অবস্থা হয়েছে,' বলল রানা। 'তবে লোকটা আনিস সিদ্দিকী কিনা সন্দেহ আছে আমার। তাঁকে ওরা এভাবে মারতে সাহস পাবে বলে মনে হয় না।'

'তাহলে তিনি কোথায়?'

একটা গর্তে পড়ে ঝাঁকি খেলো ট্রাক, মেঝের সঙ্গে ঠুকে গেল রানার কনুই। বৃষ্টির মধ্যে কারাগার প্রথমে ঝাপসা দেখাল, তারপর বাঁক ঘুরতেই অদৃশ্য হয়ে গেল। 'যেখানেই থাকুন, আমরা তাঁর নাগাল পাচ্ছি না। গোটা ব্যাপারটা আমাদের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র, জামিল। কেউ একজন শত্রুতা করেছে, চেয়েছে আমরা যেন ফিরে যেতে না পারি।'

'শত্রুতা করেছে? কিন্তু কে?'

'সেটা সময়মত ঠিকই জানতে পারব,' বলল রানা। 'এখনও আমরা বেঁচে আছি

বোগামুরার লোকজন অনভিজ্ঞ আর অযোগ্য বলে। ফরহাদের মত ড্রাইভার ছিল, সেটাও একটা কারণ।'

'এখন তাহলে কি করব আমরা?' চোখ কুঁচকে পিছন দিকে তাকিয়ে রয়েছে জামিল, দেখতে চাইছে কারারক্ষীরা অনুসরণ করে আসছে কিনা।

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লুগাম্বা ছেড়ে বেরিয়ে যাব। এখন আর আনিস সিদ্দিকীকে সাহায্য করা সম্ভব নয়। লুগাম্বা সীল করে দেয়া হবে, জামিল। রেঞ্জরোভার নিয়ে সোজা মাসামবাবুলে যাব, ওখান থেকে নাসিম আমাদেরকে তুলে নেবে।'

'লেজ তুলে পালাব, রানা? জাফরকে রেখে যাচ্ছি, কিসের বিনিময়ে? তোমার ধারণা পিল···?'

'আমার ধারণা··· ।'

অকস্মাৎ বিস্ফোরণের আওয়াজে রানার গলা চাপা পড়ে গেল। কাত হয়ে পড়ল ট্রাক, রাস্তা ছেড়ে ঢুকে যাচ্ছে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর। কমলা রঙের আলো ঝলসে উঠতে দেখেছে ফরহাদ। ট্রাকের ওপর কাদা ঝরে পড়ল একরাশ। মনে হলো ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে ওরা। তারপর প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বেডফোর্ড। সরু একটা নালায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছে ট্রাকের নাক, রাস্তা থেকে বিশ গজ দূরে। গড়িয়ে ক্যাবের পিছনে স্তূপ হয়ে গেছে লাশগুলো, সেগুলোর নিচে চাপা পড়েছে রানা ও জামিল। দু'জনেই ফরহাদের চিৎকার শুনতে পাচ্ছে। ট্রাক থেকে বেরিয়ে কাভার নিতে বলছে সে।

লাশের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে ওরা, ওদের ডান দিকে আবার ঝলসে উঠল কমলা আলো। কখন যেন থেমে গেছে বৃষ্টি, ট্রাক থেকে নেমে ভেজা ঝোপের ভেতর দিয়ে ছুটল ওরা। রানার সঙ্গে ধাক্কা খেলো ফরহাদ, হাঁপাচ্ছে সে। তার ডান কাঁধে গাঢ় দাগ।

'স্করপিয়ন!' সাবধান করল সে। 'রাস্তায়। জলদি আসুন, মাসুদ ভাই। দেখতে পেয়ে ট্রাক ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম, তা না হলে ছাতু হয়ে যেতাম সবাই।'

'তোমার কাঁধ?'

'ভেতরে বুলেট নেই। আগে মাসামবাবুলে চলুন, তারপর দেখা যাবে।'

রাস্তা থেকে ভারি এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে আসছে। পরমুহূর্তে সার্চ লাইটের সাদা আলো অন্ধকার ভেদ করে তীরের মত ছুটে এল, এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে স্থির হলো ট্রাকের ওপর। প্রবল উত্তেজনায় চিৎকার করছে বোগামুরার ট্রুপাররা, শিকারকে দেখে ফেলেছে তারা।

'মর শালারা!' থুথু ছিটাল জামিল।

ঘুরে ছুটল ওরা, পিছনে থাকল স্করপিয়ন লাইট ট্যাঙ্ক আর রাস্তা। অটোমেটিক থেকে ছুটে এল এক পশলা গুলি, ঝোপ-ঝাড়ের মাথা ছেঁটে দিল, কাঁপিয়ে দিল বেডফোর্ডকে।

সত্তর গজ দূরে সরে এসেছে ওরা, এই সময় বিস্ফোরিত হলো ট্রাক। জ্বলন্ত আবর্জনা গলিত লাভার মত শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ল। 'ফুয়েল ট্যাঙ্ক,' বলল রানা।

ওদের পিছনে জ্বলন্ত বেডফোর্ডকে ঘিরে কয়েকটা মূর্তিকে নাচানাচি করতে দেখা গেল। এরপর কি ঘটে দেখার জন্যে থামল না ওরা, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটছে। যেভাবেই হোক, রেঞ্জরোভারের কাছে পৌঁছুতে হবে ওদেরকে। ওটা ছাড়া সময়মত

সেবাশ্রমে ফেরা সম্ভব হবে না। হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ বুলাল রানা। হাতে বেশি সময় নেই।

ট্রাক থেকে দেড় মাইল দৌড়ে এসে বাঁক ঘুরল ওরা। রেঞ্জ রোভারের কাছাকাছি চলে এসেছে। পিছনে কাউকে দেখা যাচ্ছে না, অবশ্য তারমানে এই নয় যে ট্রুপাররা পিছু নেয়নি। ওদের মধ্যে ট্র্যাকার থাকতে পারে, পিছু নিলে খসানো কঠিন হবে। তবে এখনও ভাগ্য ওদেরকে সাহায্য করছে।

পনেরো মিনিট পর রাস্তায় উঠে এল ওরা। ঝোপ থেকে বেরুবার আগে সাবধানে দেখে নিয়েছে, অন্ধকারে যত দূর দেখা সম্ভব। হঠাৎ কেউ চেঁচাল না, গুলির শব্দও হলো না। ফিসফিস করল ফরহাদ, 'ভাগ্য এত ভাল যে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

ঝোপ থেকে বেরিয়ে এরই মধ্যে ছুটতে শুরু করেছে রানা, বাকি দু'জন ওকে অনুসরণ করল। রাস্তা পেরিয়ে আবার ঝোপের ভেতর ঢুকল ওরা। রেঞ্জ রোভারটা যেভাবে রেখে গিয়েছিল সেভাবেই পেল ওরা। ঝটপট উঠে বসল ওপরে, ড্রাইভিং সীটে রানা।

পিছু হটে রাস্তায় বেরিয়ে এল গাড়ি। নাসিমকে পেতে হলে এক ঘণ্টার মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছুতে হবে ওদেরকে।

বোগামুরার রাগ দেখে মনে হবে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগী। টেলিফোনে চিৎকার করছেন, প্রকাণ্ড শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। নার্ভাস মেজর কাগল্লির কানে বিষ ঢালছেন তিনি, অপরপ্রান্তের রিসিভারটা সে তার কানের কাছ থেকে সম্মানজনক দূরত্বে ধরে আছে। এই মুহূর্তে মাবোরুর গার্ড হাউসে রয়েছে কাগলি, সৈনিকদের ছুটোছুটি আর চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ ঠেকাবার জন্যে অপর কানে একটা হাত চাপা দিয়ে রেখেছে।

'পালিয়েছে! কুত্তার মল! অ্যাই বানচোত, পালিয়েছে বলতে তোর ভয় করছে না?' বিস্ফোরিত হলেন বোগামুরা।

প্রভুর হুঙ্কার শুনে কুঁকড়ে গেল কাগলি। চুপ করে থাকাই ভাল, বাধা দিলে গর্দান হারাতে হতে পারে। রাগের মাথায় প্রেসিডেন্ট কি করে বসেন, কেউ বলতে পারে না। খেপা বোগামুরার পক্ষে সবই সম্ভব। মবুতুর পরিণতি তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল মেজর কাগলি।

খানিক নরম হলো বোগামুরার গলা, 'তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারোনি, কাগলি। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছ। গোটা একটা গার্ড কোম্পানী দু'চারজন বিদেশী টেরোরিস্টের কাছে হেরে গেল, এ আমি কি শুনছি!'

'জেরা করার জন্যে কমান্ডারকে আমি আটক করেছি,' বলল কাগলি। 'সে হয়তে ব্যাখ্যা করতে পারবে কেন তার লোকজন ব্যর্থ হলো।'

'এর জন্যে আমি তোমাদের দু'জনকেই দায়ী করছি। আমাকে আন্ডারএস্টিমেট কোরো না, কাগলি। আমাকে আরেকবার হতাশ করে দেখো, পচা আঙুরের মত তোমাকে আমি পায়ের তলায় ফেলে পিষব। এবার, আর্মারড পেট্রলের খবর বলো। এখনও তারা রিপোর্ট করেনি?'

'ট্রাকটাকে তারা বাধা দেয়, এক্সেলেন্সি। সেটাকে ওরা ধ্বংস করে দিয়েছে।'

'আর টেরোরিস্টরা?'

'ধারণা করা হচ্ছে জঙ্গলে লুকিয়েছে তারা। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, খোঁজাখুঁজি চলছে, টেরোরিস্টরা বেশিদূর যেতে পারবে না। জঙ্গল থেকে তো এক সময় বেরুতেই হবে, তখন ধরা পড়তে বাধ্য।'

'সম্ভব হলে ওদেরকে জ্যান্ত ধরা চাই, কাগলি। আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেব। পাবলিক মীটিং ডেকে শাস্তি দেয়া হবে, তারপর মাথাগুলো আমার কমান্ড পোস্টের দেয়ালে শোভাবর্ধন করবে।'

'কিন্তু যদি জ্যান্ত ধরা সম্ভব না হয়, এক্সেলেন্সী?'

'খুন করার পর মাথাগুলো নিয়ে এসো আমার কাছে।'

'তাই আনব, এক্সেলেন্সী।'

'কাগলি।' ভেলভেটের মত নরম শোনাল বোগামুরার গলা।

শিউরে উঠল কাগলি। 'এক্সেলেন্সী?'

'ওরা যদি কোনভাবে তোমার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়, ওদের পাওনা সমস্ত শাস্তি তোমাকে ভোগ করতে হবে। মাথাগুলো আমার চাই-ই, না পেলে আমার লোকদের বলব তারা যেন তোমার মাথাটা নিয়ে আসে—সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে।' যোগাযোগ কেটে দিলেন বোগামুরা।

বিপদ যে গুরুতর, বুঝতে পারছে কাগলি। প্রাণে বাঁচতে হলে টেরোরিস্টদের মাথা তাকে যেভাবেই হোক যোগাড় করতে হবে। স্করপিয়ন পেট্রল, ধরে নেয়া চলে, ব্যর্থ হয়েছে। একটা রোডব্লক-এর ব্যবস্থা করে রেখেছে সে, সেটাই এখন একমাত্র ভরসা। হাতের তালু ঘামছে তার, ঘাড়ের পিছনটা শিরশির করছে।

শহর থেকে দু'মাইল দূরে রোডব্লক-এর সামনে পড়ল ওরা। হেডলাইট জ্বেলে ঝড়ের বেগে ছুটছিল রেঞ্জরোভার, গোপনীয়তার চেয়ে সময় বাঁচানো বেশি জরুরী।

বাঁকটা ঘোরার সময় স্পীড সামান্যই কমাল রানা, রেঞ্জ রোভার রাস্তা বরাবর আবার সোজা হবার আগেই রোডব্লকটা দেখতে পেল, মাত্র দু'শো গজ দূরে কয়েকটা হ্যারিকেন ও কুপি, একটা পোল—পোলটা রয়েছে রাস্তার দু'পাশে খাড়া করে রাখা কয়েকটা ড্রামের ওপর। অনুজ্জ্বল আলোর ভেতর মূর্তিগুলোর কাঁধে অস্ত্র দেখা যাচ্ছে, বড় আকৃতির একটা রাশিয়ান বিটিআর আর্মারড ক্যারিয়ারের পাশে জড়ো হয়েছে তারা, ব্যারিয়ারের পিছনে।

'সাবধান!' বন বন করে হুইল ঘুরিয়ে রেঞ্জরোভার সিধে করে নিচ্ছে রানা। শরীর শক্ত করে তাল সামলাচ্ছে জামিল ও ফরহাদ, হাতের মেশিন পিস্তল কক করল। রোড ব্লক ভেঙে বেরিয়ে এল গাড়ি।

বিটিআর-এর পাশে দাঁড়ানো লোকগুলো চিৎকার শুরু করল, ভিড়টা ছড়িয়ে পড়ছে, কেউ কেউ রাইফেল উঁচিয়ে ছুটে আসছে রাস্তায়। রেঞ্জ রোভারের পিছনে কাচ ফেটে গেল, দেখতে হলো ঠিক মাকড়সার জাল। চেসিসে আঘাত করছে বুলেট, গাড়িটাকে ঠেলে দিতে চাইছে এক পাশে।

'শালারা!' জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল জামিলের মাথা ও গলা, সৈনিকদের লক্ষ্য করে এক পশলা গুলি করল সে। হাইওয়ের কিনারা ছেড়ে ঝোপ-ঝাড় আর জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল রেঞ্জ রোভার। আশ্চর্যই বলতে হবে, কেউ ওরা আহত

হয়নি।

বিটিআর-এর দিকে ছুটল ট্রুপাররা, পিছু নিতে চায়।

এনসিও রেডিও টেকনিশিয়ানকে ডেকে বলল, 'মেজর কাগলিকে রিপোর্ট করো! বলো টেরোরিস্টদের পিছু নিয়েছি আমরা! জলদি, ব্যাটা উল্লুক!'

অন্ধকারের ভেতর সগর্জনে ছুটল বিটিআর, পিছনে গিজগিজ করছে ট্রুপার, হাতে অস্ত্র, চড়া গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

ঘন ঘন ড্রপ খেয়ে ফুটবল যেমন ছোটে, ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে ওদের রেঞ্জ রোভারও সেভাবে ছুটছে। গাছের নিচু ডাল-পালা উইন্ডস্ক্রীনে চাবুকের মত বাড়ি মারছে। গাড়িটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে রানা। জাম্পিং লাইটের আলোয় সামনে একটা নালা দেখতে পেল জামিল। 'বাঁয়ে! বাঁয়ে!' গলা ফাটাল সে।

হুইল ঘুরিয়ে নালাটাকে এড়াল রানা, ভেজা জমিন পিচ্ছিল হয়ে থাকায় মাঝে মধ্যে হড়কে যাচ্ছে চাকা। একটা পাথরে বাধা পেল, ঝাঁকি খেয়ে সীট থেকে সামনের দিকে ছিটকে পড়ল তিনজনই, চিৎকার করে উঠল ফরহাদ, তার কাঁধে যেন আগুন ধরে গেছে। ঝট করে একবার পিছনে তাকাল সে। 'এখনও ওরা পিছু ছাড়েনি!'

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ করে নিচ্ছে আর্মারড ক্যারিয়ারও। ওটার আপার চেসিসে এক সারি আলো জ্বলছে, রেঞ্জরোভারকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে কমান্ডার। আকারে বড় ও ভারি হওয়ায় গতি কম, তবে ঝোপ-ঝাড় মাটির সঙ্গে সমান করে দিয়ে অনুসরণ করে যাচ্ছে। কমান্ডার জানে, দূরত্বটা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে না।

সামনে ঢাল, ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে। ফোর-হুইল ড্রাইভে ছুটল গাড়ি। কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে পথ করে নিচ্ছে রানা। ঢালের মাথায় উঠে এল, পেডালে চাপ দিয়ে স্পীড বাড়াল। 'কি অবস্থা?' জানতে চাইল ও।

'পিছিয়ে পড়ছে ওরা, রানা,' রিপোর্ট করল জামিল। 'আমি ভাবছি, এত তাড়াতাড়ি ওরা রোডব্লকের ব্যবস্থা করল কিভাবে?'

'যেভাবে আমাদেরকে মাবোরুতে অভ্যর্থনা জানাবার ব্যবস্থা করে,' জবাব দিল ফরহাদ। 'আমরা আসছি, ওরা জানত। এখন জান নিয়ে পালাতে পারলে হয়। মাসুদ ভাই?'

'দেখা যাক,' বলল রানা। 'ওরা এখন রাস্তার ওপর নজর রাখবে, জানা কথা। রাস্তা এড়িয়েই এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছুতে হবে আমাদের। স্প্রিঙ সহ্য করতে পারলে হয়।'

'হাড়গোড়ের কথা নাহয় বাদই দিলাম,' বলল জামিল।

ঢালের মাথায় একটা ব্যাটল ট্যাঙ্কের মত উঠে এল বিটিআর, কেঁপে উঠে থেমে গেল, গোঁ গোঁ আওয়াজ করছে এঞ্জিন। শিকার রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে, গ্রাস করে নিয়েছে বনভূমি। খিস্তি করল কমান্ডার, হাত বাড়াল রেডিওর দিকে।

ছয়

ম্যাপের ওপর লাল রেখাটা হাইওয়ে, সেটার ওপর আঙুল রেখে অ্যামব্যাসাডর বেকভ বললেন, 'মাবোরু থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকে গেছে ওরা। রাস্তা ছেড়েছে এখানে, রোডব্লকের কাছে, দিক বদলে গেছে উত্তর-পুবে—অন্তত আপনার ট্রুপ কমান্ডার তাই

বলছেন।'

বোগামুরা গম্ভীর গলায় বললেন, 'হাতে পেয়েও ধরতে না পারায় তাকে শাস্তি দেয়া হবে।' তার চোখ চকচক করছে। 'অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক হবে সেটা।'

'পরে, আগে টেরোরিস্টদের ধরুন,' বললেন বেকভ। 'ওদেরকে ধরার জন্যে আপনার এখন প্রত্যেকটা লোককে দরকার।' ম্যাপের দিকে তাকালেন আবার। 'ভাবছি ওদিকে ওরা কোথায় যাচ্ছে!'

ওদিকে কেনিয়া সীমান্ত, তবে বহুদূরে। ওদিকে যদি যায়ও, সুবিধে করতে পারবে না, কারণ সীমান্ত চৌকিগুলোকে ইতিমধ্যে সাবধান করে দেয়া হয়েছে, একটা পিঁপড়েও গলতে পারবে না।

দক্ষিণে রয়েছে লেক ভিক্টোরিয়া। আপনমনে মাথা নাড়লেন বেকভ। ওরা যদি বোট নিয়ে পালাতে চাইত, তাহলে উল্টোদিকে যেত। তাছাড়া, হাইস্পীড লঞ্চ না হলে বোট খুব ধীর গতিতে এগোবে। তাহলে বাকি থাকল কি? উত্তর দিকটা? ওদিকে তো মরুভূমি, ধু-ধু প্রান্তর, সেই সুদানিজ পর্বতমালা পর্যন্ত। উঁহুঁ, উত্তরে যাওয়াটা বোকামি। তাহলে?

কেনডুরা থেকে সীমান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেক খামার, কিছু খামার রেললাইনের ধারে। অর্ডন্যান্স সার্ভেইল্যান্স ম্যাপটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন বেকভ। তাঁর মনে হলো উত্তরটা চোখের সামনেই রয়েছে অথচ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। ম্যাপের একটা বিন্দুর ওপর তাঁর চোখ আটকে গেল। বিন্দুটার একটা নামও আছে।

মাসামবাবুল।

নামের পাশে খুদে দুটো প্রতীক চিহ্ন। একটা ক্রস, অপরটা বৃত্তের ভেতর ইংরেজি বর্ণমালার প্রথম হরফ। দ্বিতীয় প্রতীক চিহ্নের অর্থ, ওখানে একটা এয়ারস্ট্রিপ আছে। বেকভের পালসের গতি বেড়ে গেল। তারপর তিনি ভাবলেন, মাসামবাবুল নামটা পরিচিত লাগছে কেন?

ও, হ্যাঁ। ওখানে একটা হাসপাতাল আছে, সঙ্গে এতিমখানা ও কারিগরি স্কুল। বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক, ড. ওসমান গনি, তিনিই ওগুলোর পরিচালক। এনজিও টাইপের একটা প্রতিষ্ঠান, বিদেশ থেকে সাহায্য পায়, সেজন্যই প্রেসিডেন্ট বোগামুরা ভদ্রলোককে ঘাঁটান না।

এয়ারস্ট্রিপটাই চোখ খুলে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট, ভাবলেন বেকভ। মি. সিদ্দিকীকে লুগাম্বা থেকে বের করে নিয়ে যেতে হলে একটা এয়ারস্ট্রিপ তো খুবই দরকার। তাঁর সন্দেহের কথা বোগামুরাকে শোনালেন তিনি।

'বুড়ো ওসমান গনি!' রাগে খেঁকিয়ে উঠলেন বোগামুরা, চোখ দুটো হঠাৎ দু'টুকরো জ্বলন্ত কয়লা হয়ে উঠল। 'কুত্তার মল, শালা অনেকদিন থেকে আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছে। এবার তাকে ভুগতে হবে।' হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুললেন তিনি। 'মেজর কাগলিকে দাও! জলদি!'

উঁচু-নিচু জমিনের ওপর দিয়ে এগোচ্ছে রেঞ্জ রোভার, খানিক আগে একটা শুকনো নদীর তলা থেকে উঠে এসেছে। মেঘ কেটে গেছে, আকাশে এখন চাঁদ থাকায় গাড়ি চালাতে সুবিধে হচ্ছে রানার। হঠাৎ কেশে উঠল এঞ্জিন, স্পীড কমতে শুরু করল,

তারপর একেবারে থেমে গেল।

'আশপাশে কোন পেট্রল পাম্প দেখতে পাচ্ছ কেউ?' বিপদের মধ্যে থাকলেও, কৌতুক করল জামিল।

'ট্যাঙ্কে প্রচুর তেল আছে,' বলল রানা, গাড়ি থেকে নেমে পিছন দিকে চলে এল, জানে কি দেখতে পাবে। 'হুম। ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই রোডব্লক পেরোবার সময় ঘটেছে।' চারদিকে চোখ বুলাল ও। কয়েকটা আকেশা গাছের নিচে অচল হয়ে পড়েছে ওরা। ওদের সামনে একটা শুকনো নদী, ওপারের পাথুরে ঢালটা ক্রমশ উঁচু হয়ে দিগন্তে গিয়ে ঠেকেছে।

'কত দূরে?' জামিলও গাড়ি থেকে নেমে এল, তার পিছু নিল ফরহাদ, এক হাতে আহত কাঁধটা ধরে আছে।

'সম্ভবত মাইলখানেক,' বলল রানা। 'দু'মাইলও হতে পারে। উপায় নেই, হেঁটে যেতে হবে। তোমার কি অবস্থা, ফরহাদ?'

'পারব, মাসুদ ভাই।'

'সাবাস্!' ফরহাদের পিঠ চাপড়ে দিল জামিল।

অস্ত্র ও প্যাকগুলো গুছিয়ে নিল ওরা, তারপর অনুসরণ করল রানাকে।

পাহাড়ের মাথা থেকে ঝপ করে নেমে এল রকওয়েল কমান্ডার, রানওয়ে বরাবর সোজা হবার আগে এদিক ওদিক কাত হচ্ছে ডানা। দু'সারি আলোর মাঝখানে জমিন স্পর্শ করল চাকা, ধীরে ধীরে কমল গতি, পুরোপুরি ঘুরে গিয়ে এয়ারস্ট্রিপ ধরে ফিরে আসছে।

প্রপেলার থামার আগেই টের পেয়ে গেল নাসিম, কোথাও কোন গোলমাল হয়েছে। তার সন্দেহ বেড়ে গেল ড. ওসমান গনিকে ছুটে আসতে দেখে, চেহারায় রাজ্যের উদ্বেগ। লাফ দিয়ে মাটিতে নামল সে, এলোমেলো চুল সরাল মুখ থেকে। 'ওরা এখনও পৌঁছায়নি, তাই না, ড. গনি?' জিজ্ঞেস করল সে।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ড. গনি। 'না।'

'কোন বিপদ হলো নাকি!' ঠোঁট কামড়াল নাসিম। সেবাশ্রমে আলো জ্বলছে, চারদিকের অন্ধকারের ভেতর ওই আলো যেন আশা ও অভয় দিতে চাইছে তাকে।

'এখনও সময় আছে...,' বললেন ড. গনি। পরমুহূর্তে বিস্ময় ফুটে উঠল তাঁর চেহারায়, তাকিয়ে আছেন কমান্ডারের দিকে। 'এ তো দেখছি অন্য একটা প্লেন। কি ব্যাপার?'

'আমার প্লেনটা এক লোক বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে।'

'উড়িয়ে দিয়েছে? কি বলছ!'

'বাধ্য হয়ে ধার করতে হয়েছে এটা,' বলল নাসিম। 'রানাকে কথা দিয়েছি, তাই আসতে হলো। কিন্তু ওরা যদি...।'

'সিস্টার আসমা রাস্তার ওপর নজর রাখছে,' জানালেন ড. গনি। তারপর তিনি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন, 'প্লেন সম্পর্কে আমার তেমন ধারণা নেই, তবে তোমার ওটায় ছ'জনের জায়গা হবে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'আনিস সিদ্দিকী ছাড়া আরও দু'জনকে নিতে পারব,' বলল নাসিম। 'বাকি দু'জনকে অন্য কোন উপায়ে সীমান্ত পেরুতে হবে।' হাতঘড়ির ওপর চোখ রাখল সে।

'মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। আরও আগে ওদের পৌছুনোর কথা।'

'চিন্তা কোরো না, এসে পড়বে,' বলে নাসিমের একটা হাত ধরলেন বৃদ্ধ। 'চলো, তোমার বিশ্রামের ব্যবস্থা করি।'

রানা ও টীমের কথা ভেবে দুশ্চিন্তা হচ্ছে নাসিমের। নিজের কাজে অত্যন্ত দক্ষ রানা, জানে সে, কোণঠাসা হয়ে পড়লে সাঙ্ঘাতিক বিপজ্জনকও বটে, তবু সে-ও একজন মরণশীল মানুষ। সময়সীমা সে-ই নির্ধারণ করে দিয়েছে, নাসিমকে দেয়া নির্দেশটাও স্পষ্ট। নির্দিষ্ট সময়ে তারা এয়ারস্ট্রিপে পৌছুতে না পারলে নাসিমকে ফিরে যেতে হবে একা।

ড. গনি হাত ধরলেও, নাসিম নড়ল না। বিড়বিড় করছে সে, 'চলে এসো, রানা। এত দেরি করছ কেন!'

বারোটা বেজে পনেরো মিনিট।

আরও দশ মিনিট দেখবে নাসিম, সিদ্ধান্ত নিল। দু'মিনিট পর আসমাকে দেখা গেল, ওদের দিকে ছুটে আসছে। উত্তেজিত মেয়েটা, হাসছে। 'ওঁরা পৌছে গেছেন, কাকা! ওঁরা পালিয়ে আসতে পেরেছেন!'

'হে খোদা, আমি খুশি!' চিৎকার করল নাসিম।

ছুটতে ছুটতে সেবাশ্রমে চলে এল ওরা, সেটাকে পাশ কাটিয়ে রাস্তার কিনারায়। পাহাড়ের বাঁক ঘুরে প্রথম জীপটা এগিয়ে আসছে, হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় ঢাল ও গাছপালা আলোকিত হয়ে উঠল। তারপর আরেকটা জীপ দেখা গেল, নেমে আসছে দ্রুত।

জীপ দেখেনি, শুধু আলো দেখেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল সিস্টার আসমা। এই মুহূর্তে হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে।

নাসিমের প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো কমান্ডারের দিকে খেঁচে দৌড় দেয়, কিন্তু জীপ থেকে হুড়মুড় করে সশস্ত্র সৈনিকদের নামতে দেখে বুঝল দু'গজও যেতে পারবে না।

সেবাশ্রম সার্চ করে কিছুই পেল না মেজর কাগলি, চেহারা দেখে মনে হলো খুবই হতাশ হয়েছে সে। রাগে দিশেহারা ড. গনির উপস্থিতিতে চারজন সিস্টারকে কামরা থেকে বের করে বাইরে আনা হলো, বাকি সব সিস্টার ও স্টাফকে আগেই ওখানে জড়ো করা হয়েছে, তাদের মধ্যে তসলিমাও আছে। অনেকেরই পরনে বোরখা দেখা যাচ্ছে না। চাঁদের আলোয় অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকল সবাই। অর্ধবৃত্ত রচনা করে পাহারা দিচ্ছে সৈনিকরা।

'যা খুঁজছেন তা কি আপনারা পেয়েছেন, মেজর?' রাগ বা ঘৃণা গোপন থাকল না, কঠিন সুরে প্রশ্ন করলেন ড. গনি।

দু'পাশে দু'জন সৈনিককে নিয়ে সামনে বাড়ল মেজর কাগলি। নাসিমের মনে হলো তার তলপেটের ভেতর একরাশ পোকা ডানা ঝাপটাচ্ছে। 'আমার লোকেরা বলছে এয়ারস্ট্রিপে একটা প্লেন রয়েছে,' বলল কাগলি। 'পাইলট কোথায়?'

এক পা সামনে বাড়ল নাসিম।

'মেয়ে? মেয়ে পাইলট?' কাগলি তার ভুরু জোড়া কপালে তুলল।

'অবাক হবেন না, মেজর,' বলল নাসিম। 'মেয়েদের দাবিয়ে রাখার দিন শেষ হয়েছে।'

কথাটার মধ্যে যদি কোন বিদ্রূপ থেকেও থাকে, গায়ে মাখল না কাগলি। সে বলল, 'মাবোরু থেকে টেরোরিস্টরা পালিয়ে এসেছে, আপনি তাদেরকে তুলে নিতে এসেছেন। কোথায় তারা?'

বিহ্বল দেখাল নাসিমকে। 'টেরোরিস্ট, মেজর? আপনি সম্ভবত প্রলাপ বকছেন। আমি নাইরোবি যাচ্ছি। এঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দেয়ায় বাধ্য হয়ে এখানে নামতে হয়েছে আমাকে। ভাগ্যটা নেহাতই ভাল আমার।' বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। তারমানে বেঁচে আছে রানা!

কাগলি ঠোঁট বাঁকা করে হাসল। 'এখানে আপনার উপস্থিতির কারণ আমি জানি। আমাকে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করে লাভ নেই।'

'আশ্চর্য তো! আমি কি আপনাকে মিথ্যে কথা বলছি!'

চোখে আগুন জ্বলে উঠল কাগলির। 'আপনার নাম কি?'

'সেলিনা নাসিম।'

চোখ ইশারায় নাসিমকে কিছু বলার চেষ্টা করছেন ড. গনি—ওদেরকে ঘাঁটিও না।

'মেয়ে পাইলট, তা-ও আবার মুসলমান!' কঠিন সুরে বলল কাগলি। 'আপনার সঙ্গীদের মিশন ব্যর্থ হয়েছে। তাদের আয়ু আছে আর মাত্র কিছুক্ষণ। তাদের মত আপনারও।'

হতাশা গ্রাস করল নাসিমকে। আনিস সিদ্দিকী এখনও শত্রুদের হাতে, আর রানা ওর টিম নিয়ে একটা ফাঁদের দিকে ছুটে আসছে। অথচ তার কিছু করার নেই।

'আমারও মানে?' অভিনয়ের স্বার্থেই সাপের মত ফণা তুলল নাসিম। 'আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?'

বাতাসে শিস কেটে ছুটে এল মালাক্কা ছড়িটা। আঘাতটা এড়াবার জন্যে ঝট করে মাথা সরাল নাসিম, পুরোপুরি সফল হলো না, ছড়ির ডগা ওর মুখে লাগল। ব্যথা করে উঠল চোয়ালটা, চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। তারপর আবার ছড়িটা তুলল কাগলি।

'না!' চিৎকার করলেন ড. গনি, কেউ বাধা দেয়ার আগে খেপা ষাঁড়ের মত ছুটে এসে দু'হাত দিয়ে ধাক্কা দিলেন কাগলির গায়ে। বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল মেজর। 'মেয়েদের গায়ে হাত তোলেন, আপনি একটা কাপুরুষ!' রাগে ও উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছেন তিনি। 'আমার সামনে কার এত সাহস⋯।'

ধীরে ধীরে দাঁড়াল কাগলি, কাঁপছে। ধুলোর মধ্যে অনেকটা দূরে পড়ে রয়েছে তার ক্যাপ। একজন সৈনিকের দিকে ফিরে খিস্তি করল, ছুটে গিয়ে ক্যাপটা তুলে আনল সে।

যেন এক যুগ ধরে মেজর আর ড. গনি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ড. গনি এখনও সশব্দে হাঁপাচ্ছেন, কাগলির কাঁপুনি এখনও থামেনি। শ্বাসরুদ্ধকর মুহূর্তগুলো পার হয়ে যাচ্ছে, ড. গনি বুঝতে পারছেন তাঁর মৃত্যু আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার।

'এর জন্যে আপনাকে ভুগতে হবে, ডাক্তার,' হিস হিস করে বলল মেজর। 'টেরোরিস্টদের দলে আপনিও নাম লিখিয়েছেন।'

পেট ব্যথাটা এক সময় অসহ্য হয়ে উঠল। শুরুতে অল্প ছিল, ধীরে ধীরে বেড়ে এমন এক পর্যায়ে পৌচেছে যে ঘেমে যাচ্ছে সে, কোথাও বসে হালকা না হলেই নয় আর।

অনেকক্ষণ হলো আটকে রেখেছে, এরপর নির্ঘাত কাপড় নষ্ট হবে। ঢোলের মত ফোলা পেটে একটা হাত রেখে হোঁচট খেতে খেতে এগোল সে, হাঁসফাঁস করছে, ঢুকে পড়ল জঙ্গলে। মাটিতে পড়ে থাকা একটা ডালের ওপর কালাশনিকভ কাত করে রাখল। বেল্ট খুলে কোমর থেকে হাঁটুর কাছে নামিয়ে দিল প্যান্ট। স্বস্তির ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ ছেড়ে কোঁত পাড়ল।

অদৃশ্য একটা হাত পিছন থেকে এসে চেপে ধরল তার কণ্ঠনালী। হাত তুলে বাধা দিতে যাবে, তার আগেই ছুরির ধারাল ফলা বিচ্ছিন্ন করে দিল কারটিড ধমনী ও ভোকাল কর্ড। গাঢ় একটা ঝর্ণা লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল কাটা গলা থেকে, কল কল শব্দ হচ্ছে। ঝোপের ভেতর পা ছুঁড়ছে সে, পায়ের পাতার ওপর এখনও স্তূপ হয়ে রয়েছে প্যান্ট। ধীরে ধীরে ঝাঁকি খাওয়া বন্ধ হলো, নেতিয়ে পড়ছে পেশী। শরীর থেকে বেরিয়ে আসা ময়লার ওপর স্থির হয়ে গেল।

শার্টের আস্তিনে ছুরির ফলা মুছল জামিল। খুনটা করে খুশি হয়নি সে। আরও পরিচ্ছন্নভাবে করা যেত কাজটা। ছুরিটা খাপে ভরে মরা ট্রুপারের ম্যাশেটিটা তুলে নিল সে।

দু'জন লোককে আশা করেনি জামিল। জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে এয়ারস্ট্রিপের ওপর নজর রাখছিল সে। ফেটিগ আর ক্যাপ পরা দু'জন গার্ডকে দেখতে পায়, কাঁধে একে ফরটিসেভেন, বেল্টে ম্যাশেটি, ঠোঁটে ঝুলন্ত সিগারেট। ভাবছিল শিগ্গির কিছু একটা করতে হবে তাকে, কারণ ওদের হাতে সময় নেই। তবে দু'জনকেই ঘায়েল করতে হবে নিঃশব্দে। কিভাবে? তারপর দু'জনের মধ্যে মোটা লোকটা সরাসরি তার দিকে হেঁটে এল, পেটে হাত বুলাচ্ছে, এত জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে যে মরা মানুষও যেন জ্যান্ত হয়ে উঠবে।

একজন গেছে, একজন আছে। দ্বিতীয় লোকটাকে মারা সহজ হবে না। মারতে হলে খোলা মাঠে বেরুতে হবে জামিলকে। অন্তত বিশ পঁচিশ গজ দূরে সে।

ক্যাপ আর রাইফেলটা তুলে নিল জামিল। ক্যাপটা মাথায় পরে কপাল ঢাকল, কাঁধে রাইফেল তুলে বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে। দ্বিতীয় সৈনিক ঝোপের ভেতর রয়েছে, প্রথম পনেরো গজ আড়াল পেল জামিল। আর যখন দশ গজ যেতে হবে, ঝোপ থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করল জামিল, হাঁটার ভঙ্গি বদল করল, স্বস্তির সশব্দ নিঃশ্বাস ছেড়ে বেল্ট হাতড়াচ্ছে, যেন কোমরে আবার আটকাচ্ছে ওটা। ম্যাশেটিটা তার ডান হাতে। হেসে উঠে অশ্লীল একটা কৌতুক করল গার্ড, তারপর জানাল, সে-ও পানি ছাড়বে। তার মুখের হাসি মুছে গেল জামিল যখন মাত্র দু'গজ দূরে। মাত্র পলকের জন্যে। তারপরই কাঁধ থেকে রাইফেল নামাতে শুরু করে মুখ খুলল, চিৎকার দেবে।

বাকি দূরত্ব ক্ষিপ্রবেগে পেরিয়ে এল জামিল, ম্যাশেটি ধরা হাতটা পিছন ও ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। ম্যাশেটির ফলা সরাসরি লোকটার মুখে নামল, চীক বোন দু'ভাগ করে দিল টিস্যু পেপারের মত, রক্তাক্ত গহ্বর তৈরি করল চোয়ালে। কাটা গাছের মত দড়াম করে পড়ে গেল লোকটা। হাড়ে গাঁথা ম্যাশেটি টান দিয়ে বের করে নিল জামিল, দ্বিতীয় আঘাতে পাঠিয়ে দিল পরপারে। ছুটে আবার জঙ্গলে ঢুকল নিজের ইকুইপমেন্ট নেয়ার জন্যে।

*

ঝোপের ভেতর শুয়ে আছে ফরহাদ, জমিনে লেগে থাকা গাঢ় একটা দাগের মত। আন্ডারঅয়্যার ছাড়া তার পরনে আর কিছু নেই। পরনের শার্টটা ছিল বড় বেশি উজ্জ্বল, শত্রুদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে এগোনো যেত না; আর প্যান্ট পরে থাকলে সেটা পাথর বা ঝোপে আটকে যেতে পারে। তার টার্গেট দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কাভার দিচ্ছে রাস্তাটা, গাছের একটা গুলতি আকৃতির ডালে কালাশনিকভ বিশ্রাম নিচ্ছে। নিস্প্রভ জোছনার ভেতর এক পা থেকে আরেক পায়ে ভর চাপাল লোকটা, একটু আরাম পাবার চেষ্টা। এই সুযোগে সামান্য এগোল জামিল। শব্দ হবার ভয়ে সঙ্গে কোন অস্ত্র রাখেনি সে। অস্ত্রের গায়ে চাঁদের আলোও প্রতিফলিত হয়, সতর্ক একজন গার্ডের চোখে ধরা পড়ে যেতে পারে। তবে এ লোকটা সতর্ক নয়।

তার ঠিক পিছনে সিধে হলো ফরহাদ। হঠাৎ কি মনে করে ঘাড় ফেরাল ট্রুপার, এবং মারা গেল। ফরহাদের বাম হাতের তালুর গোড়া ভোঁতা নাকে প্রচণ্ড আঘাত করল, হাড় ও কারটিলিজ ওপর ও পিছন দিকে ঠেলে পৌঁছে দিল ব্রেনে, ধমনী ও স্নায়ু ছিঁড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল।

বিনা প্রতিবাদে গাছের গায়ে হেলান দিল লাশ, তারপর কাত হয়ে পড়ে গেল। দ্রুত হাতে ক্যাপ ও ফেটিগ খুলে নিয়ে পরে ফেলল ফরহাদ। নিজের ইকুইপমেন্ট নেয়ার জন্যে ছুটল, তারপর রওনা হলো সেবাশ্রমের দিকে। দৌড়াচ্ছে, দপদপ করে ওঠায় বুঝল কাঁধের ক্ষতটা আবার খুলে গেছে।

মেজর কাগলির মন বলছে, বাইরে আছে ওরা, কাছাকাছি কোথাও। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কখনও ফলস অ্যালার্ম দেয় না। তার আশা, সৈনিকরা ওদেরকে আসতে দেখে সতর্ক করে দেবে তাকে। বাইরের বারান্দায় কাঠের পাটাতনে মৃদু একটা শব্দ হলো। আড়ষ্ট হয়ে গেল কাগলি। তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল সৈনিকরা। তারাও অস্থিরতা অনুভব করছে, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ার অবস্থা। ড. গনি, সিস্টার, স্টাফ ও এতিমখানার মেয়েদেরকে ডিসপেনসারিতে আটকে রাখা হয়েছে, পাহারা দিচ্ছে দু'জন গার্ড। বাইরে যারা আছে তাদেরকে বাদ দিলে, কাগলির বাকি সব লোক সেবাশ্রমের ভেতরই বিভিন্ন জায়গায় পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করছে। প্রত্যেককে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, জানালা ও দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে নজর রাখতে হবে। সদর দরজায় কাঠের ফ্রেমে আটকানো লোহার জাল রয়েছে, তার ভেতর দিয়ে বাইরে তাকাল কাগলি। রাতটা অদ্ভুত শান্ত মনে হলো, চারদিকে যেন ভৌতিক নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। যেন মনে হলো গোটা সেবাশ্রম আর ভেতরের সব লোক অতল কোন গহ্বরের কিনারায় তাল সামলাচ্ছে।

চাঁদের আলোয় গাছগুলো মোটা একটা রেখা টেনেছে, হঠাৎ সেদিকে নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল। ছিটকে জোছনায় বেরিয়ে এল এক লোক, দেখতে পেয়ে পালস রেট বেড়ে গেল কাগলির। মাথা নিচু করে সেবাশ্রমের দিকে ছুটে আসছে লোকটা, বারবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাচ্ছে।

স্বস্তি অনুভব করল মেজর কাগলি। তার সেন্ট্রি টেরোরিস্টদের দেখতে পেয়েছে। ফিসফিস করে নিজের লোকদের সাবধান করল সে।

কেঁপে উঠল বিল্ডিং।

দেয়াল বিস্ফোরিত হবার এক পলক আগে কাগলির পায়ের তলায় কাঠের পাটাতন নড়ে উঠল। রানা যখন দ্বিতীয় এক্সপ্লোসিভ চার্জ ডিটোনেট করছে, দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল দু'জন সৈনিক। মাকেসি দু'জনের শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

অপর একজন সৈনিক আর্তনাদ করে উঠে মেঝেতে গড়াতে শুরু করল, সুচের মত ধারাল শ্র্যাপনেল দুই চোখ আর সারা মুখে গভীর গর্ত তৈরি করেছে। লোকটার চিৎকার শুরু হতেই লোহার জাল ছিঁড়ে ভেতরে ঢুকল ফরহাদ, হেকলার অ্যান্ড কচ দিয়ে এক পশলা গুলি করল করিডরে।

দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকছে ফরহাদ, উপলব্ধি করার এক পলক সময় পেল কাগলি—সেবাশ্রমের দিকে ছুটে আসা মূর্তিটা তার দলের লোক ছিল না। ফরহাদের হাতে মেশিন পিস্তল গর্জন করছে, আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ছুটোছুটি শুরু করল সে। আবর্জনা ও ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে গেছে করিডর, আতঙ্কিত মেজর দিক হারিয়ে ফেলল। মাথার ওপর দেয়ালে কয়েকটা বুলেট লাগায় দিশেহারা ভাবটা বেড়ে গেল আরও।

ডান দিকে মোচড় খেলো ফরহাদ, একটা টার্গেট দেখতে পেয়ে আরও এক পশলা গুলি করল। লো ভেলোসিটির বুলেট, লোকটার ধড় ঝাঁঝরা করে দিল, চুরমার করে দিল মেরুদণ্ড।

আশ্চর্যই বলতে হবে, প্রথম দফার আক্রমণে কাগলির গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। ডাইভ দিল সে, শরীরটা গড়িয়ে ঝট করে হাঁটুর ওপর সিধে হলো। পিস্তল তুলে ফরহাদের পিঠে লক্ষ্যস্থির করছে, ভাঙা দেয়াল টপকে উদয় হলো সাক্ষাৎ যমদূত। কোমরের কাছে ধরা রেমিংটন থেকে গুলি করল রানা। ভারি বুলেট কাগলিকে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে ফেলল, উড়িয়ে নিয়ে গেল কাঁধ ও মাথার বাম দিকটা।

বিল্ডিঙের উল্টোদিকে রয়েছে জামিল, ডিসপেনসারির দরজার পাশে। বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা মাত্র গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে তালার ওপর সবুট লাথি মারল। দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে গেল কবাট, মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকল সে। 'শুয়ে পড়ুন! শুয়ে পড়ুন!' কোমরের কাছ থেকে গুলি করছে, দেখল সিস্টার তসলিমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল নাসিম, নিজেও ডাইভ দিল তার পাশে। প্রথম দফার বুলেট একজন ট্রুপারের দুটো পা-ই গুঁড়ো করে দিয়েছে, পড়ে যাবার পর দেখতে হলো মাটিতে চিৎ হয়ে থাকা ব্যাঙের মত, বুকের ওপর আড়াআড়ি পড়ে রয়েছে রাইফেলটা। দ্বিতীয় গার্ড রাইফেল বাগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, ঘুরতে শুরু করেছে। ছোট হয়ে গেল জামিল, হাঁটুর ওপর স্থির হবার আগেই গুলি করল আবার। ট্রুপারের মাথার ওপর ও পিছনের দেয়ালে এক সারি গর্ত তৈরি হলো, সারিটা শেষ হলো লোকটার বুকে এসে। ধাক্কা খেয়ে দেয়ালে সেঁটে গেল সে, ঝাঁঝরা বুক ও নাক-মুখ থেকে কলকল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে, শরীরটা ঢলে পড়ল মেঝেতে।

বারুদের গন্ধে দম আটকে আসার যোগাড় হয়েছে, চিৎকার করে সবাইকে বাইরে বেরুতে বলল জামিল। খোলা দরজার দিকে একটা চোখ, দেখতে পেল দু'জন সিস্টার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদছে। 'নাসিম, ওদেরকে বের করে নিয়ে যান! আউট! আউট!' জামিলের জানা নেই বাকি সব ট্রুপারদের রানা ও ফরহাদ কাবু করতে পেরেছে কিনা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেয়েগুলোকে বিল্ডিঙের বাইরে বের করে নিয়ে যেতে হবে তার।

উচিত হয়নি পিছন ফেরা।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিল, সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হলো জামিল, যদিও সক্রিয় হবার সময় পেল না। সে শুধু বুঝতে পারল প্রথম ট্রুপার, যার দুটো পা-ই গুঁড়ো হয়ে গেছে, মেঝেতে চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থাতেই কিভাবে যেন শক্তি ফিরে পেয়েছে, বুকের ওপর থেকে রাইফেলটা তুলে নিয়ে ট্রিগার টানার চেষ্টা করছে। মাথা ঘুরিয়ে তাকে শুধু এক পলকের জন্যে দেখতে পেল জামিল, শরীরটা তখনও ঘোরা শেষ করেনি, দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে হাতুড়ির বাড়ি অনুভব করল, সবেগে ঠেলে দিল সামনের দিকে। কয়েক সেকেন্ড যেন শূন্যে ঝুলে থাকল সে, সুতোয় বাঁধা একটা পুতুলের মত, তারপর শুরু হলো দীর্ঘ পতন। দেখতে পেল তার দিকে উঠে আসছে মেঝে, ঘন ঘন এদিক ওদিক কাত হচ্ছে সেটা। দৃশ্যটা অদ্ভুত লাগল তার। আঙুল ঢিলে হয়ে যাওয়ায় হেকলার অ্যান্ড কচ খসে পড়ল। শুনতে পেল কে যেন তার নাম ধরে চিৎকার করছে, আওয়াজটা ভেসে এল যেন অনেক দূর থেকে। খোলা দরজা দিয়ে ছুটে ফিরে আসছে নাসিম, সুন্দর চেহারায় হতভম্ব ভাব। ছোঁ দিয়ে মেশিন পিস্তলটা তুলে গুলি করল সে, প্রচণ্ড রাগে দাঁতের সঙ্গে সেঁটে আছে ঠোঁট।

চোখে ঝাপসা দৃষ্টি, জামিল দেখল মাকেসি গার্ডের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সে। লোকটার ভাঙা পায়ের ওপর পড়ে রয়েছে রাইফেলটা। চোখ বুজে হাঁপাচ্ছে সে। নাসিমের বুলেটগুলো তার পেটে গভীর গর্ত তৈরি করেছে।

জামিল অনুভব করতে পারছে নাসিম তার ওপর ঝুঁকে রয়েছে, নাসিমের পাশে কাঁচাপাকা চুল দেখা গেল, বৃদ্ধ কে যেন একজন। জামিলের মনে হলো, তার চেনার কথা, কিন্তু চিনতে পারছে না। বৃদ্ধ তাঁর শার্ট খুলে বুকের গর্তটা পরীক্ষা করছেন। স্বস্তিবোধ করল সে। তার মনে হলো, সে সেরে উঠবে। বৃদ্ধ ওর কপালে হাত বুলিয়ে অভয় দিচ্ছেন। তারপর ভাবল, তাহলে বৃদ্ধ ভদ্রলোক হাসছেন না কেন? রহস্যটা বোঝার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো সে। কি কারণে যেন গভীরভাবে কিছু চিন্তা করতে পারছে না। আশপাশের সবাইকে কেমন যেন ছটফট করতে দেখছে সে। বিড় বিড় করে কি যেন বলছে নাসিম, শুনতে চেষ্টা করে পারল না। মাথা উঁচু করে উঠে বসার কথা ভাবল সে, কিন্তু শক্তি পাচ্ছে না। তারচেয়ে বরং খানিক বিশ্রাম নেয়া যাক। চোখ বুজে ক্লান্ত হাসি হাসল সে। যখন নাসিমের নরম বুকে নেতিয়ে পড়ল তার মাথা, হাসিটা তখনও লেগে আছে মুখে। খোলা দরজা দিয়ে রানা ও ফরহাদ যখন লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকল, তখনও তা ম্লান হয়নি।

সাত

একটা আকেশা গাছের তলায় মাটি খুঁড়ে জামিলকে কবর দিল রানা।

মেজর কাগলি আর তার সৈনিকদের লাশ সেবাশ্রমের ধ্বংসস্তূপের ভেতর পড়ে থাকল, সেগুলোকে টপকে বিধ্বস্ত করিডর থেকে নেমে এলেন ড. গনি, দেখে মনে হবে রাতারাতি তিনি একশো বছরে পা দিয়েছেন। 'এর জন্যে তুমি দায়ী, রানা!' থর থর করে কাঁপছেন।

'আর কোন উপায় ছিল না, ড. গনি,' বলল রানা। 'পাহাড়ের মাথায় উঠে যখন

দেখলাম মেজর কাগলি পৌঁছে গেছে, নিয়তি তখনই আমাদের ওপর সিদ্ধান্তটা চাপিয়ে দেয়।'

'তাই বলে এই পৈশাচিক কাণ্ড করবে তোমরা? একবার ভেবে দেখলে না এতিম মেয়েগুলোর কি হবে? আমার হাসপাতাল, এতিমখানা, স্কুল, মসজিদ···কিছুই তো থাকল না। এখানে তোমরা সরকারী সৈন্য মেরেছ, তার পরিণতি কি ভাবতে পারো? তোমরা তো চলে যাবে, কিন্তু আমাদের কি হবে?'

কি বলবে রানা? সন্দেহ নেই, ওরাই ড. গনিকে এই বিপদে ফেলেছে।

আনিস সিদ্দিকী এখনও বোগামুরার হাতে বন্দী। বোগামুরা নিশ্চয়ই হাসছেন। জাফর আর জামিল মারা গেল।

'তোমার প্ল্যানটা কি বলবে আমাকে, রানা?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কিছুই আর করার নেই, লুগাম্বা ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমরা।'

'আর আনিস সিদ্দিকী? তাঁকে তো এখনও জিম্মি করে রাখা হয়েছে।'

'জানি। দুঃখিত, তাঁকে উদ্ধার করার এখন আর কোন উপায় নেই। ব্যাপারটা কেঁচে গেছে।'

'তাহলে এত রক্তপাত, এতগুলো লোক প্রাণ দিল, সব অকারণে?'

'আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করব না। যা কিছু উদ্ধার করা সম্ভব, সব গুছিয়ে নিন। পনেরো মিনিটের মধ্যে রওনা হবার জন্যে তৈরি হতে বলুন সবাইকে।'

চোখ মিটমিট করলেন ড. গনি। 'রওনা হতে বলব? তুমি কি পাগল হলে, রানা?'

'খুব বেশি হলে আর এক ঘণ্টার মধ্যে সরকারী ট্রুপস চলে আসবে, ড. গনি। আপনাকে বলার দরকার আছে, এখানে এসে কি করবে তারা? আপনার মেয়েদের সবাইকে আমি টয়োটায় তুলে নেব, আমার সঙ্গে ফরহাদও থাকবে। ভোরের দিকে সীমান্ত পেরুব আমরা। আপনি নাসিমের সঙ্গে প্লেনে উঠবেন, আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে কারাঙ্গায়।'

ব্যথা পেয়ে আহ্-উহ্ করছে ফরহাদ, সিস্টার আসমা তার কাঁধে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে। ফেটিগের টপটা খুলতে সাহায্য করেছে মেয়েটা, দক্ষ হাতে ক্ষতটা পরিষ্কার করে দিয়েছে। সার্জারিতে রয়েছে ওরা, কাজের ফাঁকে ফরহাদের একহারা পেশীবহুল শরীরটা দেখছে আর খানিক পর পর বুক ঠেলে উঠে আসা দীর্ঘশ্বাস চাপছে।

ব্যাপারটা ধরতে পারছে ফরহাদ। জাফরের মৃত্যু সংবাদ শোনার পর থেকেই এরকম করছে মেয়েটা। ফরহাদ সচেতন, জাফরের সঙ্গে আসমার কিছু একটা ছিল, চুপিচুপি ওদেরকে দৃষ্টি বিনিময় করতে দেখেছে সে। মেয়েটা নিজে থেকে কিছু বলছে না, ফরহাদও প্রশ্ন করে তাকে বিব্রত করতে চাইছে না। তবে মেয়েটা যে আঘাত পেয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইতিমধ্যে জামিলের কবরে পাথর চাপা দিয়েছে ওরা। মরা মানুষের ওপর হায়েনা আর শিয়ালদের কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই। কবরের সামনে সবাই ওরা দাঁড়িয়ে ছিল, চাঁদের মুখ ঢেকে দিচ্ছিল টুকরো টুকরো মেঘ, জামিলের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় ওরাও সবাই নিচু করে ছিল মাথা।

ফরহাদও একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। যে-কোন মুহূর্তে বোগামুরার সৈনিকরা পৌঁছে

যাবে সেবাশ্রমে। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সে, আসমার পিছু নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

রীতিমত চিৎকার করছে রানা। 'যাবেন না মানে? এখানে থাকলে একজনও আপনারা বাঁচবেন?'

ড. গনির দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা দেখে মনে হলো তাঁকে টলানো যাবে না। 'প্রশ্নটা বাঁচা-মরার নয়, রানা। নীতির। এই সেবাশ্রম ছেড়ে কোথাও আমরা যেতে পারি না। এ আমার একার সিদ্ধান্ত নয়। জিজ্ঞেস করে দেখো, তোমার প্রস্তাবে কেউ ওরা রাজি নয়।'

সিস্টার ও স্টাফদের দিকে তাকাল রানা, কেউ এক চুল নড়ল না। 'এ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!' বলল ও। 'সবাই আপনারা আত্মহত্যা করতে চান?' এক সেকেন্ড ইতস্তত করে আবার বলল, 'নিজেদের সম্ভ্রমের কথাও ভাববেন না?'

সবার তরফ থেকে কথা বলল সিস্টার তসলিমা। 'কাকা আমাদের নতুন জীবন দান করেছেন। তাঁর ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা। আমাদের হারাবার কিছু নেই।'

'ব্যাপারটা আমাদের দৃষ্টিতে দেখো, রানা,' বললেন ড. গনি। 'আশপাশে এক দেড়শো গ্রামের মধ্যে এই একটা প্রতিষ্ঠানই কেবল টিকে আছে, এটা ফেলে আমরা চলে যেতে পারি না। মুসলমান বলো, খ্রিস্টান বলো, আমরা চলে গেলে কে ওদেরকে দেখবে? আমরা যে শুধু চিকিৎসা করি, স্কুলে পড়াই, এতিম মেয়েদের আশ্রয় দিই, তা ভেবো না। আমরা এখানে আছি বলে পঞ্চাশ ষাট মাইলের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি···।'

রানার চেহারায় পরাজয়ের ছাপ ফুটে উঠল। 'ঠিক আছে, বুঝলাম বৃথা সময় নষ্ট করছি,' বলল ও। 'থাকবেনই যখন, থাকুন। তবে আমার একটা অনুরোধ আপনাকে রক্ষা করতে হবে। এখন থেকে বাহাত্তর ঘণ্টা সবাইকে নিয়ে আপনি পাহাড়ে কাটাবেন। এই বাহাত্তর ঘণ্টা, দিনে বা রাতে, ভুলেও কেউ এখানে আসবেন না। কাঁথা-কম্বল, মশারি, খাবারদাবার, যা পারেন সঙ্গে করে নিয়ে যান।'

'কি লাভ তাতে?'

'এখনও বলতে পারছি না কি লাভ, তবে আমি চাই আগামী তিন দিন এখানে এসে মিলিটারিরা যেন আপনাদেরকে দেখতে না পায়। আমরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও পাহাড়ে গিয়ে লুকাবেন। রোগীদেরও সঙ্গে রাখবেন।'

চিন্তা করছেন ড. গনি। নিস্তব্ধতা ভাঙল সিস্টার তসলিমা, 'মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টারই তো ব্যাপার, উনি যখন এত করে বলছেন···।'

মাথা ঝাঁকালেন ড. গনি। 'ঠিক আছে, তাই থাকব। কিন্তু মিলিটারি এসে আমাদেরকে যদি না পায়, সেটা আরও খারাপ হবে না? আমি ভবিষ্যতের কথা ভাবছি।'

'ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে। এসো, ফরহাদ।'

ওদের সঙ্গে প্লেন পর্যন্ত হেঁটে এলেন ড. গনি। নাসিম আগেই উঠে পড়েছে।

'আল্লা তোমাদের সহায় হোন,' বললেন ড. গনি।

'তাঁর সাহায্য আপনাদেরই বেশি দরকার,' বলে সিস্টারদের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল রানা, হ্যারিকেন ও কুপি দিয়ে চিহ্নিত করা রানওয়ের পাশে জড়ো হয়েছে সবাই।

ফরহাদ বলল, 'আপনারা আর দেরি করবেন না, ড. গনি। এখুনি রওনা হয়ে

যান।' রানার পিছু নিয়ে কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

প্রথমে তাঁকে ইন্টারন্যাশনাল লাক্স সাবান দিয়ে গোসল করানো হলো। তারপর পরতে দেয়া হলো নতুন একটা শার্ট ও স্ল্যাকস, সদ্য ইস্ত্রি করা। খাতির-যত্নের বহর দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন আনিস সিদ্দিকী।

কমান্ড পোস্টে রয়েছেন তিনি। কারাগার থেকে প্রথমে তাঁকে ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট সিকিউরিটির হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। ভেবেছিলেন ডস-এর সেলারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাঁকে গুলি করে মারার জন্যে। সেলে তাঁকে ঠিকই ঢোকানো হয়, তবে গুলি করেনি।

সকালে তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছে কমান্ড পোস্টে। সৈনিকদের প্রশ্ন করেছেন তিনি, কোন জবাব পাননি। একটা বেডরুমে রয়েছেন এই মুহূর্তে, সংলগ্ন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন দুনিয়ার সব ভাল ভাল খাবার টেবিলে সাজানো। সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, ভাবলেন নাস্তার মধ্যে বিষ মিশানো নেই তো? বোগামুরা হঠাৎ ফেরেশতা বনে গেলেন কিভাবে?

ভয়ে ভয়ে নাস্তা খেলেন তিনি। তারপরও বেঁচে আছেন দেখে বিস্ময়ের সীমা থাকল না। এরপর লম্বা করিডর ধরে তাঁকে নিয়ে আসা হলো বড় একটা চেম্বারে।

কোদাল আকৃতির হলুদ দাঁত বের করে হাসছেন জুলিয়াস বোগামুরা। 'গুড মর্নিং, মি. সিদ্দিকী। আশা করি গোসল ও নাস্তা উপভোগ করেছেন?'

কথা বলতে না পেরে আনিস সিদ্দিকী শুধু মাথা ঝাঁকালেন। কামরায় আরেক ভদ্রলোক উপস্থিত রয়েছেন, তাঁর দিকেই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন তিনি। ভদ্রলোককে তিনি চেনেন, যদিও কবে বা কোথায় দেখেছেন ঠিক মনে করতে পারছেন না।

সোফা ছেড়ে উঠে তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন ভদ্রলোক, করমর্দনের জন্যে হাত বাড়ালেন, মুখে বিজয়ীর হাসি। 'হ্যালো, মি. সিদ্দিকী। আমি মাইকেল ল্যাক্স। আমি আপনাকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি।'

ঠিক চরম মুহূর্তে ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল ফোনটা। হাঁপাচ্ছে ডেল নিকোলাস, দুর্বোধ্য সব আওয়াজ বেরিয়ে আসছে গলা থেকে, ঘেমে গেছে সারা শরীর; তার নিচে মেয়েটারও ওই একই অবস্থা।

'শালারা আর সময় পেল না!' মেয়েটার ওপর থেকে নামল নিকোলাস, হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলল কানে। 'হোয়াট!' রিসিভারে হাত চাপা দিল সে, মেয়েটার দিকে ফিরে বলল, 'কাপড় পরো।'

ঠোঁট ফোলাল মেয়ে।

'আমি কিছু শুনতে চাই না!' ফোনে হুঙ্কার ছাড়ল নিকোলাস। 'বেরিকে খুঁজে বার করো, বলো ওখানে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।' খটাস করে রিসিভার রেখে দিয়ে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল।

'কি ব্যাপার, লাভার?' কাপড় পরছে মেয়েটা, চেহারায় অভিমান।

চেয়ারের পিঠ থেকে স্ল্যাকস নিয়ে পরতে শুরু করল নিকোলাস। 'কোন্ শালা

বেজন্মা ক্লাবে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।'

ওখানে পৌঁছে নিকোলাস দেখল যা ঘটার ঘটে গেছে, গোটা ক্লাব ছাই হয়ে গেছে পুড়ে। তিনটে বার, দুটো ডাইনিংরুম, স্পেশাল কেবিন, অফিস, ড্যান্স ফ্লোর, বিলিয়ার্ড রুম, গ্যাম্বলিং রুম, রেস্তোরাঁ—কোটি টাকার ওপর ফার্নিচার সহ কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

'কাজটা খুবই নিখুঁতভাবে সারা হয়েছে, মি. নিকোলাস,' অ্যাটেনড্যান্ট ফায়ার অফিসার স্বীকার করল। 'আলাদা আলাদা এক্সপ্লোসিভ চার্জ, তবে সবগুলো একসঙ্গে বিস্ফোরিত হয়েছে। যারাই দায়ী হোক, দক্ষ না বলে উপায় নেই। লক্ষ্য করেছেন, শুধু আপনার ক্লাবটা ধ্বংস হয়ে গেছে, আশপাশের কোন দালানের এতটুকু ক্ষতি হয়নি।'

নিকোলাস কর্কশ গলায় বলল, 'ধরে নিচ্ছি, কেউ কিছু দেখেনি?'

কাঁধ ঝাঁকাল অফিসার। 'পুলিসকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। ওদিকে, আপনার ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছে ওরা।'

মালিককে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ম্যানেজার। তাকে প্রশ্ন করে বিশেষ কিছু জানতে পারল না নিকোলাস। ম্যানেজার সন্ধের খানিক আগে ক্লাবে ঢুকতে যাচ্ছিল, কেউ একজন পিছন থেকে তার মাথায় রড দিয়ে আঘাত করে। তার জ্ঞান ফেরে পাশের অন্ধগলিতে, হাত-পা বাঁধা ছিল, মুখে ছিল টেপ। হুঁশ ফেরার একটু পরই বিস্ফোরণের আওয়াজ পায় সে। খালি টিনের কৌটায় লাথি মেরে লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে।

নিকোলাসের চোখে আগুন জ্বলছে। বেরি কোথায় ছিল? বা রডনি?

পুলিস জানতে চাইল, তার কোন শত্রু আছে কিনা।

এক ঘণ্টা পর পুলিস ও দমকল বাহিনীর লোকজন চলে যেতে বিধ্বস্ত ক্লাবে পথ হারানো শিশুর মত কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করল নিকোলাস। এক সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। বুঝতে পারছে কার কাজ এটা।

এটা আসলে একটা ওয়ার্নিং। প্রতিশোধ নেয়া শুরু হয়েছে।

সেলিনা নাসিমের চীফট্যান ধ্বংস করার ফল।

নিকোলাসের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত নেমে এল। নাসিমের সেই বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেছে তার, টাকা দিতে এসেছিল। সে ভাবল, বেরিকে প্লেনটা ধ্বংস করতে পাঠানো একটু বোধহয় বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। কে জানে কোথায় গিয়ে শেষ হবে ব্যাপারটা।

নিজের লোকদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বেরিকে তার দরকার। ফোন করার জন্যে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল নিকোলাস। দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার সময় কেমন ছম ছম করে উঠল তার গা। আলো জ্বালার পর মনে হলো ফ্ল্যাটে আরও কেউ আছে, সে একা নয়। মেয়েটা হতে পারে না, তাকে নিয়েই বেরিয়েছিল সে। কোন শব্দ না করে দরজাটা বন্ধ করল, সাবধানে হলের ভেতর দিয়ে এগোল। আয়না লাগানো স্ট্যান্ডের সামনে থামল, ধীরে ধীরে খুলে ফেলল একটা দেরাজ। এক বাক্স শেলের পাশে পড়ে রয়েছে .৩৭৫ ম্যাগনামটা। অস্ত্রটা হাতে নিয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে এল নিকোলাস। বেডরুমের দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে। বিছানার চাদর এখনও এলোমেলো। লাউঞ্জের দরজা বন্ধ। হাতল ধরে বুক ভরে শ্বাস টানল সে,

তারপর হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে মাথা নিচু করে ঢুকে পড়ল ভেতরে, ডান হাতে শক্ত করে ধরে আছে ম্যাগনাম।

বেতের চেয়ারে বসে রয়েছে বেরি। রডনি রয়েছে লম্বা একটা সোফায়। কেউ তারা নড়ল না দেখে হাতের ম্যাগনাম নিচু করল নিকোলাস। 'ইউ স্টুপিড বাস্টার্ডস! এখুনি তো গুলি খেয়ে মরতে। তোমরা ভেতরে ঢুকলে কিভাবে?'

বেরি বা রডনি তার কথা শুনছে না।

বেরির কপালে ছোট্ট একটা লাল ফুটো দেখা যাচ্ছে, খুব একটা রক্ত বেরোয়নি। তবে মাথার পিছনে গর্তটা বেশ বড়, নিকোলাসের হাতের মুঠো ঢুকে যাবে। একই ভাবে মারা হয়েছে রডনিকেও।

আরও একটা জিনিস লক্ষ করল নিকোলাস। কফি টেবিলে একটা এনভেলাপ। ভেতরে একটা প্লেনের টিকেট, কাল সকালের ফ্লাইট, যাবে দক্ষিণ আফ্রিকা। টিকিটটা কাটা হয়েছে ডেল নিকোলাসের নামে।

কলিংবেল বেজে উঠল।

বন্ করে ঘুরল নিকোলাস, বেতের চেয়ারে হাঁটুর ধাক্কা লাগল, চেয়ার থেকে কাত হয়ে পড়ে গেল বেরির লাশ। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল নিকোলাসের, বমি পাচ্ছে। আবার বেল বাজল, এবার অনেকক্ষণ পর থামল। দ্বিধায় পড়ে গেছে সে, কি করা উচিত বুঝতে পারছে না। তারপর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনল, পিছিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল, বেরিয়ে এসে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

দু'জন লোক। বিনয়ী, তবে সতর্ক। একজনের হাতে ব্রাউন লেদার ওয়ালেট। পুলিস।

নিকোলাসের তলপেটে আলোড়ন উঠল। 'ইয়েস?' সে ভাবছে, ওরা সম্ভবত ক্লাবের ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানতে বা জানাতে এসেছে। হয়তো কোন সূত্র পেয়েছে।

'মি. নিকোলাস, ডেল নিকোলাস? সিআইডি। আশপাশের বাড়ি থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। এখানে নাকি খারাপ কিছু ঘটেছে।'

'খারাপ কিছু ঘটেছে?' ঈশ্বর! ঘামছে নিকোলাস। আশ্চর্য, ওরা তার দিকে এভাবে তাকিয়ে আছে কেন?

'গুলির আওয়াজ, মি. নিকোলাস,' সিআইডি অফিসারদের একজন বলল, তার সহকর্মীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হলওয়েের ওপর কি যেন খুঁজছে।

'গুলির আওয়াজ?' শব্দগুলো গলায় আটকে যাচ্ছিল, একটা ঢোক গিলল নিকোলাস। হায় যীশু, ওদের প্রতিটি কথা সে পুনরাবৃত্তি করছে কেন?

ওরা তার দিকে এভাবে তাকিয়েই বা আছে কেন? কিন্তু না, ওরা তো তার দিকে তাকিয়ে নেই! তাকিয়ে রয়েছে তার হাতে ধরা ম্যাগনামটার দিকে। ও মেরী, তার হাতে ম্যাগনাম!

এরপর দ্রুত কাজ শুরু করল অফিসাররা। প্রথমেই তাকে নিরস্ত্র করা হলো, দেয়ালে ঠেসে ধরে সার্চ করার পর ম্যাগনামের মাজলে নাক ঠেকিয়ে গন্ধ শুঁকল একজন অফিসার। তারপর চেম্বার খুলল সে। নিকোলাস হঠাৎ উপলব্ধি করল, নাসিমের বন্ধুরা কাজটায় সত্যিই খুঁত বলে কিছু রাখেনি।

ম্যাগনামটা থেকে দু'বার গুলি করা হয়েছে।

*

কেনডুরায় ওএইউ শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি প্রায় শেষ। কনফারেন্স সেন্টার ও হোটেল কমপ্লেক্সের কাজ শেষ করার জন্যে ইসরায়েলি ঠিকাদাররা রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা কাজ চালিয়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট স্বয়ং খোঁজ-খবর রাখছেন, বলে দিয়েছেন কোন রকম গাফলতি বা ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না। মূল বাজেটের চেয়ে খরচ পড়ছে তিনশো গুণ বেশি, তবে ফলাফল দেখে বোগামুরা খুশি, খরচের ব্যাপারে তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই।

কনফারেন্স সেন্টারের সামনে সারি সারি স্ট্যান্ডে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জাতীয় পতাকা উড়ছে। মেইন স্কয়ারে স্যালুটিং বেস ও ডেলিগেটদের জন্যে সুরক্ষিত মঞ্চ রঙ-বেরঙের কাপড় দিয়ে মুড়ে ফেলছে শ্রমিকরা। শুভ উদ্বোধনের মূল অনুষ্ঠান প্যারেড—আসলে এই সুযোগে বোগামুরা তাঁর সামরিক শক্তি প্রদর্শন করবেন। স্যালুটও তিনিই গ্রহণ করবেন, ঘোষণা করা হয়েছে আগেই। কূটনীতিকরা বলাবলি করছেন, প্যারেডের মূল আকর্ষণ হবে সোভিয়েত রাশিয়ার তৈরি টি-ফিফটিফোর ট্যাঙ্ক। সন্দেহ নেই সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রধানরা ওগুলো দেখে মুগ্ধ ও প্রভাবিত হবেন।

আনিস সিদ্দিকীর মুক্তির ব্যাপারে সহযোগিতা করায় হঠাৎ করে কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট নাই প্রেসিডেন্ট বোগামুরার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন, ঠিক হয়েছে স্যালুটিং বেসে বোগামুরার সঙ্গে নাই-ও উপস্থিত থাকবেন। আর লুগাম্বা সরকারের বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বোগামুরার আরেক পাশে আসন গ্রহণ করবেন ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইকেল ল্যাক্স। আরও উপস্থিত থাকবেন সোভিয়েত অ্যামব্যাসাডর সের্গেই বেকভ। তিনি শুধু লুগাম্বায় রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত নন, আনঅফিশিয়াল হলেও বোগামুরার সামরিক ও অর্থনৈতিক উপদেষ্টার ভূমিকাও পালন করেন।

সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে।

খুব নিচু দিয়ে উড়ছে কমান্ডার, যাচ্ছে পশ্চিম দিকে। তারপর আরও নিচে নামল প্লেনটা, ঘাস ঢাকা খোলা প্রান্তর ছুঁয়ে যেন একটা পাখি যাচ্ছে। ধুলো ঢাকা উপত্যকার মাঝখানে নামল, খানিক দূর ছুটে ধীরে ধীরে ঘুরল এক পাক, তারপর গায়ে জোছনা মেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাঁচ মিনিট পর আবার আকাশে উঠল কমান্ডার। সদ্য নামা আরোহী দু'জন ঝোপের ভেতর গুড়ি মেরে বসে থাকল, মুখ তুলে প্লেনটার অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া দেখছে। তারপর ওরা ওদের প্যাক তুলে নিয়ে রওনা হলো উপত্যকার মাথার দিকে। ওদিকের একটা পথ ধরে শহরে পৌছুবে।

ডেলিগেটরা হোটেল ছাড়তে শুরু করলেন। সরকারী মার্সিডিজের একটা বহর এক সারিতে দাঁড়িয়ে আছে, অতিথিদের মেইন স্কয়ারে নিয়ে যাবে। বেলা দশটা, এরইমধ্যে গরমে তেতে উঠেছে রাজধানী। কাঁচ দিয়ে মোড়া নতুন কনফারেন্স সেন্টার আকাশ ছোঁয়া বিশাল এক আয়নার মত ঝলমল করছে।

মার্সিডিজগুলো যে পথ দিয়ে যাবে তার দু'পাশে গিজগিজ করছে মানুষ। স্কুল কলেজ থেকে ছেলেমেয়েরা এসেছে ড্রেস পরে, প্রত্যেকের হাতে লুগাম্বার জাতীয় পতাকা। মেইন স্কয়ার কর্ডন করে রেখেছে সৈনিকদের একটা বৃত্ত, ভিড়ের দিকে কঠিন

দৃষ্টিতে নজর রাখছে তারা। তাদের হাতের কালাশনিকভে প্রতিফলিত হচ্ছে রোদ।

প্রেসিডেনশিয়াল ডায়াস আর ডেলিগেটদের মঞ্চের মাঝখানে রয়েছে প্রেস স্ট্যান্ড। ডায়াসে বোগামুরার জন্যে একটা সিংহাসন বসানো হয়েছে, পাশে ও পিছনে সোফা ফেলা হয়েছে তার বিশেষ অতিথিদের জন্যে। সিংহাসনের সামনে মাইক্রোফোনের স্ট্যান্ড। ডায়াসের ওপর লাল শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে রোদ ঠেকাবার জন্যে।

ডেলিগেটদের মঞ্চেও শামিয়ানা রয়েছে, তবে ওটার রঙ নীল। আসনের সংখ্যা ওখানে বেশি, পাঁচশোর মত। রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারদের জন্যে ফোল্ডিং চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরইমধ্যে অতিথিরা পৌঁছুতে শুরু করেছেন, সারি সারি সীটের মাঝখান দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছেন তাঁরা, সিকিউরিটির লোকজন নির্দিষ্ট আসন খুঁজে বের করতে সাহায্য করছে তাঁদেরকে।

কর্ডনের বাইরে ভিড়ের মধ্যে ডস ও সাসুর এজেন্টরা মিশে আছে। তাদের পরনে নকশাদার শার্ট, হাতে মেশিন পিস্তল, চোখে সানগ্লাস।

দূরে কোথাও একটা ব্যান্ড বেজে উঠল। 'বোগামুরা, আমাদের মুক্তিদাতা দীর্ঘজীবী হোন,' এ-ধরনের একটা গানের সুর বাজাচ্ছে যন্ত্রীরা।

একটা মার্সিডিজে চড়ে মেইন স্কয়ারে পৌঁছুলেন মাইকেল ল্যাক্স। ওএইউ শীর্ষ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট বোগামুরার তিনি বিশেষ অতিথি। ইতিমধ্যে সফররত কেনিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর হোটেল স্যুইটে দেখা করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ল্যাক্স, ধন্যবাদ দিয়ে বলেছেন প্রেসিডেন্ট নাই সহযোগিতা না করলে মি. সিদ্দিকীকে এত সহজে ও তাড়াতাড়ি মুক্ত করা সম্ভব হত না।

আনিস সিদ্দিকী এখন নাইরোবিতে, ক্লান্ত হলেও নিরাপদ।

বলা যায়, এ মাইকেল ল্যাক্সেরই কূটনৈতিক সাফল্য। পদাধিকার বলে তিনিই প্রথম কেনিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী, তারপর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করেন ফোনে। তারই ফলশ্রুতিতে প্রেসিডেন্ট নাই বোগামুরাকে আনিস সিদ্দিকীকে মুক্তির প্রস্তাব দেন। এত বড় মাপের একটা সাফল্যের পরও ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মনে সুখ নেই। রীতিমত দুশ্চিন্তায় ভুগছেন তিনি।

অ্যাকটিং হাই কমিশনার ডেভিড হোপের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছে। টেরোরিস্টদের সম্পর্কে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় লুগাম্বা সরকারকে সময় মতই সাবধান করেছিল। টেরোরিস্টরা আনিস সিদ্দিকীকে কিডন্যাপ করতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু সবাই তারা মারা যায়নি বা ধরাও পড়েনি। ডেভিড হোপ তাঁর নিজস্ব সূত্র থেকে জানতে পেরেছেন টেরোরিস্টদের মধ্যে মারা পড়েছে মাত্র দু'জন, বাকি দু'জন পালিয়েছে। মৃত লোকদের পরিচয় জানা না গেলেও তাদের মধ্যে যে মাসুদ রানা নেই, এটা স্পষ্ট—লাশ দুটোর কোনটার সঙ্গেই তার চেহারা মেলে না।

এটাই মাইকেল ল্যাক্সের দুশ্চিন্তার কারণ।

সম্ভবত তীরে এসে তরী ডোবা একেই বলে। কয়েক বছর আগে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস থেকে দু'মুখো সাপ খুঁজে বের করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল রানা এজেন্সিকে। সে-সময় পদাধিকার বলে তিনিই ছিলেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের কর্মকর্তা—মহাপরিচালক। টাকার প্রয়োজনে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় কিছু গোপন তথ্য পাচার করেছিলেন, সেটা বিএসএস-এর কয়েকজন অফিসারের চোখে ধরা পড়ে যায়। ফলে

তারাও যখন রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য বিভিন্ন দেশকে বিক্রি করতে শুরু করল, তিনি দেখেও না দেখার ভান করতে বাধ্য হন। অফিসাররা তাঁর বেঈমানীর ব্যাপারটা শুধু উপলব্ধি করতে পেরেছিল, তাদের হাতে কোন প্রমাণ ছিল না। তবু রানা এজেন্সি তদন্ত শুরু করায় ভয় পেয়ে যান ল্যাক্স। বিদেশী একটা এজেন্সিকে দেশের সবচেয়ে স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠানে নাক গলাতে দেয়া হচ্ছে, এর প্রতিবাদে মহা পরিচালকের পদ থেকে ইস্তাফা দেন তিনি। পরে অবশ্য মনে মনে রানা এজেন্সির কাজে খুশিই হন, কারণ বেছে বেছে এমন সব অফিসারদের ধরছিল ওরা, যারা জানে ল্যাক্সও একজন অপরাধী।

বেঈমান অফিসারদের সবাই জেল খাটছে। তদন্তের সময় তারা নিশ্চয়ই তার নামও ফাঁস করে দিয়েছে, কিন্তু প্রমাণের অভাবে রানা এজেন্সি তাঁর নামে কোন অভিযোগ আনতে পারেনি।

তা না আনতে পারলেও, এজেন্সির ডিরেক্টর মাসুদ রানা যে তাঁর ওপর একটা চোখ রেখেছে, এটা ল্যাক্স খুব ভাল ভাবেই জানেন। সেজন্যেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। সুযোগটা পেয়েও গেলেন আনিস সিদ্দিকীকে নিয়ে সঙ্কট সৃষ্টি হওয়ায়। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে তাঁর প্ল্যান পুরোপুরি সফল হয়নি। টেরোরিস্টরা মাত্র দু'জন মারা পড়েছে, তাদের মধ্যে মাসুদ রানা নেই।

মাসুদ রানাকে তিনি খুব ভাল করে চেনেন, সেটাই তাঁর ভয় পাবার কারণ। মিশন ব্যর্থ হবার পর মাসুদ রানা ঠিকই বুঝে নেবে কেন কি ঘটেছে। এক অর্থে রবার্ট পিলকে লোক দিয়ে খুন করিয়েও কোন লাভ হয়নি। গোটা ব্যাপারটাই যে একটা ফাঁদ ছিল, এটা বোঝার পর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার লোক মাসুদ রানা নয়। কেউ আঘাত করলে পাল্টা আঘাত করাই তার স্বভাব। আঘাতটা কোন্ দিক থেকে এসেছে, ঠিকই ধরতে পারবে সে।

ল্যাক্স ভাবছেন, অনুষ্ঠান শেষ হলে বাঁচেন তিনি, তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে নিজের নিরাপত্তার দিকটা নিশ্চিত করবেন। মুশকিল হলো, পাল্টা আঘাতটা কি হবে সে-সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা নেই। দীর্ঘদিন থেকে তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে রানা এজেন্সি, কতটুকু সফল হয়েছে তা-ও তাঁর জানা নেই। হাতে প্রমাণ থাকলে সেগুলো ফাঁস করে দিতে পারে রানা। আবার ওসব ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি হামলাও করতে পারে।

তবে, লুগাম্বায় তাঁর কোন ভয় নেই। তাড়া খেয়ে একবার ভেগে যাবার পর দ্বিতীয়বার লুগাম্বায় আসবে না রানা। তিনি ধরেই নিচ্ছেন কোন রকমে প্রাণে বেঁচে যাওয়ায় লুগাম্বা ছেড়ে বেরিয়ে গেছে রানা।

তবে তার পালিয়ে যাবার ঘটনাটা খুবই বিস্ময়কর ও রহস্যময়। অ্যাকটিং হাই কমিশনার জানিয়েছেন, কেনডুরায় গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে টেরোরিস্টরা মাসামবাবুল নামে এক এলাকায় একটা সেবাশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিল। খবর পেয়ে ডস প্রধান মেজর কাগলি একদল সৈনিককে নিয়ে যায় ওখানে। কিন্তু তারা আর ফিরে আসেনি। এরপর পাঠানো হয় সেনাবাহিনীর আরও বড় একটা দলকে, সঙ্গে ছিল স্করপিয়ন ট্যাংক। আজ সকালে রিপোর্ট এসেছে, মাসামবাবুলের সেবাশ্রম খালি—হাসপাতালে রোগী নেই, এতিমখানায় মেয়েরা নেই, স্কুলে ছাত্রীরা নেই। সব একেবারে হাওয়া হয়ে গেছে। এ-সবের একটাই অর্থ হতে পারে, মাসুদ রানা সেবাশ্রমের লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে গেছে।

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন মানুষকে নিয়ে পালানো সহজ কাজ হবে না। এখনও হয়তো ওরা সীমান্ত পেরুতে পারেনি। লুগাম্বা সীমান্ত সীল করে দেয়া হয়েছে। মাসুদ রানা ধরা পড়লে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ঈশ্বর, তাই যেন ঘটে!

আট

সৈনিকদের পাশ কাটিয়ে কমপাউন্ডে ঢুকে পড়ল ভ্লাদিমির প্রোবিন। ছ'টা টি-ফিফটিফোর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে, মাজলগুলো হাঁ করে আছে আকাশের দিকে। ক্রুরা যে যার ভেহিকেলের পাশে দাঁড়িয়ে। প্রতিটি টি-ফিফটিফোর চারজন ক্রু নেয়—কমান্ডার, ড্রাইভার, গানার ও লোডার। প্রোবিন ও ইসরায়েলি টেকনিশিয়ানরা বোগামুরার সৈনিকদের ট্রেনিং দিতে শুরু করেছে, এরইমধ্যে ছত্রিশ টন ওজনের দানবগুলোকে স্টার্ট দিতে পারে, সচল করার পর থামাতেও পারে। পারে না শুধু লক্ষ্যভেদ করতে। কে জানে, আরও মাসখানেক ট্রেনিং দিলে হয়তো তা-ও পারবে। যতদিন তা না পারে ততদিন প্রতিটি ট্যাংকে একজন করে রুশ বা ইসরায়েলি টেকনিশিয়ান থাকবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে, বাকি তিনজন হবে লুগাম্বান।

প্যারেডে অংশ নেয়ার জন্যে ট্রুপস জড়ো হতে শুরু করেছে। কলামের মাথায় পজিশন নিয়েছে ব্যান্ড। প্রোবিন ও তার লোকজন একটু পরই ট্যাংক নিয়ে এগোবে।

এক সারি মটরসাইকেল দেখা গেল, প্রেসিডেন্ট বোগামুরাকে এসকর্ট করে নিয়ে আসছে। মেইন স্কয়ারের চারদিকে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল সৈনিকদের, স্যালুট করল তারা। দর্শকদের ভিড়ের ভেতর ডস ও সাসু এজেন্টরা সাপের মত ক্ষিপ্রগতিতে ছুটোছুটি শুরু করল।

মোটর শোভাযাত্রার প্রথম গাড়িটায় রয়েছেন বোগামুরা। ফুটপাথের পাশে থামল সেটা, নিচে নেমে দরজা খুলে দিল একজন এইড। বডিগার্ডরা পজিশন না নেয়া পর্যন্ত নড়লেন না বোগামুরা। যখন নামলেন, চারজন মাকেসি বডিগার্ড ঘিরে ফেলল তাঁকে, সবার পরনে সবুজ সাফারি জ্যাকেট।

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে প্রেসিডেন্টের চেহারা। তাঁর প্রকাণ্ড শরীর ঢোলা একটা ইউনিফর্মে ঢাকা, এ ইউনিফর্ম শুধু ফিল্ড মার্শালরা পরেন। ইউনিফর্মে শোভা পাচ্ছে প্যারাট্রুপার উইংস ও চ্যাম্পিয়ন মেডাল, সঙ্গে আছে ডিএসও আর ভিসি—নিজেকে নিজেই পুরস্কৃত করেছেন তিনি। তাঁর ইউনিফর্মের রঙ আকাশী নীল। হাতে এমন কি একটা এমবস করা ব্যাটনও আছে। বাম হাতে কোন ব্যান্ডেজ বা স্লিং দেখা যাচ্ছে না।

মাইকেল ল্যাক্স ও সের্গেই বেকভ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। পরস্পরের পরিচিত ওঁরা। বছর কয়েক আগে বেকভ যখন কেজিবিতে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখতেন ল্যাক্স।

বডিগার্ডদের সঙ্গে এগিয়ে আসছেন বোগামুরা, তাঁর পাশের জায়গাটা দখল করে নিলেন বেকভ। পিছনের গাড়ি থেকে নামলেন কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট, টাইয়ের নট ঠিক করে নিয়ে নাই-এর পাশে চলে এলেন ল্যাক্স। দুই প্রেসিডেন্টের মাঝখানে রয়েছে পল মাতুরা, মেজর কাগলি মারা যাবার পর সে-ই এখন ডস-এর প্রধান। মাতুরা সাসু-রও

প্রধান। বোগামুরার পর সেই এখন লুগাম্বার সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যক্তি।

কর্ডন ভেদ করে ভেতরে ঢুকলেন প্রেসিডেন্ট আর তাঁর অতিথিরা, ধীর পায়ে স্যালুটিং ডায়াসের দিকে এগোচ্ছেন। ডেলিগেটরা এরইমধ্যে তাঁদের জন্যে নির্ধারিত আলাদা মঞ্চে আসন গ্রহণ করেছেন, বোগামুরাকে দেখে করতালি দিচ্ছেন তাঁরা। ব্যাটন নেড়ে সাড়া দিলেন বোগামুরা।

ডায়াসে ওঠার পর দেখা গেল বসার আয়োজনে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। বোগামুরার পাশের আসনে বসার সৌভাগ্য হলো শুধু পল মাতুরা আর সের্গেই বেকভের। বোগামুরা ও মাতুরার পাশে ও খানিকটা পিছনের আসনটা দেয়া হয়েছে ল্যাক্সকে। ল্যাক্সের পাশে বসেছেন প্রেসিডেন্ট নাই। মুক্তিদাতার দেহরক্ষীরা মঞ্চের পিছনে পাথুরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল।

প্রোবিনের ট্যাংক আর ব্রিটিশ স্করপিয়ন এবার প্যারেডে অংশগ্রহণ করবে। ট্যাংকের ক্রুরা যে যার জায়গায় উঠে বসেছে, নির্দেশের অপেক্ষায় তাকিয়ে আছে প্রোবিনের দিকে। স্করপিয়নের ক্রুরাও প্রস্তুতি নিচ্ছে। একটা হাত নাড়ল প্রোবিন, দুনিয়া কাঁপানো আওয়াজ তুলে জ্যান্ত হয়ে উঠল ডিজেল এঞ্জিন, বাতাসে ছড়িয়ে দিল ঘন ধোঁয়ার মেঘ।

দ্রুত পায়ে হেঁটে এসে সামনের ট্যাংকে উঠে পড়ল প্রোবিন। ঘাড় ফিরিয়ে লাইনটা একবার দেখে নিল সে, পজিশন নিল টারিট-এ, বাইরে থেকে শুধু তার গলা ও মুখ দেখা যাচ্ছে। লুগাম্বান ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল সে, হ্যাচের গায়ে হেলান দিয়ে শক্ত করল শরীর, ঝাঁকি খেয়ে সামনে এগোল ট্যাংক। অবজারভেশন স্লিট দিয়ে সামনেটা দেখতে পাচ্ছে ড্রাইভার। কমপাউন্ড থেকে বেরিয়ে প্যারেড গ্রাউন্ডে ঢুকে পড়ল সে। প্রোবিনের পিছনে বাকি টি-ফিফটিফোরগুলো লাইন দিতে শুরু করেছে, এবার স্করপিয়নের ক্রুরাও যে যার পজিশনের দিকে এগোল।

'কর্পোরাল!'

অফিসার সাদা একটা পুজোর পাশে দাঁড়িয়ে, গাড়িটা সর্বশেষ স্করপিয়নের পিছনে, আড়াআড়িভাবে পার্ক করা। প্রতীক চিহ্নই বলে দিল ওটা একটা সাসু গাড়ি। কর্পোরাল আর তার ড্রাইভার থমকে দাঁড়াল। অন্যান্য ক্রুরা যে যার নিজের ট্যাংকে চড়তে শুরু করেছে। নার্ভাস দেখাল কর্পোরালকে, ইতস্তত করছে।

অফিসার তার দিকে চোখ গরম করে তাকিয়ে আছে। 'তোমরা কালা নাকি? এদিকে এসো, দু'জনকেই আমার দরকার। মুভ!'

গাড়িটার দিকে এগিয়ে এল তারা। সামনের ও পিছনের প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে রেখেছে অফিসার। কর্পোরাল তার সঙ্গীকে নিয়ে গাড়ির কাছাকাছি পৌঁছুল, স্করপিয়নের আড়াল থাকায় এই মুহূর্তে কমপাউন্ডের বা প্যারেড গ্রাউন্ডের কেউ তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। অভ্যাসবশত একটা হাত তুলল কর্পোরাল, স্যালুট করল অফিসারকে। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্যালুটের উত্তর দিল অফিসার, যেন ব্যথায় কাতর হয়ে আছে, ক্যাপের কারনিস প্রায় ঢেকে রেখেছে চেহারা। ইঙ্গিতে পুজোর ভেতরটা দেখাল সে। 'ভাল করে দেখো, কর্পোরাল। আমি এর ব্যাখ্যা চাই।'

কর্পোরাল ভুরু কোঁচকাল। 'স্যার?' অফিসার কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছে না সে। আড়চোখে ক্রুর দিকে একবার তাকাল সে, তারপর আরও দু'পা এগিয়ে গাড়ির

পিছনের দরজার ভেতর উঁকি দিল।

অকস্মাৎ যান্ত্রিক গুঞ্জন শুরু হওয়ায় বোঝা গেল অন্যান্য ক্রুরা তাদের ট্যাংক স্টার্ট দিয়েছে। কর্পোরালের গলা থেকে বেরিয়ে আসা বিস্ময়সূচক আওয়াজটা তাই চাপা পড়ে গেল। মাথা নিচু করে গাড়ির ভেতর উঁকি দিতেই সে দেখল চকচকে একটা ফলা ঝিলিক দিয়ে উঠল, সরাসরি তার দিকে উঠে আসছে। আরও একটা জিনিস উঠে এল—একটা হাত। হাতটা তার কণ্ঠনালী চেপে ধরল, ফলে বাতাসের সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল। হাতটা তাকে টেনে নিল গাড়ির ভেতর, পাঁজরের নিচে পেটের ভেতর সেঁধিয়ে গেল ফলাটা। মোচড় খেলো ছুরি, প্রতিটি মোচড়ের সঙ্গে ঝাঁকি খেলো শরীরটা।

দ্বিতীয় লোকটা শুধু দেখার সময় পেল তার সঙ্গী গাড়ির ভেতর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। পিঠে সাইলেন্সার লাগানো ব্রাউনিং ঠেকিয়ে তার হার্টে গুলি করল ফরহাদ। পিছন দিকে ঢলে পড়ল লোকটা, হেলান দিল পুজোর গায়ে। দ্রুত হাতে ধরে ফেলল ফরহাদ, তুলে নিল শূন্যে, ছুঁড়ে দিল সামনের সীটে।

কর্পোরালের টিউনিকে ছুরির ফলা মুছল রানা, লাশের ক্যাপটা মাথায় পরে কপাল ঢাকল। মুখে কালো ক্যামোফ্লেজ ক্রীম মেখে আছে। এমনকি কাছ থেকেও ওকে ফরহাদের মত কালো দেখাবে।

'যাও, ফরহাদ!' উইন্ডো শেলফ থেকে দুটো কম্বল টেনে লাশগুলো ঢাকল রানা। হাতে প্যাক নিয়ে বন্ধ করল দরজাগুলো। তারপর পিছু নিল ফরহাদের। স্করপিয়নে উঠল ওরা।

শামিয়ানার নিচে অসহ্য গরম, ঘেমে যাচ্ছেন মাইকেল ল্যাক্স। মুখের সামনে প্রেসিডেন্ট নাই একটা হাতপাখা নাড়ছেন, সেটার দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। বেকভকে দেখে মনে হলো না গরমে কষ্ট পাচ্ছেন। নিজের আসনে হেলান দিয়ে বসে আছেন তিনি, পরনে ক্রীম কালারের সুট, মাথায় ফেডোরা হ্যাট, মুগ্ধ দৃষ্টিতে উপভোগ করছেন অনুষ্ঠানটা।

বোগামুরাকেও খুব তৃপ্ত দেখাচ্ছে। বাদ্য বাজিয়ে চলে গেল ব্যান্ডপার্টি। স্যালুট নেয়ার জন্যে দাঁড়ালেন বোগামুরা। কয়েক পা এগিয়ে মাইক্রোফোনের সামনে চলে এলেন।

ব্যান্ড পার্টির পিছু নিয়ে এল মুক্তিদাতার ব্যাটালিয়ন, পরনে জলপাই সবুজ ফেটিগ আর নরম জাঙ্গল হ্যাট। স্যালুটিং ডায়াসের সামনে দিয়ে মার্চ করে এগোল তারা, রডের মত সিধে হয়ে আছে শিরদাঁড়া, ডানে চোখ ঘুরিয়ে বোগামুরার দিকে তাকাবার সময়ও নিয়মিত একটা ছন্দে দুলছে হাত। আনন্দে হৈ-চৈ করছে জনতা, তালি দিচ্ছে, যেন এই অনুষ্ঠানে তাদেরও একটা ভূমিকা আছে।

বিটিআর রিকনাইসনস আর ট্রুপ ক্যারিয়ারগুলো টারমাকে বেরিয়ে এল পদাতিক বাহিনীর পিছু নিয়ে। মঞ্চকে পাশ কাটানোর সময় ডেলিগেটরা তালি দিলেন। এরপর দেখা গেল স্কাউট কার-এর একটা বহর। ওগুলোর পিছু নিয়ে এল টি-ফিফটিফোর। এক লাইনে আসছে ওগুলো।

রাশিয়ান ট্যাংকগুলোকে দেখে ক্ষীণ বিদ্রূপাত্মক হাসির রেখা ফুটল ল্যাক্সের ঠোঁটে। ঘাড় ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকালেন একবার বেকভ, তাঁর হাসির উত্তরে ছোট্ট

করে মাথা ঝাঁকালেন ল্যাক্স। আবার তিনি প্যারেড গ্রাউন্ডে চোখ রাখলেন। টি-ফিফটিফোরের পিছু নিয়ে আসছে ব্রিটিশ স্করপিয়ন।

ফরহাদ হিসাব করল স্যালুটিং বেস থেকে দুশো গজ দূরে রয়েছে ওরা। সামনে এক লাইনে রয়েছে বাকি স্করপিয়নগুলো, আরও সামনে সোভিয়েত ব্যাটল ট্যাংক। প্রতি একজোড়া স্করপিয়নের মাঝখানে দশ গজ ব্যবধান, এগোচ্ছে ঘণ্টায় দশ মাইল স্পীডে। টারিট থেকে বোগামুরার বিশাল কাঠামোটা দেখতে পাচ্ছে সে। লাল শামিয়ানার নিচে নীল ইউনিফর্ম।

এখন আর মাত্র একশো গজ দূরে। প্রতি মুহূর্তে আরও কমে আসছে দূরত্ব। চট করে পিছন দিকটা একবার দেখে নিল ফরহাদ। পিছু পিছু আসছে এক ঝাঁক হাফ-ট্রাক, টো করে আনছে ফিল্ড গান।

আর পঞ্চাশ গজ। কথা না বলে ট্যাংকের খোলে নামল ফরহাদ, বন্ধ করে দিল হ্যাচ।

ফেড়োরার ছায়ার ভেতর নড়ে উঠল বেকভের চোখ, ঘাড় ফিরিয়ে ল্যাক্সের দিকে একবার তাকালেন। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে প্যারেড দেখছেন। একটু অপমান বোধ করলেন বেকভ।

স্যালুটিং বেসের পাশে চলে এল স্করপিয়ন, এই সময় ট্যাংকটা টার্গেটের দিকে ঘুরিয়ে নিল রানা। কাজটা দ্রুত, অপ্রত্যাশিতভাবে করা হলো। হতবিহ্বল বোগামুরার চোয়াল ঝুলে পড়েছে। স্করপিয়ন তখনও ঘোরা শেষ করেনি, তাঁর মস্তিষ্কে বিপদ সংকেত বাজতে শুরু করল।

পরমুহূর্তে তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন কি ঘটতে যাচ্ছে।

অনেক দেরি হয়ে গেছে।

গর্জে উঠল রানা, নির্দেশ পেয়ে ফায়ার করল ফরহাদ। ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে এল ট্যাংক, মাজল থেকে বেরিয়ে গেল আগুনের লকলকে জিভ। এইচই রাউন্ড ব্যবহার করছে ফরহাদ—একটা ক্যানিস্টার, শটগান কার্ট্রিজের মত অপারেট করা যায়, কাছ থেকে ব্যবহার করা হয় পদাতিক বাহিনীর বিরুদ্ধে। মাত্র পনেরো ফুট রেঞ্জে কেয়ামত নেমে আসবে।

কিন্তু কিছুই ঘটল না। শেলটা স্যালুটিং বেসের মাথার অনেকটা ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। তারমানে এই নয় যে ফরহাদের লক্ষ্য ব্যর্থ হয়েছে। রানার নির্দেশে ওটা ছিল তার ওয়ার্নিং বেল। বোগামুরা, পল মাতুরা, মাইকেল ল্যাক্স ও বডিগার্ডরা ওদের টার্গেট, অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট নাই বাদে বাকি সবাই। প্রথম শেলটা ফাঁকায় মারা হলো প্রেসিডেন্ট নাইকে সাবধান করার জন্যে। দ্বিতীয় শেলটা কখন ছোঁড়া হবে তা নির্ভর করবে পরিস্থিতির ওপর। কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট দুই থেকে সাত সেকেন্ডের বেশি সময় পাবেন বলে মনে হয় না। বাকি টার্গেট পালাচ্ছে দেখলে দু'সেকেন্ড সময়ও তাঁকে দিতে পারবে না ওরা। তারই মধ্যে আড়াল নিতে পারলে ভাল, তা না হলে ওদের কিছু করার নেই।

স্করপিয়ন ঘুরে যাচ্ছে দেখেই নিজের সীট ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ছেন ল্যাক্স। প্রেসিডেন্ট নাই-এর হাতপাখা স্থির হয়ে গেল। বেকভকে দেখে মনে হলো স্লো মোশনে নড়ছেন। ফরহাদকে হ্যাচের ভেতর মাথা গলিয়ে নিতে দেখেছেন, তারপর স্করপিয়ন

ঘুরতে শুরু করায় কি ঘটতে যাচ্ছে ধরে ফেলেছেন তিনি। তাসত্ত্বেও সীট ছেড়ে নড়তে পারলেন না, তাঁর মনে হলো গোটা ব্যাপারটা আসলে হ্যালুসিনেশন। 'এক্সলেন্সী,' বলে চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

লুগাম্বায় যে-কোন মুহূর্তে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে পারে, এ-ধরনের একটা আশঙ্কা প্রেসিডেন্ট নাই-এর মনে ছিল। তিনি ভাবলেন, ব্যাপারটা তাহলে আজই ঘটল। তিনি দাঁড়ালেন না, জানেন ছুটে পালাতে চেষ্টা করাটা বোকামি হয়ে যাবে। তার বদলে তিনি বসা অবস্থা থেকে লাফ দিয়ে পড়লেন সামনে, ডায়াসের ওপর গড়িয়ে গেল শরীরটা, তারপর কিনারা থেকে পড়ে গেলেন ছ'ফুট নিচের জমিনে।

'এক্সলেন্সী,' বলে চিৎকারটা মাত্র করেছেন বেকভ, পরমুহূর্তে ছুটে এল দ্বিতীয় শেল। স্যালুটিং বেস বিস্ফোরিত হলো, কমলা রঙের একরাশ কণায় পরিণত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস বোগামুরা। বিস্ফোরণের আওয়াজ ও ধাক্কায় বেকভের কানের পর্দা ছিঁড়ে গেল, কেউ যেন তাঁকে শূন্যে তুলে সবেগে ছুঁড়ে দিয়েছে ডায়াসের পিছনে। সারা শরীরে তীব্র ব্যথা অনুভব করছেন। আশ্চর্যই বলতে হবে, ধড়ে এখনও প্রাণ ধারণ করছেন তিনি।

প্রেসিডেন্ট নাইকে অনুকরণ করতে গিয়ে মাইকেল ল্যাক্স উপলব্ধি করলেন তাঁর শরীরে কোন শক্তি নেই। ডায়াসের ওপর, তাঁর ঠিক পায়ের কাছে, মুণ্ডুহীন পল মাতুরার দেহ গড়াগড়ি খাচ্ছে। সামনে লাফ দেবেন কি, দ্বিতীয় বিস্ফোরণে আবার বসে পড়েছেন তিনি নিজের অজান্তেই, তাঁর কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। আবার দাঁড়াতে যাবেন, এই সময় তৃতীয় শেলটা ফায়ার করল ফরহাদ। মাথা, গলা ও বুকের খানিকটা অংশ নেই, দাঁড়িয়ে আছেন ল্যাক্স তারপরও। বাধা দেয়ার ভঙ্গিতে হাত দুটো সামনে বাড়ানো।

ডায়াসের পিছনে দাঁড়ানো বডিগার্ডরা আলু ভর্তা হয়ে গেল।

'মেঝেতে একজন নড়াচড়া করছে,' রানার গলা এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল। খুব ভাল করেই জানে ও কে নড়াচড়া করছে। মাত্র দু'বছর আগে সের্গেই বেকভকে মাইকেল ল্যাক্স সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল ও, উত্তরে ওকে ব্যঙ্গ করেছিলেন বেকভ, বলেছিলেন ল্যাক্সের বিরুদ্ধে আমার কাছে প্রমাণ আছে ঠিকই, কিন্তু আমি তা আপনাকে দিতে যাব কোন্ দুঃখে!

চতুর্থ শেলটা সরাসরি বেকভকে আঘাত করল। ফলাফল বর্ণনা করা সম্ভব নয়, কারণ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন বেকভ, রক্ত-মাংসের থকথকে ও চটচটে আবর্জনার ভেতর তাঁর হাড়গোড় যদি থেকেও থাকে, আলাদাভাবে চেনার কোন উপায় নেই।

প্রতিটি শক ওয়েভ ঝাঁকি দিয়ে গেল গোটা স্কয়ারকে, তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের মত ভেঙে পড়ল জনতার ভিড়। রানা জানে, ওরা এই মুহূর্তে রিয়্যাকশন টাইম-এ রয়েছে। ধাক্কাটা সামলে নিয়ে পাল্টা হামলা শুরু করবে সৈনিকরা। স্করপিয়নের টারিটে স্মোক ক্যানিস্টার ছিল, ডিসচার্জার থেকে রিলিজ করল ওটা। ঝাঁকি খেয়ে সামনে বাড়ল ট্যাংক, এই সময় খোলের গায়ে প্রথম এক পশলা বুলেট বৃষ্টি হলো।

বিস্ফোরণ ও শোরগোলের আওয়াজ শুনে ঘাড় ফেরাল প্রোবিন। ট্যাংক বহরের ওপর দিয়ে তাকিয়ে আবর্জনার বৃষ্টি ও লোকজনের ছুটোছুটি দেখতে পেল সে। মঞ্চের ওপর ডেলিগেটরা সবাই শুয়ে পড়েছেন, হামাগুড়ি দিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করছেন নিরাপদ দূরত্বে। তৃতীয় বিস্ফোরণের পর তৎপর হয়ে উঠল সে। তার পিছনে বিপদের

মধ্যে কোথাও সের্গেই বেকভ রয়েছেন। আসলে ঘটছেটা কি?

'রিভার্স, ইউ ইডিয়ট, রিভার্স!' গর্জে উঠল প্রোবিন। আরেকটা বিস্ফোরণ ঘটল। স্যালুটিং বেস প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দেখল সে। তারপর একটা স্করপিয়নের টারিট থেকে ঘন ধোঁয়া বেরুতে শুরু করল, ট্যাংকটা গ্রাস করছে। কর্ডন দিয়ে মেইন স্কয়ারটাকে যারা ঘিরে রেখেছিল, পিঁপড়ের মত ছড়িয়ে পড়ছে তারা। হ্যান্ডগানের আওয়াজ পেল সে। বাকি স্করপিয়নগুলো এক লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

অলসভঙ্গিতে ঘুরে যাচ্ছে টি-ফিফটিফোর। একশো আশি ডিগ্রী ঘুরে গেল টারিট। প্রোবিন দেখল, ধোঁয়ায় ঢাকা স্করপিয়নটা চলতে শুরু করেছে।

প্রতি মুহূর্তে স্করপিয়নের স্পীড বাড়াচ্ছে রানা। স্কয়ার ও বটলনেক থেকে বেরিয়ে যেতে হবে ওদেরকে। ধোঁয়াটা খুব সাহায্য করছে। প্রথম বিস্ফোরণের পরই স্যালুটিং বেসের পিছনে জনতার ভিড় ভেঙে গেছে, কাছাকাছি ফাঁক লক্ষ্য করে এগোচ্ছে ও।

আশপাশে আরও অনেক আর্মারড ভেহিকেল রয়েছে, সেটাই ভয়ের কারণ। সোভিয়েত ব্যাটল ট্যাংক বা ব্রিটিশ স্করপিয়ন থেকে ছুটে আসা একটা শেল ঠিক মত লাগলে মুহূর্তের মধ্যে অচল হয়ে পড়বে ওরা। বাঁচার একমাত্র উপায় কোনভাবে পালানো। স্বস্তিকর ব্যাপার হলো, ঘণ্টায় নব্বুই কিলোমিটার ছুটতে পারে স্করপিয়ন।

টি-ফিফটিফোর পুরোপুরি ঘোরা শেষ হতে দেখা গেল স্করপিয়ন ও আর্মারড ভেহিকেলের অর্ধেক লাইন স্মোক স্ক্রীনে ঢাকা পড়ে গেছে। প্রোবিন এখনও গুলির শব্দ পাচ্ছে। জনতার সম্মিলিত শোরগোলকে ছাপিয়ে উঠছে আওয়াজগুলো। হতাশায় টারিটের ধাতব রিম-এ ঘুসি মারল সে।

'অল ইউনিট কমান্ডার আমার সঙ্গে ঝাঁক বাঁধো! ব্যাটল স্টেশনস। অন মাই কমান্ড, মুভ আউট!' রেডিও মাইকে চিৎকার জুড়ে দিল প্রোবিন। ঠিক যেখান থেকে আক্রমণ শুরু করেছিল স্করপিয়ন, সেদিকে ছুটছে তার ট্যাংক। বাকি স্করপিয়নগুলো পথ ছেড়ে সরে যেতে চাইলেও, অনভিজ্ঞ ক্রুরা জট পাকিয়ে ফেলছে।

স্করপিয়নের ৭·৬২ এমএম মেশিন গান অপারেট করছে ফরহাদ। ধোঁয়ার পর্দা ভেদ করে যে-ই ভেতরে ঢুকছে, ব্যারেল ঘুরিয়ে তাকেই গুলি করছে সে। অবশিষ্ট স্যালুটিং ডায়াসের পাশ ঘেঁষে এগোচ্ছে ওরা। সামনে একজন সৈনিক উদয় হলো, কংক্রিটের ওপর হাঁটু গাড়ল, একে-ফরটিসেভেন তুলে লক্ষ্যস্থির করছে। ট্রিগার টানল ফরহাদ, এক পশলা বুলেটে দু'ভাগ করে দিল কাঠামোটা। স্করপিয়ন লাশটার ওপর দিয়ে এগোবার সময় থামল না বা ইতস্তত করল না। স্কয়ারের কিনারায় পৌঁছে গেছে ওরা। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে স্করপিয়নের গতি আরও বেড়ে গেল।

টারমাক ধরে ছুটে আসছে প্রোবিনের ট্যাংক। এইমাত্র ডায়াসের কাছে পৌঁছুল ওটা। এরইমধ্যে পরিষ্কার হতে শুরু করেছে ধোঁয়া। পলায়মান স্করপিয়নের পিছনটা দেখতে পেল প্রোবিন, কিন্তু স্করপিয়ন আর টি-ফিফটিফোরের মাঝখানে রয়েছে দ্বিতীয় মঞ্চের একটা কোণ, অসংখ্য মানুষও দিকবিদিক ছুটোছুটি করছে। গুলি করা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে সিদ্ধান্ত নিল ধাওয়া করবে।

সৈনিকরা এখন একনাগাড়ে গুলি করছে, স্করপিয়নের শরীরে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট লাগছে। বাম দিকে ঘুরে গেল ওরা, টারমাক ধরে ছুটল। চারদিকটা ভাল করে দেখার জন্যে হ্যাচ খুলে টারিট থেকে মাথা বের করল ফরহাদ। হাতে মেশিন পিস্তল রয়েছে,

আপাতত অনুসরণকারীদের রেঞ্জের বাইরে সে। তারপর প্রথম জীপটা দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে এল, ড্রাইভার দ্রুত হুইল ঘোরাতে প্রতিবাদ করে উঠল চাকা।

আড়াল থেকে জীপটা বেরিয়ে আসতেই ফরহাদের হাতে গর্জে উঠল মেশিন পিস্তল। জীপের উইণ্ডস্ক্রীন বিস্ফোরিত হলো, কাঁচের টুকরো ক্ষতবিক্ষত করে ফেলল ড্রাইভারের চোখ-মুখ। আর্তনাদ করে উঠল লোকটা, হুইল ছেড়ে দিয়ে মুখ ঢাকল দু'হাতে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটপাথে উঠে গেল জীপ, কাঁচের শো-কেস ভেঙে ঢুকে পড়ল একটা দোকানে।

ওদের স্করপিয়ন তুমুল বেগে ছুটছে। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে, জানে রানা। এ-পর্যন্ত আসতে পেরেছে নেহাতই ভাগ্যের জোরে। পিকআপ পয়েন্টে পৌঁছুতে হলে আরও খানিক দূর যেতে হবে ওদেরকে।

কোণ ঘুরে ছুটে আসছে প্রোবিনের টি-ফিফটিফোরও। গানারকে সে অর্ডার দিল, 'বাম দিকে বাঁক নাও!'

টারিটে জায়গা কম, গানার প্রায় প্রোবিনের কোলের ওপর বসে আছে। ট্যাংক এগোচ্ছে ঝাঁকি খেতে খেতে। দাঁতে দাঁত চেপে লোকটাকে গাল দিল প্রোবিন। মাজল ঘুরে যাচ্ছে, গানারকে আবার নির্দেশ দিল সে। বিস্ফোরণ ঘটল, বারুদের গন্ধে ভরে গেল খোল।

প্রোবিন জানে সময়ের আগে ফায়ার করেছে তারা। আবার রিলোড করতে সময় দরকার। প্রথমে খরচ হয়ে যাওয়া শেলের কেসিং সরাতে হবে, তারপর ভরতে হবে নতুন শেল, আবার নতুন করে লক্ষ্যস্থির করতে হবে। প্রোবিন দেখল, স্করপিয়নের পিছনের ট্র্যাকে লাগল শেলটা। ট্যাংকের পিছনটা শূন্যে উঠে পড়ল, কান ফাটানো ধাতব আওয়াজ ভেসে এল। বাম দিকের ট্র্যাক চুরমার হয়ে গেছে, পিছনের হুইলগুলো বিস্ফোরিত হয়েছে। খোলের পিছন দিকে তুবড়ে গেছে আর্ম প্লেট।

টারিটের কিনারায় হাত দিয়ে চাপড় মারল প্রোবিন। 'আবার! আবার! ফায়ার, ইউ ইডিয়ট! নিশ্চিহ্ন করো ওদের!'

ট্র্যাকের নিচে জমিনের লাফিয়ে ওঠা অনুভব করল ফরহাদ, ট্যাংক থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল, হ্যাচের কিনারা ধরে কোনরকমে রক্ষা করল নিজেকে। একশো গজ দূরে সোভিয়েত ট্যাংক কমান্ডারকে দেখতে পেল সে, হেডসেটে চিৎকার করছে। দ্বিতীয়বার কামান দাগার জন্যে লক্ষ্যস্থির করছে তারা। খেয়াল করল, ফ্রন্ট ড্রাইভিং সীট থেকে উঠে আসছে রানা, পঙ্গু ট্যাংক ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে ওদেরকে। এরইমধ্যে টি-ফিফটিফোরের আড়াল পেয়ে সৈনিকরা ছুটে আসতে শুরু করেছে। স্করপিয়নের পিছনে ও ওদের কাছ থেকে কয়েকগজ ডাইনে একটা বিল্ডিঙের গায়ে আঘাত করছে বুলেট। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে টারিট থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল ফরহাদ, ছুটে আসা ট্রুপস আর নিজের মাঝখানে স্করপিয়নকে রাখল।

ট্যাংকের ভেতর ক্যাপ আর গগলস খুলে ফেলেছে রানা। ওর মাথা ও কাঁধ হ্যাচের বাইরে বেরুতেই কাভার দেয়ার জন্যে মেশিন পিস্তল থেকে এক পশলা গুলি করল ফরহাদ, তারপর ওয়েস্ট প্যাক থেকে বের করল একজোড়া গ্রেনেড, দাঁত দিয়ে পিন খুলে ছুঁড়ে দিল দূরে।

রাশিয়ান ট্যাংকের পিছন থেকে কয়েকজন সৈনিক সামনে চলে এসেছে, তাদের

সামনের সারি বিস্ফোরণের জায়গায় ছুটে এল, চোখের পলকে শরীরগুলো রাস্তা ছেড়ে উঠে পড়ল শূন্যে—রক্ত-মাংসের আবর্জনা ও আগুনের সমষ্টি। ধোঁয়া ও ধুলো সরে যেতে স্করপিয়নের আড়াল ছেড়ে দৌড় শুরু করল ওরা। দুটো আকাশ ছোঁয়া বিল্ডিঙের মাঝখানে সরু একটা গলি, ভেতরে ঢুকে পড়ার পর প্রোবিনের দ্বিতীয় শেল ছুটে এল, বিস্ফোরিত হলো ওদের ছেড়ে আসা স্করপিয়নের ফুয়েল ট্যাংক। উজ্জ্বল আগুনের শিখা গিলে ফেলল স্করপিয়নকে। শ্র্যাপনেলের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল বিল্ডিংগুলোর দেয়াল।

শক ওয়েভের ধাক্কা খেয়ে গলির ভেতর পড়ে গেল ফরহাদ ও রানা, লাফ দিয়ে সিধে হয়ে ছুটল আবার। ওদের পিছনে সচল হলো প্রোবিনের ট্যাংক, সৈনিকরাও নতুন উদ্যমে ধাওয়া শুরু করল। অন্যান্য মোবাইল কমাণ্ডারকে অর্ডার দিচ্ছে প্রোবিন। তাদের শিকার এখন ট্যাংক থেকে বেরিয়ে ছুটছে, সৈনিকরা চারদিকে ছড়িয়ে থাকায় ওদেরকে ঘিরে ফেলা সময়ের ব্যাপার মাত্র। বিধ্বস্ত স্করপিয়ন থেকে মাত্র দু'জন লোককে বেরুতে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারেনি সে।

ফরহাদকে নিয়ে গলির শেষ মাথার কাছাকাছি চলে এল রানা, দু'জনই হাপরের মত হাঁপাচ্ছে। চারদিকে চোখ বুলাল ফরহাদ। সৈনিকরা এবার গলির ভেতর ঢুকে পড়ছে, এঁকেবেঁকে এক আড়াল থেকে আরেক আড়ালে লুকাচ্ছে তারা। সবাইকে পিছন ফেলে এগিয়ে এসেছে একজন, মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে সে, এখনও ছুটছে। কোমরের কাছে ধরা ফরহাদের মেশিন পিস্তল গর্জে উঠল। ঘুরে গেল লোকটা, কাঁধের অর্ধেকটাই উড়ে গেছে। পড়ে যাচ্ছে সে, এরইমধ্যে আরেকটা গ্রেনেড ছুঁড়ে দিল ফরহাদ। বদ্ধ জায়গার ভেতর ফলাফল হলো ভয়াবহ, যদিও তা দেখার জন্যে অপেক্ষা করল না, রানার পিছু নিয়ে ছুটল আবার।

দশ গজও এগোয়নি, প্রোবিনের প্রথম মোবাইল ইউনিট ওদের সামনে গলির মুখে পৌঁছে গেল।

বাঁয়ে-ডানে ঘন ঘন জায়গা বদল করল রানা, সহজ টার্গেট হতে চাইছে না। একটা দরজা দেখতে পেয়ে সেঁটে গেল সেটার গায়ে, দেখাদেখি ফরহাদও।

কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ওরা। গলির দুই দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রু, বেরুবার কোন পথ নেই। ফাঁদটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে।

'মাসুদ ভাই!' আওয়াজ শুনে মনে হলো কেঁদে ফেলবে ফরহাদ। 'মাসুদ ভাই, আমি না বাঁচলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু আপনাকে যেভাবে হোক বাঁচতে হবে!'

কথাগুলো শুনতে পেলেও জবাব দিল না রানা, পালাবার পথ খুঁজছে ও। ওরা দাঁড়িয়ে আছে একটা বিল্ডিঙের পিছনের দরজায়, পাশেই একটা লোহার ফায়ার এস্কেপ, ওপর দিকে উঠে গেছে। ওঠার সময় পাওয়া যাবে কিনা জানা নেই, তবে সুযোগ ওরা এই একটাই পাচ্ছে।

'গো! গো!' চিৎকার করল রানা, দু'হাতে ধাক্কা দিল ফরহাদকে, তার পিছু নিয়ে ধাপ বেয়ে উঠে যাচ্ছে। প্রথম ল্যাণ্ডিঙে থামল, ওদের দিকে ছুটে আসা সৈনিকদের লক্ষ্য করে গুলি করল দু'জন একসঙ্গে। পাল্টা গুলি হলো, লোহার ধাপে লেগে ছিটকে গেল বুলেট।

বিল্ডিংটা খালি একটা অফিস, দশতলা। ফায়ার এস্কেপের মাথায় চৌকো একটা

প্ল্যাটফর্ম দেখা গেল, তারপর বিশাল ছাদটা সমতল। ছাদে একটা ব্লকহাউস রয়েছে, সম্ভবত এলিভেটর মেকানিজম বা ভেন্টিলেশন ইউনিট রাখা হত। ওরা ছুটছে, ওদের নিচে লোহার প্রথম ধাপে পা রাখল সৈনিকরা।

ব্লকহাউসের আড়াল পেয়ে অপেক্ষায় থাকল ওরা। প্রথম সৈনিক লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল ছাদে। রানার গুলি খেয়ে ছাদের কিনারা থেকে পড়ে গেল সে, যেন অদৃশ্য একটা সুতো টেনে নিল তাকে। তার সঙ্গীরা দৃশ্যটা দেখে সাবধান হয়ে গেল, ছাদে বেরিয়ে আসতে সাহস পাচ্ছে না।

গম্ভীর মুখে ফরহাদের দিকে তাকাল রানা। 'তোমার অ্যামুনিশনের কি অবস্থা, ফরহাদ?'

'এইচ অ্যান্ড কে-র জন্যে তিনটে ম্যাগাজিন, লোড করা হ্যান্ডগান, আর একটা গ্রেনেড।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, দেয়ালের কোণ দিয়ে তাকাবার সময় বসে পড়ল ও। ফায়ার এস্কেপ থেকে সৈনিকরা নড়ছে না। মনে হলো কোন কারণে অপেক্ষা করছে তারা।

'এটাই বোধহয় পথের শেষ, ফরহাদ,' মৃদু গলায় বলল রানা। 'তবে তোমার ওই প্রলাপ দ্বিতীয়বার শুনতে চাই না। যদি মরি, দু'জন লড়েই মরব।'

ম্লান হাসল ফরহাদ। 'এখন আর আপনাকে বাঁচতে হবে বলে জেদ ধরব না আমি, মাসুদ ভাই। কারণ জানি, পালাবার কোন পথ নেই। আপনার কাছে কি কি আছে?'

'হ্যান্ডগান, আর দুটো ম্যাগাজিন।'

'দারুণ!'

রানার গলা সম্পূর্ণ শান্ত। 'কি জানো, আমি কিন্তু ভাবিনি যে আমরা পালাতে পারব।' ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল ওর ঠোঁটে। 'তবু, কয়েকজন বেঈমান আর মোটা শয়তানটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি, এটাই সান্ত্বনা।'

'যদিও নাসিম ও অন্যান্যরা কোন সান্ত্বনা পাবে না,' বলল ফরহাদ। ছাদের কিনারা দিয়ে নিচে তাকাল সে। মাথার ওপর সূর্য, রোদ এত গরম যে ছাদের কিনারা হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না। দূরে ক'টা রাস্তা দেখা যাচ্ছে, প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে, এমনকি সৈনিকদের উপস্থিতিও চোখে পড়ল না। সময় যত গড়াবে, ব্লক হাউসের এদিকটায় ধীরে ধীরে এগিয়ে আসবে রোদ। তবে ততক্ষণ ওরা বেঁচে থাকবে না।

বোগামুরার সৈনিকরা দল বেঁধে ছুটে এলে আর মাত্র কয়েক মিনিট বেঁচে আছে ওরা। সংখ্যায় ওরা অনেক বেশি, জানা কথা ফলাফল কি হবে। তবে সঙ্গে তাদেরও কয়েকজনকে নিয়ে যাবে ওরা।

শুরু হলো হামলা।

লাফ দিয়ে দৃষ্টিপথে বেরিয়ে এল এক লোক, মারা গেল ফরহাদের হাতে মেশিন পিস্তল গর্জে ওঠায়। ঝাঁকি খেয়ে পড়ে গেল লাশ, ছাদের মেঝেতে রক্ত গড়াচ্ছে।

'এরপর ওরা গ্রেনেড ব্যবহার করবে,' বলল রানা। 'ব্যাপারটা আমি আঁচ করতে পারছি। তারপর দলবেঁধে আসবে। তৈরি হও, ফরহাদ।'

কিন্তু ওর কথা শুনছে না ফরহাদ। সে অন্য কোন আওয়াজ শুনছে। মুখ দিয়ে একটা মাত্র শব্দ বের করল, 'চপার!'

বেল জেট রেঞ্জার শহরের কিনারা ঘেঁষে চক্কর দিচ্ছে। হলুদ ও কালো রঙের

একটা ফড়িং, ঘুরন্ত প্রপেলারে রোদ লাগায় চকচকে থালার মত লাগছে, হুপ হুপ হুপ রোটরের শব্দ জানিয়ে দিল আগমন বার্তা।

খুব নিচে দিয়ে ওদের দিকেই আসছে জেট রেঞ্জার, উঁচু বিল্ডিংগুলোর ছাদ প্রায় ছুঁয়ে। লাফ দিয়ে সিধে হলো রানা। সৈনিকরা এখনও নড়ছে না। কি ব্যাপার, এখনও তাদের প্রস্তুতি নেয়া শেষ হলো না! কপ্টারটার দিকে তাকাল ও। সহজে ওঠা-নামা করার জন্যে পিছনের দরজা সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

হাত নাড়ল রানা, চিৎকার করল, 'কাম অন! কাম অন!'

টি-ফিফটিফোর ছেড়ে ফায়ার এস্কেপের দিকে ছুটল প্রোবিন, ধাওয়া করার রোমাঞ্চ প্রবল নেশার মত ছড়িয়ে পড়ছে শিরায় উপশিরায়। ইতিমধ্যে সমস্ত মোবাইল ইউনিট দশতলা বিলিঙের চারপাশে জড়ো হয়েছে, সিঁড়ি বেয়ে একতলা থেকে আরেক তলায় উঠে যাচ্ছে সৈনিকরা। লুকিয়ে থাকার কোন জায়গা নেই দুই হত্যাকারীর। একজন উত্তেজিত এনসিও তাকে জানাল, আততায়ীদের কোণঠাসা করা হয়েছে। ফায়ার এস্কেপের শেষ ল্যান্ডিঙে জড়ো হচ্ছে ট্রুপস, ওখান থেকে আক্রমণ চালানো হবে ছাদে। যদিও, প্ল্যাটফর্মের বাইরে খোলা ছাদ নিরাপদ নয়, একটা ফাঁদই বলতে হবে। খোলা জায়গায় দু'জন বেরিয়েছিল, দু'জনেই মারা গেছে। কাজেই এখন আর কেউ সাহস পাচ্ছে না…।

কিন্তু প্রোবিনের রক্তে নেশা ধরে গেছে, এনসিও লোক পাঠাতে রাজি নয় শুনে বিরক্ত হলো সে। খুঁচিয়ে আড়াল থেকে বের করে না আনলে আততায়ীরা তো ওই জায়গা ছেড়ে সারাদিন নড়বে না!

প্রোবিন সিদ্ধান্ত নিল, সে-ই দায়িত্ব নেবে। প্লাটুন কমান্ডারকে নির্দেশ দিল সে। এক মিনিট পর দেখা গেল প্ল্যাটফর্মের নিরাপদ আশ্রয়ে হাঁটু গেড়ে রয়েছে প্রোবিন, তার সামনে নিচু একটা পাঁচিল, আর পাশে ছ'জন সৈনিক—তার নির্দেশ পাবার অপেক্ষায় রয়েছে তারা, সবার সঙ্গে প্রচুর অস্ত্র। প্রোবিন নির্দেশ দেয়া মাত্র গ্রেনেড ছুঁড়বে ওরা, বিস্ফোরণের আওয়াজ মিলিয়ে যাবার আগেই খোলা ছাদে বেরুবে, ব্লকহাউসের দিকে ছুটবে গুলি করতে করতে। সৈনিকদের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে একটা হাত উঁচু করল সে, ওটা নামিয়ে সংকেত দেবে।

এই সময় রোটর ব্লেডের আওয়াজ ঢুকল তার কানে। প্রথমে আওয়াজটা সে চিনতে পারল না। তারপর এক পলকে বুঝতে পারল কি ঘটতে যাচ্ছে। সাবধান করার জন্যে চেঁচাল সে, নামিয়ে নিল হাতটা।

সাব্বির দোনাভিচ উইন্ডশীল্ড দিয়ে নিচে তাকাল, রানা ও ফরহাদকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। ছোট বাংকার-এর মত দেখতে একটা কাঠামোর পিছনে আশ্রয় নিয়েছে ওরা। সাইড উইন্ডো দিয়ে ট্রুপার দু'জনের লাশও তার চোখে পড়ল। বিল্ডিংটার চারপাশের রাস্তায় ভিড় করেছে ট্যাংক, আর্মারড কার ও জীপ, ওগুলোর মাঝখানে গিজগিজ করছে আর্মি ফেটিগ পরা লোকজন।

'কি কাণ্ড!' নিঃশ্বাস ফেলল সে। ইয়োক টানল, আরও পঞ্চাশ ফুট নিচে নামল 'কপ্টার। উভয় সঙ্কটে পড়ে গেছে সে। ছাদের ওপর লাশগুলোর কাছাকাছি 'কপ্টার নামাতে হয় তাকে, আর কোথাও যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা নেই। কিন্তু ওখানে নামলে

মার্সেনারি ও সরকারী সৈন্যদের মাঝখানে পড়ে যাবে সে। ধারণাটাই ভীতিকর লাগছে। নিচে তাকিয়ে সৈনিকদের গতিবিধি বোঝার চেষ্টা করল সে, ভাবছে কি করা যায়।

তিনশো ফুট দূরে ব্যস্ত মৌমাছির মত আকাশে ছুটোছুটি করছে হেলিকপ্টার, রানার দৃষ্টি সারাক্ষণ অনুসরণ করছে ওটাকে, আর ছাদের ওপর নজর রাখছে ফরহাদ। সমস্যাটা পরিষ্কার। ছাদে নামতে পারছে না সাব্বির দোনাভিচ। বিকল্প উপায়ও কিছু নেই, এদিকে সময়ও ফুরিয়ে আসছে। হঠাৎ কাত হয়ে গেল কপ্টার, তির্যক ভঙ্গিতে নেমে এসে পাঁচিলের ওপর ঝুলে থাকল, পোর্ট সাইডের স্কিড ছাদের কিনারা ছুঁই ছুঁই করছে—ফায়ার এস্কেপ ও প্ল্যাটফর্মের উল্টোদিকে, সবচেয়ে দূরে। এক ঝটকায় হেডসেট খুলে ফেলল দোনাভিচ, খোলা জানালা দিয়ে চিৎকার করে বলল, 'কাম অন, মেজর! কাঁধে ডানা গজিয়ে উড়ে চলে আসুন।'

অবশ্য এরইমধ্যে ওরা ছুটতে শুরু করেছে। মাথা নিচু করে ছুটছে, রোটরের তীব্র বাতাস লাগছে চোখ-মুখে, ছুটছে ছাদের কিনারা লক্ষ করে। ব্লকহাউসের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বেরুবার পর পাঁচ গজ মাত্র এগিয়েছে, প্রথম গ্রেনেডটা ছাদের মেঝে দিয়ে গড়িয়ে এল, সেই সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাদে নামল একজন সৈনিক, গুলি করছে।

ব্লকহাউসের আড়াল থাকলেও শক ওয়েভের ধাক্কায় ঝাঁকি খেলো ওরা। পাঁচিলের ওপর উঠে লাফ দিয়েছে ফরহাদ, খোলা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ভেতরে।

রানাও পাঁচিলে উঠল, জেট রেঞ্জার লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে এই সময় গুলি খেলো উরুতে। সময়ের চুলচেরা হিসাব করেছিল দোনাভিচ, রানা লাফ দিতেই কপ্টার সরিয়ে নিতে শুরু করল। বুলেটের ধাক্কা খেয়ে রানার গতি কমে গেল, উপলব্ধি করল সময়ের হিসাবটা ভুল হয়ে যাওয়ায় কপ্টারে ওঠা হলো না।

লাফ দেয়া হয়ে গেছে, হয় কপ্টারের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকবে রানা, তা না হলে খসে পড়বে দশতলা নিচে।

দুটোর কোনটাই ঘটল না। খোলা দরজার কিনারা ঠেকল রানার হাতে, ধরে ফেলায় ঝুলে পড়ল শরীরটা। সবেগে ওপরে উঠে বাঁক নিতে শুরু করল দোনাভিচ, হঠাৎ ঝাঁকি লাগায় দরজার থেকে হাত দুটো খসে পড়ার অবস্থা হলো। চোখে আতঙ্ক নিয়ে ফরহাদ দেখল শেষ রক্ষা হলো না—দরজা থেকে খসে পড়ল রানার হাত, শরীরটা অদৃশ্য হয়ে গেল নিচে।

নয়

কপ্টারের দরজা থেকে হাত খসে পড়লেও রানা শেষ হয়ে যায়নি। মরিয়া কেউটের মত ছোবল মারল ওর একটা হাত, স্রেফ রিফ্লেক্স অ্যাকশন, মুঠোর ভেতর ধরে ফেলল স্কিড। নিচে সৈনিকরা ব্লকহাউসের এদিকটায় পৌঁছে গেছে। রানার ভার বদল হওয়ায় ঝাঁকি খেয়ে একদিকে কাত হয়ে পড়ল কপ্টার। দাঁতে দাঁত চেপে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার চেষ্টা করছে দোনাভিচ।

খোলা দরজার সামনে শুয়ে পড়েছে ফরহাদ, হাত লম্বা করে মেশিন পিস্তল থেকে ব্লকহাউসের দিকে গুলি করছে। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল রানার ডান হাত স্কিড আঁকড়ে ধরে আছে। দোনাভিচের উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল সে। 'জলদি!

তাড়াতাড়ি! সরে যাও, ফর গড'স সেক!'

ছাদে ছুটোছুটি করছে সৈনিকরা, কপ্টারের নিচে ঝুলন্ত শরীরটার কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করল সে। আরও এক পশলা গুলি করেই হাতে নিল গ্রেনেডটা। 'কপ্টারকে ওপরে ও দূরে সরিয়ে নিচ্ছে দোনাভিচ, একই সঙ্গে ঘোরাচ্ছেও, ওদিকে নিচে সাঙ্ঘাতিক দোল খাচ্ছে রানা, এই সময় পিন খোলা গ্রেনেডটা ছুঁড়ে দিল ছাদে।

সৈনিকদের সঙ্গে ছাদে বেরিয়ে এসেছে প্রোবিনও, ধোঁয়া আর ছুটোছুটির মধ্যে মাথা নিচু করে পরিস্থিতিটা বুঝতে চেষ্টা করছে সে। ব্লকহাউসের কোণে পৌঁছে এবার হেলিকপ্টারও দেখতে পেল। ওটা থেকে কেউ একজন গুলি করছে, পাল্টা জবাব দিচ্ছে সৈনিকরা। দৃষ্টিপথের কিনারায় ছোট ও গোলাকার কি যেন একটা দেখা গেল, নেমে আসছে তার মাথায়। পরমুহূর্তে অদৃশ্য একটা হাত ছাদ থেকে উপড়ে নিল তাকে। অসহ্য ব্যথা অনুভব করল সে, দেখল যেখানে পা ছিল সেখানে রক্ত, হাড় আর ক্ষতবিক্ষত মাংস দেখা যাচ্ছে শুধু। তারপর খেয়াল হলো, ছাদে নেই সে—তার যেন ডানা গজিয়েছে, ছাদের কিনারা থেকে নেমে যাচ্ছে নিচের রাস্তায়।

কপ্টারের পোর্ট উইন্ডশীল্ডে গুলি লাগায় মাকড়সার জাল হয়ে গেল সেটা। ফিউজিলাজেও আঘাত করছে বুলেট। রোটরে একটা লাগলেই হয়, ডিগবাজি খেতে খেতে রাস্তায় আছড়ে পড়বে কপ্টার। এখনও গুলি করছে ফরহাদ, ভাঁজ হয়ে মুখের ভেতর ঢুকে গেল ঠোঁট ক্লিপটা শেষ করার সময়। রানাকে এখন আর দেখতে পাচ্ছে না সে, জানে না এখনও স্কিড ধরে ঝুলছে কিনা।

অন্য এক বিল্ডিঙের আড়াল পেয়ে গেছে কপ্টার, সৈনিকরা তাদের টার্গেট হারিয়ে ফেলেছে। ওদের নিচে রাস্তায় ও অলিগলিতে ছুটোছুটি করছে আর্মির লোকজন, ওপরে তাকিয়ে গুলি করছে। তবে স্মল গানের গুলিতে কোন কাজ হবে না। আর ট্যাংক আর আর্মারড কারগুলো জায়গার অভাবে ঘুরে লক্ষ্যস্থির করতে পারছে না।

আপাতত অন্তত একটা বিপদ কেটে গেছে।

তবে রানা বুঝতে পারছে বেশিক্ষণ ঝুলে থাকতে পারবে না ও। স্কিড থেকে পিছলে যেতে চাইছে হাত, আর পা-টা অসাড় হয়ে যাচ্ছে। আবারও গুলি খেয়েছে ও, শরীরের ডান দিকে, পাঁজরের নিচে। আঘাতটা গুরুতর কিনা জানা নেই ওর। উরুতে গুলি লাগার সময় ঝাঁকি খেয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় আঘাতটা টেরই পায়নি। জ্যাকেটে রক্ত দেখে বুঝতে পারছে এখন। কপ্টারের দরজায় কে যেন নড়ছে বলে মনে হলো। ওখানে ফরহাদ আছে, চিৎকার করছে সে। রোটরের আওয়াজে কান ঝালাপালা, কথাগুলো ধরতে পারছে না। ফরহাদ সম্ভবত বলতে চাইছে ও যেন স্কিড ধরে ঝুলে থাকে। বোকা ছেলে, কতক্ষণ তা সম্ভব?

দেখতে পায়নি, অনুভব করল ফরহাদ ওর নাগাল পাবার চেষ্টা করছে। খোলা দরজার বাইরে শরীরটা বের করে দিয়েছে সে, একটা হাত নিচের দিকে লম্বা করা, গলা ফাটিয়ে কি যেন বলছে। গুলি খাবার সময় নিজের অস্ত্রটা হারিয়েছে রানা, এই মুহূর্তে স্কিডটা ধরে আছে দু'হাতে। স্কিড ধরা ডান হাতের মুঠো আরও একটু শক্ত করল ও, সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল পেট বেয়ে রক্ত নেমে যাচ্ছে। স্কিড থেকে বাম হাত সরিয়ে নিতেই মনে হলো বাহু থেকে আলাদা হয়ে যাবে কাঁধ। রোটরের শব্দ একঘেয়ে লাগছে, ঘুম ঘুম পাচ্ছে ওর। সচেতন থাকার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করল।

ওপর থেকে ফরহাদ দেখতে পেল সত্যিকার বিপদে পড়েছে রানা—চোখ দুটো প্রায় বুজে আছে, দাঁতে দাঁত চাপছে, স্কিড থেকে পিছলে যাচ্ছে হাত। ওর সাহায্য দরকার, দরকার এখুনি। দরজার কিনারা শক্ত করে ধরে কেবিন থেকে ঝুলে পড়ল সে, রানার হাত থেকে এক ইঞ্চি দূরে স্কিডের ওপর বুট রাখল। ওদিকে কোন রকম ঝাঁকি না খাইয়ে সমান একটা কোর্স ধরে কপ্টার চালাচ্ছে দোনাভিচ। এখনও ওরা শহরের ওপর রয়েছে, তবে সামনেই দেখা যাচ্ছে ঘাস ঢাকা খোলা প্রান্তর।

উঁচু করা হাতে স্পর্শ পেল রানা, তারপর কব্জিটা শক্ত মুঠোর ভেতর চলে গেল। আঙুলগুলো ফরহাদের কব্জিতে পেঁচাল ও, তারপর ডান হাত ছেড়ে দিল স্কিড। টেনে ওকে তুলে নিচ্ছে ফরহাদ, স্কিডে ঘষা খেলো পাঁজর, মুক্ত ডান হাত দিয়ে ধরে ফেলল দরজার কিনারা। আঁচড়াআঁচড়ি করে কপ্টারে উঠল রানা, সীটের ওপর নেতিয়ে পড়ল শরীরটা। খোলা দরজা দিয়ে উঠে আসছে ফরহাদ, কাঁধে ব্যথা অনুভব করছে। নিজের ব্যথার কথা ভুলে রানাকে প্রথমে পরীক্ষা করল সে।

ফরহাদের সারা মুখ ঘামে ভিজে আছে। জ্যাকেট খুলে রানার পিঠে আঙুল দিয়ে টেপাটেপি করল কিছুক্ষণ। বুলেট ভেতরে ঢোকেনি, পাঁজরের একটা হাড়ে ঘষা খেয়ে বেরিয়ে গেছে। তবে রক্ত ঝরেছে প্রচুর। হেসে উঠল সে। 'আপনি বাঁচবেন, মাসুদ ভাই!'

কপ্টারের ফার্স্ট এইড কিট খুলে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করল সে। রক্ত পড়া বন্ধ হতে মনোযোগ দিল রানার পায়ে। 'আপনি আইরিশদের ভাগ্য নিয়ে জন্মেছেন, মাসুদ ভাই!' বিস্মিত দেখাল তাকে। 'এখানেও দুটো গর্ত দেখা যাচ্ছে। ঢুকে বেরিয়ে গেছে, কেন হাড় ছোঁয়নি বলতে পারব না। কতটা সিরিয়াস তা-ও জানি না, তবে পেশী ছিঁড়েছে। আপাতত আমি পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে পারি।'

কপ্টার ঝাঁকি খেতে মুখ কোঁচকাল রানা। 'তুমি যখন বলছ, তাহলে সত্যি এ-যাত্রা বেঁচে গেলাম। তবে, কৃতিত্বটা তোমার।'

কথা বলার সময় চিৎকার করতে হচ্ছে ওদের।

উরুর ক্ষতটা পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল ফরহাদ। রানার হাতে একজোড়া ট্যাবলেট গুঁজে দিল সে। 'পেনিসিলিন, গিলে ফেলুন।'

'দেরি করার জন্যে দুঃখিত, মেজর,' রোটরের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল দোনাভিচের গলা। সীটে মোচড় খেয়ে পিছন দিকে তাকাল সে। 'আঘাত কি গুরুতর?'

'তেমন নয়,' বলল ফরহাদ। রিয়ার হেড সেটটা পেল সে। 'আর কতদূর যেতে হবে?'

সামনে তাকিয়ে নিচেটা দেখে নিল দোনাভিচ। এক সারি নিচু পাহাড় দেখা যাচ্ছে। 'পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবো রঁদেভো পয়েন্টে।'

'বোগামুরার ফাইটার? তাঁর মিগ স্কোয়াড্রন এখনও ধরে ফেলতে পারে আমাদের।'

'বোগামুরা না থাকায় সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাবে,' বলল রানা। 'প্রতিটি কাজে তার অনুমতি লাগত। মিগ ফাইটার আকাশে উঠবে কিনা, কে বলবে সে-কথা?'

'আমি ভেবেছিলাম পিকআপ পয়েন্টে আপনারা পৌঁছুতে পারবেন না,' বলল দোনাভিচ। 'রেডিওতে গ্রাউন্ড ইউনিটের কথাবার্তা মনিটর করছিলাম, কাজেই জানতাম যে স্করপিয়নকে অচল করে দিয়েছে ওরা। ভেবেছিলাম পৌঁছে দেখব

আপনারা ইঁদুরের মত ছুটোছুটি করছেন। তারপর শুনতে পেলাম ওরা বলছে আপনাদেরকে কোণঠাসা করা হয়েছে।'

হঠাৎ হেসে উঠল দোনাভিচ। 'বাবা সালাহউদ্দিনের এজেন্ট যখন ব্রিফ করল আমাকে, আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না! হায় খোদা, আপনারাই আনিস সিদ্দিকীকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন! তারপর যা শুনলাম, মনে হলো আমি পাগল হয়ে যাব! খোদ বোগামুরাকে মারার প্ল্যান। ও খোদা!'

নিজের টিউনিক খুলে ফেলল ফরহাদ, কাঁধের ক্ষতটা পরীক্ষা করছে। না, নতুন করে রক্ত ঝরছে না, তবে টান টান হয়ে আছে ক্ষতটা, হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না। টিউনিক পরে দোনাভিচের দিকে তাকাল সে। 'বাবা সালাহউদ্দিনের কাজ কতদিন ধরে করছ তুমি?'

আবার হেসে উঠল দোনাভিচ। 'এ-সব প্রশ্ন তোলা নিষেধ। তবে একান্তই যদি জানতে চাও, আমি একজন ফ্রিল্যান্সার। হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে তাঁর এজেন্টদের তথ্য সরবরাহ করি বটে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'বোগামুরার দিন ফুরিয়ে এসেছিল। এত অত্যাচার কি আর আল্লা সহ্য করে! অনেক আগেই জানতাম, বাবা সালাহউদ্দিন আবার লুগাম্বায় ফিরে আসবেন। তাঁকে সাহায্য করে আমি নিজের উপকারই করেছি, বলতে হবে।'

'তোমাকে আমাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত, দোনাভিচ,' বলল ফরহাদ।

'জানানো উচিত? বলো, আমরা কৃতজ্ঞ, চির ঋণী হয়ে থাকলাম।' রানা হাসছে না।

'নিচে নামছি আমরা,' বলল দোনাভিচ। 'মনে হচ্ছে আমাদের ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে। আপনাদের ইকুইপমেন্ট সঙ্গে রাখুন।'

শক্ত ও সমতল মাটির এক মাইল বিস্তৃতি, স্ট্রিপ হিসেবে কাজ চলে। চওড়ায় আধ মাইলের বেশি হবে না। বনভূমি কেটে তৈরি করা হয়েছে। গাছগুলোর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছে, প্রায় লুকানোই বলা যায়, একটা ডিসি-থ্রী। কপ্টার নিচে নামতে প্লেনের দিক থেকে ছুটে এল একটা মূর্তি। সেলিনা নাসিম।

'তোমার এই বদ অভ্যাসটা গেল না, রানা!' চিৎকার করছে সে। 'এত দেরি করলে কেন? এদিকে দুশ্চিন্তায় আমি…।' তারপর রক্ত ও ব্যান্ডেজ দেখতে পেল সে। 'সর্বনাশ, একি!'

এঞ্জিন বন্ধ করল দোনাভিচ। ধীরে ধীরে থেমে গেল রোটর। সরে গেল ধুলো।

'মাসুদ ভাই ভাল আছেন, নাসিম। তেমন সিরিয়াস কিছু নয়,' আশ্বাস দিল ফরহাদ।

রানাকে কপ্টার থেকে নামতে সাহায্য করছে দোনাভিচ। উরুতে সামান্য ধাক্কা লাগায় ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রানা। দর দর করে ঘামছে ও, ঘামের সঙ্গে গলে যাচ্ছে মুখের কালো ক্রীম।

'হ্যালো, নাসিম,' ক্লান্ত গলায় বলল ও, ম্লান হাসি লেগে রয়েছে ঠোঁটে। 'দেরি করলেও, পৌঁছুই আমি ঠিকই, অস্বীকার করতে পারবে না।'

কোন কারণ নেই, নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল নাসিম। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে রানার একটা হাত ধরল সে। ঠোঁট দুটো নড়ছে, কিন্তু কথা বলতে পারছে না। ম্লান চেহারা

উজ্জ্বল করে তুলল রানা, বলল, 'আরে বোকা, আমার কিছু হয়েছে নাকি? ঠিক করেছি হাসপাতাল বা ক্লিনিকে না গিয়ে তোমার ফ্ল্যাটে উঠব। আমার আসলে বিশ্রাম দরকার।'

আরও একটু এগিয়ে রানার কাঁধে মাথা রাখল নাসিম। ফিসফিস করে বলল, 'সে সৌভাগ্য কি সত্যি আমার হবে?'

নিজেকে ছাড়িয়ে দোনাভিচের দিকে তাকাল রানা। 'ঠিক আছে, সাব্বির। কি করতে হবে জানো তুমি। ফরহাদ, দেখে নাও কপ্টার থেকে আমাদের সব জিনিস নামানো হয়েছে কিনা। হাতে কি রকম সময় আছে জানি না আমরা। তাড়াতাড়ি সারো!'

রানা কথা বলছে, ডাকোটার এঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠল। গাছপালার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সরু স্ট্রিপের শেষ মাথায় চলে যাচ্ছে। টেক-অফ করার জন্যে তৈরি হলো প্লেন, নিজেদের অস্ত্র নিয়ে 'কপ্টার থেকে নেমে এল ফরহাদ। নাসিমের কাঁধে ভর দিয়ে প্লেনের দিকে এগোচ্ছে রানা।

কপ্টারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে দোনাভিচ। ওরা সবাই প্লেনে উঠে পড়ার পর লাফ দিয়ে জেট রেঞ্জারের কেবিনে চড়ল সে, পেট্রল ভর্তি একটা ক্যান তুলে নিয়ে ছিপি খুলল। কপ্টারের ভেতরটা পেট্রলে ভিজিয়ে নেমে এল নিচে, খানিকটা পেট্রল ফিউজিলাজেও ছড়াল, সবশেষে পিছিয়ে আসছে—হাতে কাত হয়ে আছে ক্যান, মাটিতে ভেজা একটা দাগ তৈরি হচ্ছে। ক্যানটা খালি হয়ে যেতে ছুঁড়ে কেবিনের ভেতর ফেলল।

কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল সে, বিষণ্ন দৃষ্টিতে জেট রেঞ্জারের দিকে তাকিয়ে। এই কপ্টার অনেকদিন চালিয়েছে সে, মায়া পড়ে গেছে। অসহায় একটা ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর পকেট থেকে বের করল লাইটারটা। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল সে, লাইটার জ্বালতেই আগুন ধরে গেল পেট্রলে। ভেজা দাগ ধরে ছুটল আগুনটা।

দৌড়ে প্লেনের কাছে চলে আসছে দোনাভিচ। ওর পিছনে দপ করে জ্বলে উঠল কপ্টার, চোখের পলকে একটা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো। তারপর বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো ট্যাঙ্ক, ব্যাঙের ছাতা আকৃতির কালো ধোঁয়া উঠল আকাশে।

ইতিমধ্যে বাকি সবাই ডাকোটায় উঠে পড়েছে। চলতে শুরু করেছে প্লেন, ছুটে এসে খোলা দরজার ভেতর লাফ দিল দোনাভিচ। হাঁপাচ্ছে সে, ঘামে ভিজে আছে মুখ, তারপরও হাসছে, বলল, 'ভাবছিলাম তোমরা বোধহয় অপেক্ষা না করেই চলে যাবে, সেক্ষেত্রে আমাকে বাস ধরে কিংবা হেঁটে বাড়ি ফিরতে হত।'

পরিমাণে বেশি কার্গো পরিবহনের জন্যে ডাকোটার সীট অনেক আগেই তুলে ফেলা হয়েছে। মেঝেতে বসে আছে রানা, পোর্ট বাল্কহেডে পিঠ। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে। মেঝেতে বসে ওর ওপর ঝুঁকে আছে নাসিম, চেহারায় উদ্বেগ ও সতর্কতা। 'বলো না যে শুধু হাসলে ব্যথা পাও,' ড্রেসিংগুলো পরীক্ষা করার সময় বিড়বিড় করছে সে।

'না, না হাসলেও ব্যথা পাচ্ছি,' সত্যি কথাই বলল রানা, রক্তক্ষরণে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, আধ-বোজা হয়ে আছে চোখ।

ঝাঁকি খেতে খেতে স্ট্রিপ ধরে ছুটছে ডাকোটা। এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে মনে হবে সামর্থ্যের চেয়ে অনেক বেশি বোঝা বইতে হচ্ছে ওটাকে। নাসিমের সাহায্যে এগিয়ে এল ফরহাদ, রানার একটা কাঁধ হাত দিয়ে এমনভাবে জড়াল, প্লেনের ঝাঁকিতে

যেন ব্যথা না পায়। ওর অপর কাঁধটা একই ভঙ্গিতে জড়িয়ে রেখেছে নাসিম।

ওদের উল্টোদিকে বসেছে দোনাভিচ, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'পঙ্খীরাজকে তোলো, চ্যাং, পঙ্খীরাজকে তোলো!'

তারপর, ছোট একটা লাফ দিয়ে শূন্যে উঠল প্লেন, ডানা কাত করে বাঁকা একটা পথ ধরে ছুটছে। 'হুপ,' করে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল ফরহাদ।

প্লেনের চাকার নিচে এখনও পুড়ছে জেট রেঞ্জার। পনেরো মিনিট পর ছ'হাজার ফুট ওপরে উঠে এল ওরা, অটো পাইলটে রয়েছে, যাচ্ছে পুবদিকে।

পর্দা সরিয়ে ফ্লাইট ডেক থেকে ছোটখাট এক লোক বেরিয়ে এল কেবিনে। রোগা, একহারা গড়ন; রোদে পোড়া চেহারা। বাদামী রঙের উইন্ডচিটার, আর ম্লান জিনস পরে আছে, মাথায় বেসবল ক্যাপ। ওদের কাছে এসে মেঝেতে বসে পড়ল সে, শান্ত সুরে বলল, 'মি. রানা, দেখতে পাচ্ছি আবার আপনি যুদ্ধে গিয়েছিলেন।' সুরটা শান্ত হলেও, এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল তার চড়া গলা। মুখের ভেতর চুইংগাম, সারাক্ষণ চিবাচ্ছে। 'তো কে জিতল বলবেন, নাকি আমি আন্দাজ করে নেব?'

'কেমন আছ, চ্যাং ওয়েন?' রানার ঠোঁটে দুর্বল হাসি।

'বহাল তবিয়তে, মি. রানা, তার কারণ আমি কখনও আপনার মত ঝুঁকি নিই না,' বলল ওয়েন, হাসছে সে।

'ঝুঁকি নাও না? তাহলে এখানে কি করছ?' ফরহাদ জিজ্ঞেস করল।

'এই ব্যাপারটা আলাদা,' জবাব দিল ওয়েন। 'একাধারে অনেকগুলো কারণ—মি. রানার প্রতি আমি নানাভাবে ঋণী, সেটা একটা কারণ। একই পেশায় থাকায় নাসিমের আমি বন্ধু, কাজেই তার উপকার করার সুযোগ আমি ছাড়তে পারি না। গোনজালেস আমার এজেন্ট, কাজকর্ম সব তার মাধ্যমেই পাই আমি, সে কোন অনুরোধ করলে ফেলি কি করে?'

একটা চার্টার-এর কাজে নাইরোবির বাইরে ছিল চ্যাং ওয়েন, ফেরার পরপরই গোনজালেস তাকে ডেকে পাঠায়, বলে তার একটা কাজ করে দিতে হবে।

দুর্গম একটা এলাকা থেকে তুলে আনতে হবে একদল লোককে।

রানার প্ল্যান, গোনজালেসের কনট্যাক্ট, বাবা সালাহউদ্দিনের টাকা। রানা জানত, ওদের একটা এস্কেপ রুট দরকার হবে। অল্প সময়ের ভেতর একমাত্র গোনজালেসের পক্ষেই সে-ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল।

ফ্রেটার-এর নাম কিং অভ জাঞ্জিবার, পাঁচ হাজার টন, লাইবেরিয়ায় রেজিস্ট্রি করা। সোমালিয়ায়, মোগাদিসু বন্দরে নোঙর ফেলে কার্গো লোড করার অপেক্ষায় ছিল। কৃষি যন্ত্রপাতি বলা হলেও, হোল্ডে আসলে তোলা হয় রাশিয়ায় তৈরি অস্ত্রশস্ত্র—গ্রেনেড লঞ্চার, কালাশনিকভ, এসজিটি-ফরটিথ্রী ও অ্যান্টি-পারসোনেল মাইন। গন্তব্য মোজাম্বিকের মাপুটো বন্দর। ওখান থেকে অস্ত্রগুলো পুব সীমান্ত বরাবর গেরিলা বেস ও ট্রেনিং ক্যাম্পগুলোয় চলে যাবে।

মাপুটোয় কাজ করছে চার্টার পাইলট যশবীর সিং, সারা বছরই গোনজালেসের মাধ্যমে কাজ পায় সে। মাপুটোয় তাকে অপেক্ষায় থাকতে বলা হয়েছে, ওদেরকে ডারবান-এ নিয়ে যাবে। ডারবান থেকে শিডিউল ফ্লাইট ধরে রানা চলে যাবে লন্ডনে, ফরহাদ আর নাসিম আমস্টারডামে। মানে ভাগ্য যদি বিরূপ না হয় আর কি।

মোগাদিসুতে লোক আছে গোনজালেসের, তার মাধ্যমে ফ্রেটার-এর ক্যাপটেনকে মেসেজ পাঠিয়েছে সে। জাহাজে প্যাসেঞ্জার নিতে হবে। মেসেজে আরও বলা হয়েছে কিং অব জাঞ্জিবার শিডিউল ভেঙে নোঙর ফেলবে চিসিমাইয়ো উপকূলে, মোগাদিসু থেকে আড়াইশো মাইল দূরে। চিসিমাইয়োতে একটা এয়ারফিল্ড আছে। কেনডুরা থেকে ছ'শো মাইল দূরে।

জেট রেঞ্জারের প্রয়োজনীয় রেঞ্জ ছিল না, আর থাকলেও খুব সহজে ওটাকে চিনে ফেলার ভয় ছিল। নাসিমের চীফট্যান অস্তিত্ব হারিয়েছে, আর তেল কোম্পানীর কমান্ডার দ্বিতীয়বার হাতছাড়া করতে রাজি হবে না নিক ডানহিল। তাছাড়া, বর্তমান পরিস্থিতিতে কেনিয়ায় ওরা যেতে পারে না। প্রেসিডেন্ট নাই কিভাবে বা কেন প্রাণে বেঁচে গেলেন, এটা ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত দেশটা রানা ও ফরহাদের জন্যে নিরাপদ নয়।

কাজেই গোনজালেস চ্যাং ওয়েনকে হাতের কাছে পেয়ে কাজে লাগাচ্ছে।

'প্রতিপক্ষ কত দূরে?' জিজ্ঞেস করল ওয়েন।

'এতক্ষণে এক আলোকবর্ষ পিছিয়ে পড়েছে ওরা,' বলল রানা, পেটে বাঁধা ব্যান্ডেজে হাত রেখে ব্যথা সহ্য করছে।

'আরও তিন ঘণ্টা আকাশে থাকতে হবে আমাদের, ততক্ষণ আপনি সুস্থ থাকবেন তো, মেজর রানা? সাবধানের মার নেই, ঘোরা পথে যাচ্ছি আমি। উত্তরের সীমান্ত বরাবর এগিয়ে ইলিমো হিল পেরুব, যাব লেক রডলফ-এর দিকে। তারপর সারডিনডিডা প্লেইন ধরে সোমালি সীমান্ত পেরিয়ে নামব চিসিমাইয়োয়। শুধু এই রুট ধরে গেলেই ধরা পড়ার ভয় নেই।'

'ধন্যবাদ, ওয়েন,' বলল ফরহাদ। 'আমরা আছি, কোন অসুবিধে হবে না।'

বসে বসে ঝিমাচ্ছে দোনাভিচ।

উঠে দাঁড়াল ওয়েন। 'গোনজালেস বলেছেন, ল্যান্ড করার পর একজন ডাক্তারকে পাব আমরা। তবে ল্যান্ড করার আগেই যদি অসুবিধে দেখা দেয়, ফার্স্ট এইড কিটে মরফিন আছে। লকারে পাবে, ফরহাদ। ফ্লাইট ডেকে থার্মোস ভর্তি কফিও আছে। হেলপ ইওরসেলফ। তোমাদের কি কম্বল লাগবে?'

এক চোখ খুলে দোনাভিচ জানতে চাইল, 'বিয়ার, হুইস্কি, রাম বা এ-ধরনের কিছু নেই?'

'ব্র্যান্ডি চলবে?'

দোনাভিচের দু'চোখই খুলে গেল। 'লোকটা নির্ঘাত পাগল, জিজ্ঞেস করছে চলবে কিনা!' লাফ দিয়ে সিধে হলো সে। 'আহত লোককে ব্র্যান্ডি ধার না দেয়া রীতিমত পাপ, জানো না? মন খারাপের দাওয়াই হিসেবে আমারও দু'ঢোক দরকার।' ওয়েনের পিছু নিয়ে ফ্লাইট ডেকে ঢুকে পড়ল সে।

ফরহাদ বলল, 'কেন ওর মন খারাপ, বুঝতে পারছেন তো, মাসুদ ভাই?'

'বাবা সালাহউদ্দিন ওর মন খারাপের কারণ দূর করবেন বলে কথা দিয়েছেন,' বলল রানা, তারপর নাসিমের দিকে তাকাল। 'তিনি আরও বলেছেন, নাসিমকেও একটা নতুন চীফট্যান কিনে দেবেন।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল নাসিম। তার দু'চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল। তারপর সে বলল, 'তুমি…তুমি…তুমি…!'

'বারে, আমি আবার কি করলাম!' রানা অবাক।
'বাবা সালাহউদ্দিন তো আমাকে চেনেনই না, তিনি কেন আমাকে চীফট্যান কিনে দেয়ার কথা বলবেন? এ নিশ্চয়ই তোমার কাজ, তুমি তাঁকে বলতে বাধ্য করেছ।'
'যদি করেও থাকি, অন্যায়টা হলো কোথায়? বোগামুরাকে মারার জন্যে উনি আমাকে প্রচুর টাকা দিতে চেয়েছিলেন, সে টাকা আমি নিচ্ছি না। তার বদলে উনি যদি তোমাকে একটা চীফট্যান আর ফরহাদকে নগদ দু'লাখ ডলার দেনই, তাতে অসুবিধে কি?'
নাসিম বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি যদি এভাবে আমাকে ঋণী করো, আমি শোধ করব কিভাবে?'
'বললাম না, দিন দশেক তোমার কাছে থাকব!'
নাসিমের চোখে সন্দেহ। 'তাহলে যে ফরহাদ বলল ডারবান থেকে তুমি সোজা লন্ডনে যাবে?'
'সিদ্ধান্ত পাল্টেছি। দিন দশেক তোমার সেবা-যত্ন আদায় করার পর লন্ডনে যাব।'
'সত্যি? সত্যি তুমি আমার ফ্ল্যাটে উঠবে?'
'না, উঠব না, মানে তুমি যদি বিব্রত বোধ করো।'
দু'হাতে রানার মাথাটা ধরে নিজের কাঁধে টেনে আনল নাসিম, ওর কপালে হালকাভাবে ঠোঁট বুলাল একবার। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কি মনে হলো? আমি বিব্রত বোধ করব?'
রানা বলল, 'বড় আরাম লাগছে, আমি কিন্তু ঘুমিয়ে পড়তে পারি।'
'না, ঘুমিয়ো না,' বলল নাসিম। 'তোমার সঙ্গে জরুরী আলাপ আছে আমার।'
'আমি অসুস্থ, এ-সময় আবার জরুরী আলাপ কি?'
'আমি জানতে চাই, লন্ডনে তুমি কেন যাবে?' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠেছে নাসিম।
'হ্যাঁ, এ প্রশ্ন আমারও,' বলল ফরহাদ। 'ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে খুন করার পর...।'
'সেজন্যেই তো যেতে হবে, ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার জন্যে,' বাধা দিয়ে বলল রানা।
'দেয়ার মত কোন ব্যাখ্যা সত্যি কি আছে তোমার?' জানতে চাইল নাসিম। 'তা থাকা কি সম্ভব?'
'মাইকেল ল্যাক্স দু'মুখো সাপ ছিলেন,' বলল রানা। 'রানা এজেন্সির লন্ডন শাখা তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে ঠিকঠাক করা হচ্ছিল, এই সময় রবার্ট পিলের মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে লুগাম্বায় পাঠান আনিস সিদ্দিকীকে মুক্ত করার জন্যে। আসলে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে একটা ফাঁদ তৈরি করেন তিনি। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসকে আগেই আমরা জানিয়েছি, দু'মুখো সাপদের সবাই ধরা পড়লেও, একজন এখনও নাগালের বাইরে রয়ে গেছে। সেই একজন হলো মাইকেল ল্যাক্স।'
'তাহলে তো দেখা যাচ্ছে ব্রিটেনের আমরা কোন ক্ষতি করিনি, বরং মস্ত উপকার করেছি!' বলল ফরহাদ।
'সেটা ব্যাখ্যা করার জন্যেই তো লন্ডনে যাচ্ছি আমি,' বলল রানা।

***